This book is part of the
Carey Library and Research Centre
at Serampore College.

This is a reproduction of a library book
that was digitized at the CLRC,
Serampore.
The information in this book is freely
available to the public and can be
quoted with proper reference.

The use of this document may be subject
to the Copyright Law of India or to
site license or other rights management
terms and conditions. The person
using this document is liable for any
infringement.

উইলিয়ম কেরী ও সংস্কৃত সাধনা

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

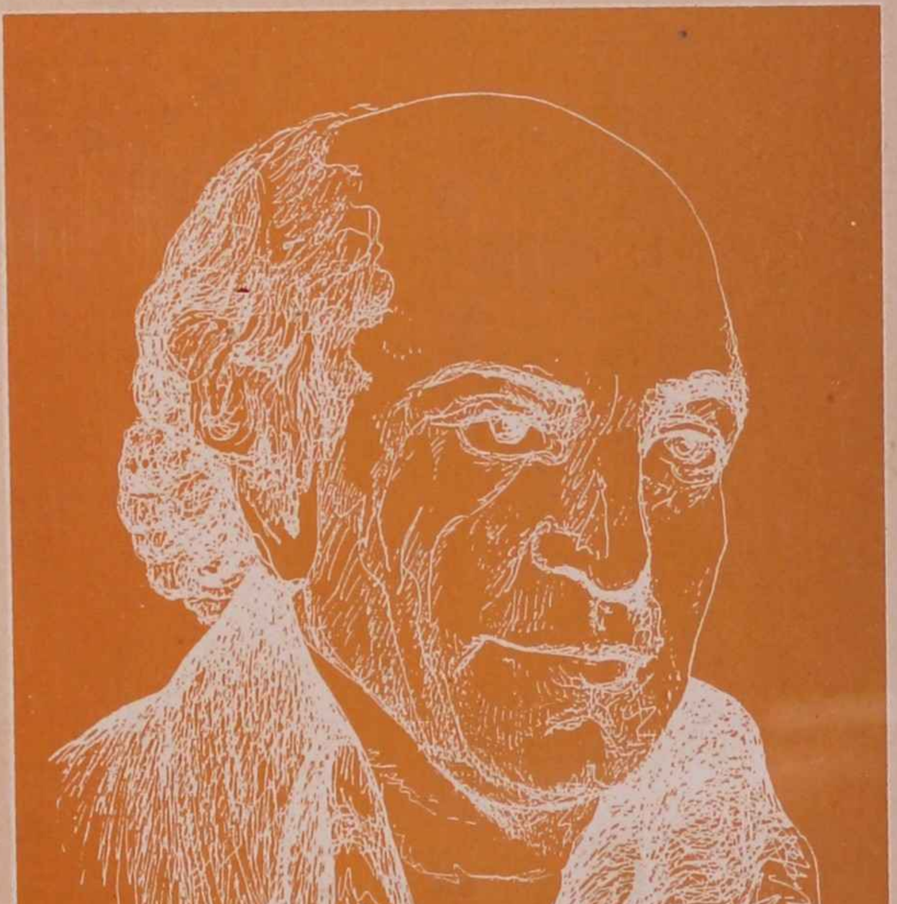

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়
শ্রদ্ধাস্পদেষু —

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়।
৩/৬/৯৯

উইলিয়ম কেরী
ও
সংস্কৃত সাধনা

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

এম. এ (বাংলা ও সংস্কৃত), ডি. ফিল

অবসরপ্রাপ্ত রীডার সংস্কৃত বিভাগ

ভৈরবগাঙ্গুলী কলেজ, কলিকাতা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উইলিয়ম কেরী স্টাডি এণ্ড রিসার্চ সেন্টারের আংশিক অর্থানুকূল্যে।
Published with financial assistance from
William Carey Study and Research Centre.

William Carey O Saṃskrita Sādhanā

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ
বড়দিন ১৯৯৮

গ্রন্থস্বত্ব—লেখিকা

মূল্য ঃ ১৩০.০০

মুদ্রণ ঃ
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস।
৮১, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬।

উৎসর্গ

প্রয়াত পিতৃদেব দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বেশ কয়েক বছর আগে শ্রীরামপুর কলেজে কেরী দিবসে (১৭ই আগস্ট) ‘উইলিয়ম কেরী ও সংস্কৃতশিক্ষা’ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, সেই শুরু। সেই প্রবন্ধপাঠে আমাকে প্রণোদিত করেন শ্রীরামপুর কলেজের তৎকালীন শিক্ষক এবং কেরী লাইব্রেরির প্রাণপুরুষ শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। তারপর কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালিবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতার উইলিয়ম কেরী স্টাডি এণ্ড রিসার্চ সেন্টার এবং অন্যান্য স্থানে উইলিয়ম কেরী ও সংস্কৃতচর্চা বিষয়ক বহু প্রবন্ধ পাঠ করি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃতচর্চা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিতও হয়েছে। সেইসব প্ররন্ধকে ভিত্তি করে বর্তমান গ্রন্থ ‘উইলিয়ম কেরী ও সংস্কৃত সাধনা’ একটি সম্পূর্ণ নতুন রচনা।

এই গ্রন্থ রচনায় যিনি আমায় সবসময়ে, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন, তিনি শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি আমায় বহু পুরাতন বই-এর সন্ধান দিয়েছেন, নিজে উদ্যোগী হয়ে বইগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন, এমনকি নিজের অপ্রকাশিত (পরে প্রকাশিত) প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটিও আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাঁরই সৌজন্যে আমি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে ফোটোকপি করে আনা উইলিয়ম কেরীর A Grammar of the Bengalee Language-এর প্রথম সংস্করণ দেখার ও ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ধন্যবাদ অথবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কোনটি সঠিক জানিনা, কিছু না জানানোই বোধহয় ভাল।

শ্রীরামপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ শৈলেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ জে. টি. কে. ড্যানিয়েল মহাশয় শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগার ও কেরী লাইব্রেরি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে আমায় চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিভাগের খয়রা অধ্যাপক ডঃ সুভদ্রকুমার সেন তাঁর পিতা ও আমার পরমশ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই প্রয়াত আচার্য সুকুমার সেনের একটি গ্রন্থের ভূমিকাংশের ফোটোকপি দিয়ে আমায় বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক নীলাদ্রিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে আমায় বিশেষ সাহায্য করেছেন। শ্রীমানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার উত্তরোত্তর উন্নতি হোক।

উইলিয়ম কেরী স্টাডি এণ্ড রিসার্চ সেন্টার গ্রন্থটি প্রকাশের আংশিক ব্যয় বহন করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে অধিকর্তা ডঃ সরলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বদান্যতায় আমি বিশেষ ভাবে উপকৃত। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কলকাতা শাখার প্রশাসনিক আধিকারিক শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান শ্রীযুক্ত রঞ্জিত রায়চৌধুরী মহাশয় স্বতঃ-প্রণোদিতভাবে আমায় যে সাহায্য করেছেন তা তুলনাহীন। এই সুযোগে তাঁদের জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

ডঃ গোপাল মুখোপাধ্যায় বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করতে আমাকে সাহায্য করেছেন। প্রুফ দেখার ও নির্দেশিকা রচনার ক্লেশকর ও বিরক্তিজনক কাজ তিনি স্বেচ্ছায় সম্পন্ন করেছেন। সবসময় তিনি আমায় উৎসাহিত করেছেন; তাঁর অনুপ্রেরণা ব্যতীত এ গ্রন্থ রচনা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করেছি। কেরী লাইব্রেরির শ্রীমতী সুকেশিনী সোরেন হাসিমুখে আমার জন্য পরিশ্রম করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। কেরী লাইব্রেরির প্রাক্তন কর্মী সুধাংশুদা আজ সমস্ত ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতার ঊর্ধে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ডঃ অরুণা চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মীরা সব সময়েই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারের কর্মীদের সহৃদয়তা ভুলবার নয়। বিশেষত সোসাইটির ম্যুজিয়মে রক্ষিত কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখা ও ব্যবহার সম্ভব হয়েছে ম্যুজিয়মের কিউরেটর শ্রীমতী নীলিমা সেন এবং তাঁর সহযোগী শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মালা চট্টোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায়। সাহায্য করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগও। এঁরা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

আর যাঁর নাম উচ্চারণে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি তিনি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সবসময় উপদেশ নির্দেশ দানে তিনি আমায় উৎসাহিত করেছেন। তাঁর চরণে সহস্র প্রণাম।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাই আচার্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সর্ববিধ জিজ্ঞাসার অত্যাচার নির্বিবাদে বিরক্তিহীন চিত্তে সমাধান করেছেন। আমার প্রতি অহেতুক স্নেহবশত বিভিন্ন সময়ে আমায় উপদেশ ও পরামর্শ দান করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে লেখা সংশোধন করে দিয়েছেন। সর্বোপরি আমার গ্রন্থের জন্য একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর লিখিত ভূমিকা আমার গ্রন্থের মর্যাদাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

ধন্যবাদ জানাই সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের পক্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয়কে।

যখন গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশ করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার তখন তিনি এই গবেষণামূলক গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

মুদ্রণকার্যে সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত বিভাস দত্ত মহাশয়কে এবং তাঁর সহকর্মীদের।

অনেক শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় ও বন্ধু এই গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশনার ব্যাপারে আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁদের অপরিসীম ভালবাসা আমার পাথেয়।

বড়দিন, ১৯৯৮ বিনীতা

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়।

২৬/২-এ, ভুবনমোহন ব্যানার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৫৬

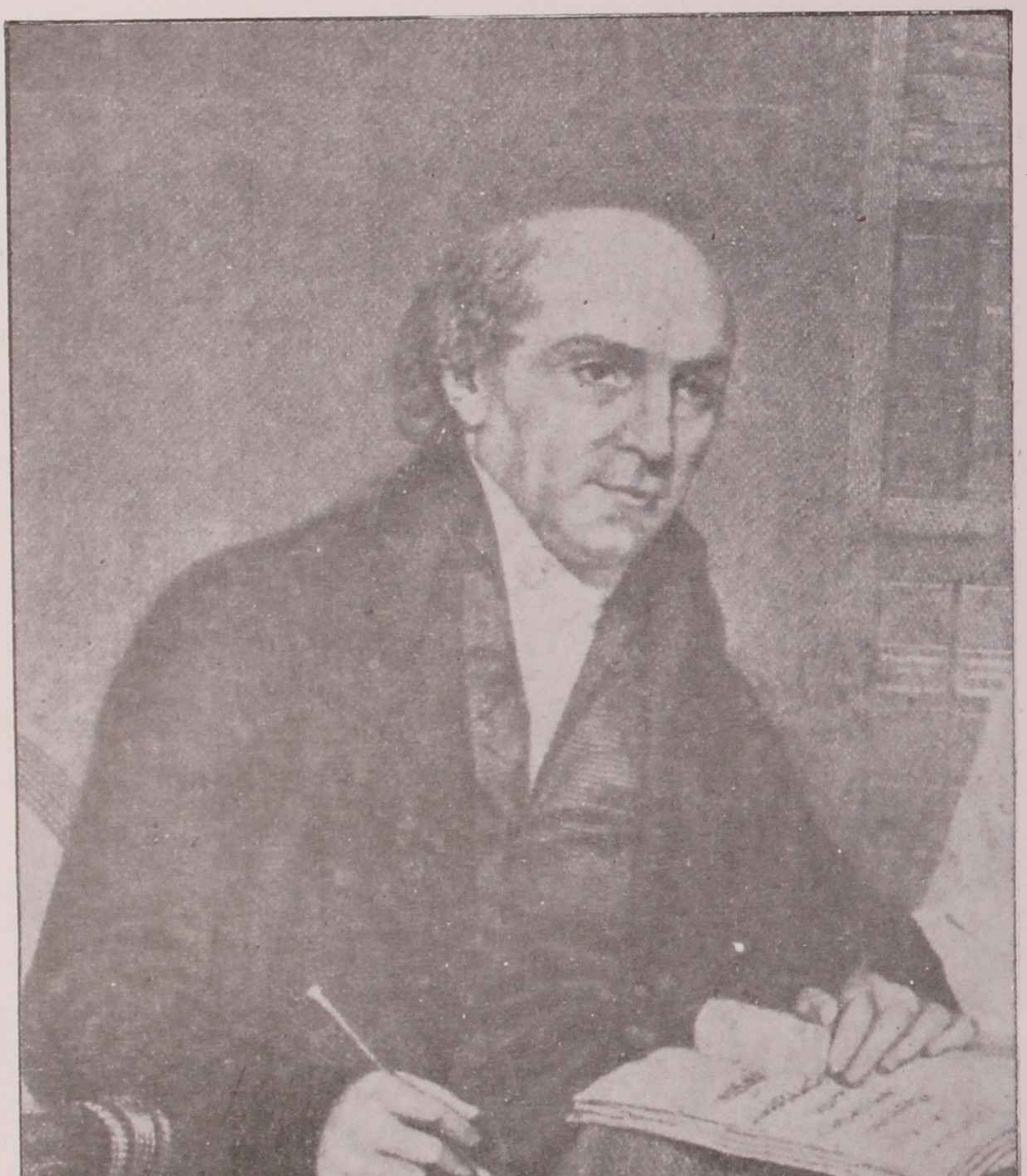

ডঃ উইলিয়ম কেরী

।। সূচীপত্র ।।

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভূমিকা ঃ — এগার

প্রাক্‌কথন ঃ — পনের

প্রথম অধ্যায় ঃ
উইলিয়ম কেরীর আগমনের প্রাক্কালে বাংলা — ১

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ
প্রাক্-কেরী-যুগে কলকাতায় বিদেশীদের সংস্কৃত চর্চা — ১৪

তৃতীয় অধ্যায় ঃ
উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত প্রীতি — ২৭

চতুর্থ অধ্যায় ঃ
(ক) সংস্কৃতের সহায়ক গ্রন্থ ঃ কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ
কোলব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণ—চার্লস উইলকিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ। — ৩৯
(খ) সংস্কৃতের সহায়ক গ্রন্থ ঃ অপ্রকাশিত অভিধান—
বহুভাষা-কোষ গ্রন্থ। — ৬৭

পঞ্চম অধ্যায় ঃ
(ক) বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ — ৮৬
(খ) সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ "রামায়ণ" — ১০৯

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ
উইলিয়ম কেরী ও সংস্কৃত শিক্ষা ঃ — ১২০
শ্রীরামপুর বিদ্যালয়—শ্রীরামপুর কলেজ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও
সংস্কৃত বিভাগ—শিক্ষক কেরী—প্রকাশনা ও মুদ্রণ

সপ্তম অধ্যায় ঃ
কেরীর অন্যান্য রচনায় সংস্কৃতমনস্কতা ঃ
(ক) বাংলা বাইবেল — ১৪৩
(খ) বাংলা ব্যাকরণ — ১৫২

(গ) কথোপকথন ১৬১
(ঘ) ইতিহাসমালা ১৬৭
(ঙ) বাংলা-ইংরেজি অভিধান ১৭৪

অষ্টম অধ্যায় ঃ
কেরীর সংস্কৃত উত্তরাধিকার ঃ উইলিয়ম ওয়ার্ড—ফেলিক্স কেরী—জনক্লার্ক মার্শম্যান—উইলিয়ম ইয়েটস—জন ম্যাক—কেরীর ছাত্রদের সংস্কৃত চর্চা—অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। ১৮৩

নবম অধ্যায় ঃ
উইলিয়ম কেরীর প্রাসঙ্গিকতা ২০৫

পরিশিষ্ট-১
অভিধান পরিচয় ২১৩

পরিশিষ্ট-২
শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা ২১৭

পরিশিষ্ট-৩
উইলিয়াম কেরীর সমসাময়িক শ্রীরামপুর মিশনের লেখক পরিচিতি ২১৯

পরিশিষ্ট-৪
এশিয়াটি রিসার্চেস পত্রিকার প্রবন্ধ, একটি সমস্যা ২২৬

পুস্তক পঞ্জী ঃ ২২৯

নির্দেশিকা ঃ ২৩৭

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীমতী ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় অনেকদিন থেকে শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদের জন্য রচিত বাংলা গ্রন্থ সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বভাবত রেভাঃ উইলিয়ম কেরী তাঁর অধিকতর কৌতূহল ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। কেরী সাহেব খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন, তার জন্য তাঁকে পারিবারিক ও নানাবিধ ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। মহামতি সামারিটানদের মতো শুদ্ধ খ্রীস্টান ডঃ কেরী অতিশয় সদাচারী ও পরোপকারী ছিলেন, তাঁর স্নিগ্ধ মধুর ব্যবহার তাঁকে সকলের কাছে শ্রদ্ধার্হ ও জনপ্রিয় করেছিল। এদেশে পদার্পণ করার পূর্বে তাঁর মনে হীদেনদের প্রতি উচ্চ ধারণা ছিল না, অনেকটা সীমাবদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসনে বন্দী সাধারণ খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের মতো। কিন্তু এদেশে বাস করে, মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙালি পণ্ডিত-মুনশিদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর সে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা অনেকটা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তিনি এদেশেই সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন, কোনো দিন 'হোমে' ফিরে যাননি। এদেশের মাটিতেই শেষ আশ্রয় নিলেন। বাংলা গদ্য, ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক বাঙালি চিরদিন স্মরণে রাখবে। তাঁর 'ধর্ম-পুস্তকে'র ভাষা জনপ্রিয়তা লাভ না করলেও 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' বাংলা সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করবে।

রেভাঃ কেরী সংস্কৃতভাষার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, অনেকটা এদেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মতো। এদেশে এসেই (১৭৯৩) তিনি সংস্কৃত শিখতে মন দিলেন। তিনি একখানি অভিধান সংকলন করতে চাইলেন; সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি—এই ত্রিভাষিক অভিধানের পরিকল্পনা অনেক আগেই তাঁর মনে এসে গিয়েছিল। তিনি সংস্কৃত হিব্রুভাষার ধাতুমূল ধরে দেখতে চাইলেন, এই দুই ভাষার মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে কিনা। তাঁর এদেশে আসবার সাতবছর আগেই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যর উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে হিন্দুদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ "The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the *Greek,* more copious than the *Latin* and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by acci-

dent; so strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprang from a common source, which perhaps, no longer exists; there is a similar reason, though not so forcible,, for supposing that both in *Gothic* and the *Celtic,* though blended with a very different idiom, had the same origin with the *Sanscrit* and the old *Persian* might be added to the same family.'' স্যর উইলিয়ম জোন্স তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জনক বলে ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বীকৃত, কিন্তু কেরী ঠিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন না, তিনি কি জোন্সের সঙ্গে, অথবা তাঁর সংস্কৃত ভাষা-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন? হয়তো ছিলেন না, কারণ এ বিষয়ে তিনি ততটা আকৃষ্ট হননি। সংস্কৃতভাষা অধিগত করা, সিভিলিয়ান ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধান প্রণয়ন করা, এই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ বা তারও পূর্ববতী সময়ে আর্যভাষী জনসমষ্টি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং এখানে অবস্থানের কিছু পরে ঋগ্‌বেদ রচনা করে। হয়তো ভারতের বাইরেই বৈদিক সংহিতার কিছু কিছু রচিত হয়েছিল। প্রাচীন ইরানীয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা ও তার ভাষ্য জেন্দ-এর সঙ্গে বৈদিক ভাষা ও দেবতাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। এখন অবশ্য কেউ কেউ বলছেন, আর্যেরা বহিরাগত নন, এদেশ থেকে বহির্গত হয়েছিলেন। এমনকি সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গেও আর্যসভ্যতার কিছু সাদৃশ্য আছে। আবার কোনোমতে নবাগত আর্যেরাই সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস করেন। মহেঞ্জো-দড়োর লিপিলেখন পাঠোদ্ধারের জন্য যদি কোনো দ্বিতীয় প্রিন্সেপ সাহেবের আবির্ভাব হয়, তা হলে হয়তো আর্যসভ্যতা ও সিন্ধুসভ্যতার সম্পর্ক বোঝা যাবে।

য়ুরোপের কোনো-এক স্থলে আর্যভাষাগোষ্ঠীর নীড় ছিল, এই মূল ভাষার আকার-প্রকার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাদের থেকে ইন্দো-য়ুরোপীয়, ইন্দো-ইরানীয় ও ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী য়ুরোপ, মধ্যএশিয়া, নিকট-প্রাচ্য ও ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন—সবই যে একভাষার সন্তান তা দীর্ঘদিন য়ুরোপ জানত না। অথচ এদেশ থেকে সংখ্যালিখন প্রণালী, জ্ঞানবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, সংস্কৃতসাহিত্যের লোককথা আরব প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্য হয়ে য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে। যে সংখ্যা গণনা প্রণালীকে Arabic Numerals বলা হয়, তা আসলে ভারতের দান, আরবীয় বণিকেরা ভারত থেকে য়ুরোপে প্রচার করে, বিশেষত জ্যোতির্বিদ্যা ও আলকেমি রসায়ন তত্ত্ব।

ক্রমে রুদ্ধদ্বার খুলে গেল, য়ুরোপ ধীরে ধীরে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচিত হল, ষোড়শ শতাব্দী থেকেই তার সূচনা হয়। সাসেটি (Sassetti, 1540-88) নামে এক ইতালীয় পরিব্রাজক এবং করডুস (Coeurdoux, 1768-75) নামে এক ফরাসি

ধর্মযাজক সংস্কৃত ভাষা ও য়ুরোপীয় ভাষার মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝতে পারেন। ক্রমে এদিকে পণ্ডিতদের দৃষ্টি পড়ল। Schlegel, Bopp, A.L. de Chezy (শোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংস্কৃতের অধ্যাপক), Stenzier, Rosen Bournof, Lassen, Princep (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রথম অধ্যাপক), Colebrooke প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইন্দো-য়ুরোপীয় ও ইন্দো-আর্য ভাষার মূল ও শাখাপ্রশাখা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। Sassetti সংস্কৃত ভাষাকে বলেছিলেন সুমধুর ধ্বনিময় ভাষা ("a pleasant musical language")—এটি হচ্ছে যোড়শ শতাব্দীর ঘটনা। ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে ওলন্দাজ প্রটেস্টান্ট ধর্মযাজক Abraham Rogerious ভর্তৃহরির কাব্য অনুবাদ করেন। তিনি বলেছিলেন যে, সংস্কৃত, জারমান ও ল্যাটিন সংখ্যা গণনা প্রণালীর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। জেকব গ্রিম তাঁর Germanic Grammar (Deutsch Grammatik)- এ ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার ব্যাকরণ তত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন (১৮২২)। কিন্তু তার কিছু আগেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান শাসক ও কর্মচারীরা সংস্কৃতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, ভারতবর্ষকে শাসন করতে হলে তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে জানতে হবে। ভারতের ঐতিহ্য যে সংস্কৃত ভাষানির্ভর তা তাঁরা এদেশীয় পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। ১৭৮৫ সালে কোম্পানির উচ্চ কর্মচারী স্যর চার্লস উইলকিন্‌স উত্তমরূপে সংস্কৃত শিখে গীতার অনুবাদ করেন। তাঁকে উৎসাহিত করেন স্বয়ং বড়লাট হেস্টিংস। লণ্ডন থেকে এই ইংরেজি অনুবাদ কোম্পানির ব্যয়ে প্রকাশিত হয়। হেস্টিংস ঘরে-পরে নিন্দিত, কিন্তু তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে অতি উদার ছিলেন। ক্রমে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল (১৭৮৪), Asiatic Researches পত্রিকায় ভারতের ভাষা, ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, স্মৃতি ও পুরাণ, ব্যাকরণ-অভিধান-ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নানা আলোচনায় ইণ্ডোলজিস্ট বা ভারততাত্ত্বিক ইংরেজ পণ্ডিতগণ মেতে উঠলেন। মুসলমান শাসনে হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতি রাজসমর্থন না পেয়ে মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ইংরেজ আমলে আবার সংস্কৃত চর্চা শুরু হল। অবশ্য এদেশীয় পণ্ডিতদের আর্থিক দুর্গতির জন্য সংস্কৃত ভাষা চর্চা শিথিল হয়ে পড়ল। সে যাই হোক রেভাঃ উইলিয়ম কেরী সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাংলাভাষার প্রতি তাঁর ছিল ভালোবাসা, কিন্তু সংস্কৃতের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা। এইজন্য বাংলাভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য তিনি বাধাই দিয়েছেন, বরং বাংলাভাষায় তৎসম শব্দের অযথা অনুপ্রবেশকেও সমর্থন করতেন। বাঙালি বিশুদ্ধ বাংলাভাষার কদর করে না বলে তিনি মনে মনে খুণ্ণ হয়েছিলেন।

সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর কতটা আকর্ষণ ছিল, সে বিষয়ে এই গ্রন্থে শ্রীমতী ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় অনুপুংখভাবে আলোচনা করেছেন, সে সমস্ত তথ্য এমন চমকপ্রদ যে

সহসা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। ডঃ কেরী ব্যাকরণ লিখেছেন, কিন্তু সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের পাণ্ডুলিপির অনেকটা অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়, শ্রীরামপুর কেরী সংগ্রহশালায় তার কিয়দংশ এখনও রক্ষিত আছে। মহাকাব্যগুলি অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন, বেশ খানিকটা করেও ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় সহজভাবে বক্তৃতা করতে পারতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান ছাত্রদের সংস্কৃত অধ্যয়ন ও রচনায় উৎসাহ দিতেন। শ্রীরামপুর স্কুলের ছাত্রদের সংস্কৃত অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে নির্বাচিত করেছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়েও সংস্কৃত ভাষা শিখতে হত। কারণ তিনি জানতেন দক্ষিণভারতীয় ভাষাগুলি বাদ দিলে, উত্তর, পশ্চিম, ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষাগুলির মূল হচ্ছে সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষা না জানলে নিজ নিজ মাতৃভাষাও ভালোভাবে শিক্ষা করা যাবে না। একালের শিক্ষা-নায়কেরা সে কথা ভুলে সকলের আগে সংস্কৃত ভাষা কোতল করেছেন। একজন বিদেশী যার জন্য নিজের সমস্ত শ্রদ্ধা ও সময় ঢেলে দিয়েছিলেন, একালের বাঙালি সমাজ তার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না, বা চাচ্ছে না—একথা মনে হলেই কেরীর এই সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে পড়ে। তাঁর এই সমস্ত কর্ম এত বৃহৎ এবং আমরা এত ক্ষুদ্রচেতা যে, আমাদের কুলপরিচয় আমরা ইচ্ছা করেই ভুলে যাচ্ছি। ডঃ ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় কেরী জীবনের সেই বিচিত্র ইতিহাস উদ্ধার করে তাঁর প্রতি বাঙালির ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করেছেন। এ জন্যে আমি বাঙালি পাঠকের পক্ষ থেকে লেখিকাকে সাধুবাদ জানাই।

১৪০৫।।১৯৯৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

এশিয়াটিক সোসাইটির সিনিয়র রিসার্চ-ফেলো

প্রাক্ কথন

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী এদেশে আসেন। পৃথিবীর অগণিত, অনালোকিত ধর্মহীন মানুষের দুর্দশায় তাঁর প্রাণ সর্বদাই সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে থাকতো, খ্রিস্টধর্মের আলোকে এই 'হিদেন'দের আলোকিত করার জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন, তাই এক গ্রীষ্মকালে ভারতীয় জনগণকে খ্রিস্টের অমৃতবাণীতে আপ্লুত করার উদ্দেশ্যে সুদূর ইংলন্ড থেকে তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

ইংলন্ডের নর্দাম্পটনশায়রের এক অখ্যাত গ্রাম পলার্সপিউরি। উইলিয়ম কেরীর জন্মস্থানরূপে অখ্যাত গ্রামটিও সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে। পলার্সপিউরি গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল মনোমুগ্ধকর। গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল ছোট নদী, উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তরে বনফুলের মেলা, বনস্পতির ছায়ায় আচ্ছন্ন গ্রাম্যপথ, আর অদূরে বিশাল হুইলবেরি অরণ্য। এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গ্রামের অধিবাসীরা ছিলেন চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত।

গ্রামের অধিবাসীদের জীবিকা ছিল কৃষিকাজ এবং তাঁতবোনা। আশপাশের গ্রামগুলিতে ছিল জুতো তৈরীর এবং জুতো মেরামতির ছোট ছোট কারখানা। তাঁতবোনা ও জুতো তৈরীর কাজ চলত পূর্ণোদ্যমে, তবু হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের শেষে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অধরাই থেকে যেত।

ছেলেবেলার দিনগুলি ঃ

এই গ্রামে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট এডমন্ড কেরীর ঘর আলো করে জন্মাল প্রথম সন্তান উইলিয়ম। এডমন্ডের পিতা পিটার কেরীর জীবিকা ছিল তাঁতবোনা। পরে তিনি গ্রামের পাঠশালার শিক্ষকতার এবং প্যারিসের কেরানির কাজটিও পান। পিটারের মৃত্যুতে পিতৃহীন এডমন্ড অত্যন্ত অল্প বয়সেই তাঁতবোনার কাজ শুরু করেন। এডমন্ডের ভ্রাতা কৈশোরেই এক ব্যক্তির সঙ্গে কানাডায় পাড়ি দেন। গ্রামের শিক্ষক মহাশয়ের মৃত্যু হলে এডমন্ডপাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হন, প্যারিসের কেরানির কাজটিও তিনি পান। শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার পর এড়মন্ড পিউরিএন্ডের কুটীর ছেড়ে স্কুলবাড়ির পিছনের বাড়িতেই বসবাস করতে আসেন। এডমন্ড লেখাপড়া ভালবাসতেন, সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাত্রিতে তিনি পড়াশুনা করতেন।

উইলিয়ম ও তাঁর ভাই পিটার গ্রামে তাঁদের পিতার পাঠশালাতেই লেখাপড়া শুরু

করেন। এই পাঠশালায় পড়াশুনার আয়োজন ও উপকরণ ছিল যৎসামান্য; বিষয় ছিল লেখা, পড়া এবং সামান্য গণিত। উইলিয়ম সেই সামান্য আয়োজনেরই যথাযোগ্য সদ্‌ব্যবহার করেন। উইলিয়মের পিতা এডমন্ড হাতেরলেখা ভাল করার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন। পরবর্তীকালে এডমন্ড আরও জানান যে উইলিয়ম পাটীগণিত খুব ভাল শিখেছিলেন। শিক্ষকপিতার পুত্র হওয়ায় গ্রামের অন্যান্য বালকের তুলনায় তিনি হয়তো সামান্য বেশি সুযোগ পেয়েছিলেন, বন্ধু এন্ড্রু ফুলারকে একটি চিঠিতে পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন।[১]

পিতার অধ্যয়নগুণ উইলিয়ম কেরীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং নানা দুঃসাহসিক অভিযানের বই পড়তে ভালবাসতেন। কলম্বসের জীবন এবং তাঁর আবিষ্কারের কাহিনী উইলিয়ম কেরীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি বারংবার কলম্বসের কাহিনী পড়েছেন। কলম্বসের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সহপাঠী, সমবয়সী বন্ধুদের কাছে তিনি সবসময়েই কলম্বসের অভিযানের কাহিনী বলতেন, ফলে সহপাঠীরা ঠাট্টা করে তাঁকে কলম্বস নামে ডাকতেন। অবশ্য সহপাঠীরা তাঁকে খুবই ভালবাসতেন।

তন্তুবায়বৃত্তি পরিত্যাগ করে গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় এডমন্ড কেরী গ্রামে সম্মানিত ব্যক্তিরূপে গণ্য হন। গণ্যমান্য পিতার আদর্শ উইলিয়ম কেরীকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল, যদিও তখন ধর্ম সম্পর্কে উইলিয়মের মনে কোন আকর্ষণই ছিলনা; তবু পিতার সঙ্গে নিয়মিত গির্জায় যেতেন এবং সেখানে ধর্মপুস্তকের বহু অংশের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ঘটে।

অপরদিকে পলার্সপিউরির উদার অকৃপণ প্রকৃতির হাতছানি বালক উইলিয়মকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করতো। স্কুলবাড়ির পিছন থেকে অরণ্য পর্যন্ত প্রান্তরের বিশাল বিস্তার, নদীর ঢালু তীরভূমি, বনাঞ্চলের সৌন্দর্য শৈশবাবস্থাতেই উইলিয়মকে প্রকৃতি প্রেমিক করে তুলেছিল। গ্রামের প্রতিটি বনস্পতি, প্রতি ঝোপঝাড়, সাধারণ গাছপালা সবকিছুর সঙ্গে উইলিয়মের ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পোকামাকড়, পাখি, পাথর সবের প্রতিই ছিল তাঁর অসীম কৌতূহল ও ভালবাসা। নিজের শোবার ঘরে তিনি একটি সংগ্রহশালা বানিয়েছিলেন, সেখানে গাছের পাতা, ছাল, শিকড়, পাখির বাসা, বিভিন্ন পোকামাকড়, বিভিন্ন ধরণের পাথর সবই তিনি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলেন। একবার একগাছের খুব উচুঁ ডাল থেকে একটি সুন্দর পাখির বাসা সংগ্রহ করতে গিয়ে সরু ডাল ভেঙ্গে তিনি পড়ে যান, কিন্তু পরের দিন তিনি সেই পাখির বাসাটি সংগ্রহ করে আনেন। এ ব্যাপারে তাঁর বন্ধুদের তিনি বলেছিলেন, তিনি যা করতে চান তা না করে থাকতে পারেন না। বাল্যকালের এই ঘটনা থেকেই উইলিয়ম কেরীর চরিত্রের অন্তর্নিহিত জেদের পরিচয় পাওয়া যায়।

(সতের)

এই সময় উইলিয়মের পিতৃব্য পিটার কেরী দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কানাডায় প্রবাসজীবন যাপনের অবসানে দেশে ফিরে আসেন। অল্পসময়েই উইলিয়ম পিতৃব্যের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেন। পিটার উইলিয়মকে বিদেশের নানা কাহিনী শোনাতেন। বিদেশের মানুষ, তাদের বিচিত্র আচার ব্যবহার, বিদেশের পশুপক্ষী, ফলফুল গাছপালার কাহিনী উইলিয়মকে আগ্রহান্বিত করে। দূর সমুদ্রযাত্রার রোমাঞ্চকর কাহিনী উইলিয়মের স্বাভাবিক কৌতূহলকে আরও প্রজ্জলিত করেছিল।

কিন্তু উইলিয়ম কেরীর শৈশবশিক্ষার সুন্দর দিনগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পিতা এডমন্ড কেরী শিক্ষক ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তি হলেও দরিদ্র ছিলেন, সুতরাং জীবিকার প্রয়োজনে চোদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই উইলিয়মের ছাত্র জীবনের সমাপ্তি ঘটে। সেকালের ইংলণ্ডে কেবলমাত্র ধনীগৃহের সন্তানরাই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারতেন। গ্রামের দরিদ্রমানুষের কাছে পাঠশালার সামান্য শিক্ষালাভ ছাড়া উচ্চশিক্ষার দ্বার ছিল রুদ্ধ।

উইলিয়ম কেরীর পিতৃব্য পিটার চাষআবাদ করতেন। স্থির হয় উইলিয়ম তাঁর কাছে কৃষিকর্ম শিখবেন। উইলিয়ম উদ্যান রচনা করতেন, উদ্ভিদ্ জগতের সঙ্গে তাঁর প্রাণের সম্পর্ক ছিল, সুতরাং তিনি কৃষিকর্মে খুবই উৎসাহিত হন। কিন্তু একধরণের চর্মরোগ থাকায় তিনি রোদের তাপ সহ্য করতে পারতেন না, কৃষিকাজে রোদের তাপে তাঁর চর্মরোগ বেড়ে যায় এবং তিনি কৃষিকর্মের অনুপযুক্ত বিবেচিত হন।

অধ্যয়নে ছেদ পড়ায় উইলিয়ম স্বভাবতই দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি স্থির করেন নিজেনিজেই লেখাপড়া চালিয়ে যাবেন। এই সময়ের আগেই পলার্সপিউরির টমাস জোন্স নামে এক ভদ্রলোকের কাছে উইলিয়ম ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। টমাস জোন্স ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। উইলিয়ম কেরী মাত্র বারো বৎসর বয়সেই ল্যাটিনভাষার একটি ষাটপৃষ্ঠার শব্দকোষ মুখস্থ করেন। বাল্যাবস্থাতেই উইলিয়মের চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, (১) পিতা এডমন্ড কেরীর ধর্মভাব, সৎজীবন এবং অধ্যয়নস্পৃহা উইলিয়মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। (২) তাঁর প্রকৃতি প্রেমের উত্তরণ ঘটে মানব প্রেমে। প্রকৃতির নিবিড় পর্যবেক্ষণ তাঁর জীবনে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষনের বীজ বপন করে। (৩) উইলিয়ম কেরীর জেদী স্বভাব জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করতে তাঁকে সাহায্য করে। (৪) কলম্বসের জীবন ও আবিষ্কারের বিষয়ে নিবিড় অধ্যয়ন অজানাদেশের অজানা মানুষের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং কষ্টকর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার জন্য তাঁর মনকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে।

জুতাতৈরীর শিক্ষানবিসি ঃ

জীবিকারূপে কৃষিকর্মে সফল না হওয়ায় উইলিয়মকে অন্য জীবিকা অবলম্বন

করতে হয়। সেই সময় নরদাম্পটনশায়র অঞ্চলে জুতো তৈরী ও জুতো মেরামতি কাজের বেশ চাহিদা ছিল। কাছাকাছি পিডিংটন গ্রামে ক্লার্ক নিকলস নামে এক ভদ্রলোকের জুতো তৈরী ও মেরামতির দোকান ছিল। এডমন্ড কেরীর অনুরোধে সেই ভদ্রলোক উইলিয়মকে জুতো মেরামতির শিক্ষানবিসিতে নিযুক্ত করেন। ক্লার্ক নিকলসের দোকানে কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ ছিল, উইলিয়ম মনোযোগ সহকারে সেগুলি পাঠ করেন। ধর্মগ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু গ্রিক শব্দ ছিল। অপরিচিত গ্রিক শব্দগুলি ধর্মগ্রন্থের সম্পূর্ণ অর্থগ্রহণে বাধা হওয়ায় উইলিয়ম নিজের গ্রাম পলার্সপিউরিতে এসে টমাস জোন্সের কাছে গ্রিকভাষা শিক্ষা করতেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ক্লার্ক নিকলসের মৃত্যু হওয়ায় উইলিয়ম হ্যাকলটন গ্রামে নিকলসের আত্মীয় টি. ওল্ডের দোকানে শিক্ষানবিস হন। ওল্ড 'মদ্যপ বদমেজাজি ও ধর্মবাতিকগ্রস্ত' ছিলেন। ওল্ডের সঙ্গে উইলিয়মের প্রায়ই ধর্মবিষয়ক তর্ক হত। এই তর্কে জয়লাভ করার ইচ্ছায় উইলিয়ম ধর্মপুস্তক পাঠে আরও মনোনিবেশ করেন এবং হিব্রু ভাষায় মূল বাইবেল পড়ার জন্য হিব্রুভাষা শিখতে থাকেন। জুতো মেরামতির দোকানের আর এক শিক্ষানবিস জন ওয়ার উইলিয়মের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হন। জন ওয়ার খ্রিস্টীয় ধর্মসমাজের ব্যাপটিস্ট গোষ্ঠীর সমর্থক ছিলেন। যাজক পিতার পুত্র হলেও এবং গির্জায় যাতায়াত করলেও উইলিয়মের মনে ধর্মভাব ছিলনা; কিন্তু ওয়ারের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে ধর্মভাব দেখা দেয়। জনের সান্নিধ্যে ব্যাপটিস্ট গোষ্ঠীর ধর্মীয় মনোভাব ও তাঁদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধে কেরী অবহিত হন। জন ওয়ার একটি কথা বারংবার জোরের সঙ্গে বলতেন যে ব্যাপটিস্টরা সত্যকার ধর্মভাবাপন্ন এবং তাঁরা দরিদ্র অশরণ মানুষের সহায়, বন্ধু। ওয়ারের প্রভাবে উইলিয়মের মনে সত্যকার ধর্মভাব জাগে, তিনি হ্যাকলটনের গির্জার প্রার্থনাসভায় নিয়মিত যোগ দিতে থাকেন এবং হ্যাকলটনের পুরোনো গির্জাটির সংস্কারের জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সেই সময় চার্চ-অফ-ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রচারক জন স্কটের সঙ্গেও উইলিয়মের পরিচয় ঘটে। ওল্‌নি গ্রামে ব্যাপটিস্টদের সমাবেশে জন চেস্টারের ভাষণ শুনে উইলিয়ম কেরী অভিভূত হন এবং ব্যাপটিস্ট ধর্মীয়মণ্ডলীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কুড়ি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই উইলিয়ম মনিব টি. ওল্ডের শ্যালিকা ডরোথি প্ল্যাকেটকে বিবাহ করেন। ডরোথি বয়সে উইলিয়মের থেকে বড় ছিলেন। ডরোথির নিরক্ষরতা বা বেশি বয়স তাঁদের প্রণয় ও পরিণয়ের ক্ষেত্রে কোন বাধা হয়নি। মনিব ওল্ডের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পরিবারের দায়িত্বও কেরীর উপর ন্যস্ত হয়। জুতো সেলাই, ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও বাগান রচনা একই সঙ্গে চলতে থাকে। এই সময় কেরী এবং তাঁর প্রথম সন্তান কন্যা অ্যান গুরুতর অসুস্থ হন। দীর্ঘ আঠারো মাস কঠিন রোগভোগের পর কেরী সুস্থ হয়ে উঠেন, কিন্তু কন্যা অ্যানের মৃত্যু হয়। এই

অসুস্থতার ফলে মাত্র বাইশ বৎসর বয়সেই উইলিয়মের মাথায় টাক পড়ে। এই দুর্দিনে পলার্সপিউরির আত্মীয় বন্ধুরাই তাঁদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন।

মৌলটনে ঃ

সুস্থ হওয়ার পর উইলিয়ম আবার জুতো মেরামতির কাজ শুরু করেন। ১৭৮২ সনের ব্যাপটিস্ট মণ্ডলীর সভায় জন রাইল্যান্ড, জন সাটক্লিফ, এন্‌ড্রু ফুলার ও স্যামুয়েল পীয়র্সের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে এবং পরবর্তীকালে এঁরা উইলিয়মের সহযোগী হন এবং নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেন। জুতো মেরামতির ব্যবসায়ের আয়ে দিনযাপন অসম্ভব হয়ে উঠে। কেরী মৌলটন গ্রামে গির্জার যাজকের পদটি লাভ করেন। মৌলটন গরীবদের গ্রাম, অধিবাসীরা যাজককে উপযুক্ত অর্থ দিতে পারতেননা; সুতরাং জুতো মেরামতির কাজও চলতে থাকে, একই সঙ্গে তিনি একটি পাঠশালা স্থাপন করে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। ছাত্রদের ভূগোল শিক্ষায় উৎসাহ দানের জন্য তিনি নিজের হাতে একটি চামড়ার ভূগোলক নির্মাণ করেন এবং বড় বড় কাগজে পৃথিবীর মানচিত্র এঁকে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখেন। সেই সঙ্গে নানাদেশ সম্বন্ধে প্রাপ্ত নানা তথ্যও তিনি সংগ্রহ করতেন।[২] মৌলটনে কেরী ডাচ, ইটালিয়ান ও ফরাসি ভাষা শেখেন, ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থপাঠও সমানভাবে চলতে থাকে। মৌলটনেই তিনি টমাস কুকের দক্ষিণমেরু অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়েন। একদিকে তাঁর মনে সুদূরের পিয়াস, অপরদিকে বিদেশে 'হিদেন'দের অত্যাচারিত জীবনের কাহিনী পাঠে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেন, খ্রিস্টধর্মের আশ্রয়ে দূরদেশবাসী 'হিদেন'দের জীবনকে মুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেন।

১৭৮৭ সনে কেরী নরদাম্পটনে নেন নদীতে ব্যাপটাইজড হন। ব্যাপটাইজড হওয়ার পর তিনি ধর্মযাজকের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেন। জন সাটক্লিফ, জন রাইল্যান্ড, এনড্রু ফুলার প্রমুখ ধর্মযাজকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে নরদাম্পটনে ব্যাপটিস্ট মণ্ডলীর এক সভায় কেরী মত প্রকাশ করেন যে বিদেশে অসংখ্য অখ্রিস্টান মানুষের মুক্তির জন্য ব্যাপটিস্ট ধর্মমণ্ডলীর কিছু করা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেননি বরং তাঁকে উপহাস করেন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে কেরীর জেদ আরও বেড়ে যায়। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে সমর্থন করলেও তাঁরাও ছিলেন তাঁরই মতো অসহায়, কিছু করার সামর্থ তাঁদের ছিলনা। তাঁরা পরামর্শ দেন কেরীর বক্তব্যকে লিখিতরূপ দিতে এবং সেই মুদ্রিত পুস্তিকা প্রচার করলে দেশের ব্যাপটিস্ট জনগণের সাড়া মিলতে পারে; রচিত হয় কেরীর বিখ্যাত পুস্তিকা—

'An Enquiry into the obligations of Christian to use means for conversion of the Heathen.' সংক্ষেপে 'An Enquiry'.

লীস্টারে ঃ

মৌলটন থেকে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কেরী লীস্টারে অপেক্ষাকৃত বড় গির্জায় ধর্মযাজক নিযুক্ত হন। এখানেই ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে 'An Enquiry' প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে ব্যাপটিস্ট মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৭৯২ সনে নর্দাম্পটনের ব্যাপটিস্টদের সভায় মিশন গড়ার প্রস্তাবটি উত্থাপিত হবে স্থির হয়। ঐ সভায় এনকোয়ারির বক্তব্যকে আশ্রয় করেই কেরী বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতেই উচ্চারিত হয় তাঁর বিখ্যাত উক্তি "Expect great things from God. Attempt great things for God." তাঁর এই উক্তি ধার্মিক মানুষদের মনকে স্পর্শ করে। মিশন গঠনের প্রস্তাবটিও আলোচিত হয়। ১৭৯২ সনের অক্টোবর মাসে কেটারিঙে ব্যাপটিস্ট মণ্ডলীর সভায় মিশনগঠনের ব্যাপারটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় এবং গঠিত হয় "The Particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen." নামে সমিতি। ইংলন্ডের এইটিই প্রথম মিশনারি সোসাইটি।

সদ্য গঠিত সমিতি যখন তাহিতি দ্বীপে প্রচারকের দল পাঠানোর প্রস্তুতি করছেন, তখন জন টমাস[৩] নামে জাহাজের এক চিকিৎসক কেরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জন টমাস আগে থেকেই বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচার করছিলেন এবং বাইবেলের কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদও করেছিলেন। নর্দাম্পটনের ১৩ই নভেম্বরের প্রাথমিক সমিতির সভায় টমাস নিজেই উপস্থিত হন এবং বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচারে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি ব্যাপটিস্ট সোসাইটির সাহায্য এবং প্রচার কার্যে একজন সঙ্গী প্রার্থনা করেন। রাইল্যান্ড, সাটক্লিফ, ফুলার, মুলার প্রমুখ ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির কর্তৃপক্ষ বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচারের সুবিধার দিকগুলি বিবেচনা করেন। টমাসের সঙ্গী হিসাবে কেরী নিজেই নিজের নাম প্রস্তাব করেন এবং তা গৃহীত হয়। স্থির হয় ১৭৯৩ সনের মার্চ মাসে টমাস ও কেরী সপরিবারে যাত্রা করবেন।

কেরীর পত্নী তখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন, তিনি কেরীর সঙ্গে বিদেশ যাত্রায় অসম্মত হন। তখন ইংলন্ডের সমাজে সপরিবারে ভারতযাত্রা বহুল প্রচলিত ছিল না, আর নিরক্ষরা ডরোথি স্বামীর মিশনগড়ার স্বপ্নের সাথীও ছিলেন না। উইলিয়মের পিতা এডমন্ডও পুত্রের দূরবিদেশ যাত্রা অনুমোদন করতে পারেননি। পারিবারিক বাধায় কেরী কিছুটা দুঃখিত হলেও হিদেনদের খ্রিস্টধর্মের আলোকে আলোকিত করার গভীর আত্মপ্রত্যয়ই তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত হতে দেয়নি। কেরী যাত্রার আয়োজন শুরু করেন, সঙ্গী হয় ছয়বৎসরের জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্স।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধর্মযাজকদের ভারতে আগমন পছন্দ করত না। তাদের আশঙ্কা ছিল ধর্মাচরণ বা সামাজিক ব্যবস্থার উপর কোনরকম হস্তক্ষেপ ঘটলে সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হবে এবং নতুন শাসন ব্যবস্থা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হবে। সুতরাং বিনা

ছাড়পত্রে কলকাতার জাহাজঘাটায় নামলে পাদরিদের কারারুদ্ধ করা হত। পরে এই আইন শিথিল করা হয়, পাদরিদের পরবর্তী জাহাজেই দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। বস্তুত কেবলমাত্র পাদরি নয়, কোন বিদেশীই ছাড়পত্র ব্যতীত কলকাতার জাহাজঘাটায় পদার্পণ করতে পারতেন না।

ভারতযাত্রার প্রাক্কালে আত্মীয় বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে উইলিয়ম কেরী লন্ডনে গেলেন ছাড়পত্র সংগ্রহের চেষ্টায়। সেখানে ছাড়পত্র না পেয়ে তাঁরা ডোভার বন্দরে যান। সেখানে আর্ল-অফ-অক্সফোর্ড জাহাজ নোঙর করেছিল। ডাঃ টমাস এই জাহাজেই চিকিৎসক ছিলেন। জাহাজের ক্যাপটেন মিঃ হোয়াইট ছাড়াপত্র ছাড়াই তাঁদের কলকাতায় পৌঁছে দিতে রাজি হন। কিন্তু কোন কারণে টমাস ও কেরীকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, টমাসের স্ত্রীকন্যাকে নিয়ে জাহাজ ইংলন্ডের উপকূল থেকে যাত্রা করে। কেরী অত্যন্ত হতাশ হলেও আবার নতুন উদ্যমে যাত্রার অয়োজন করতে থাকেন। ইতোমধ্যে ডরোথি চতুর্থ পুত্রের জন্ম দেন। সেই সংবাদে কেরী ও টমাস হ্যাকলটনে ডরোথির সঙ্গে দেখা করতে যান। টমাস ও কেরীর বারংবার অনুরোধে এবার ডরোথি পুত্রদের নিয়ে কেরীর সহগামিনী হতে সম্মত হন, এই সর্তে যে তাঁর বোন কিটিও তাঁদের সঙ্গিনী হবেন।

অবশেষে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুন দিনেমার জাহাজ 'কর্ন প্রিন্সেস মারিয়া' তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল অকূল দরিয়ায়, কাঙ্খিত দেশের উদ্দেশ্যে; তাঁদের মনে তখন আশা আর আশঙ্কার বিচিত্র আবেগ। জাহাজের ক্যাপটেন মিঃ ক্রিসমাসের উপদেশে তাঁরা গঙ্গার মোহনাতেই অবতরণ করেন এবং নৌকাযোগে কলকাতা যাত্রা করেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর উইলিয়ম কেরী বহুপ্রতীক্ষিত বঙ্গদেশে পদার্পণ করলেন, কলকাতার জাহাজঘাটায় কেরীকে স্বাগত জানালেন ডাঃ টমাসের মুনসি রামরাম বসু।

কলকাতা থেকে মদনাবাটি ঃ

টমাসের মুনসিকে কেরী প্রথমদিন থেকেই নিজের মুনসি নিযুক্ত করেন। প্রিন্সেস মারিয়া জাহাজেই ডাঃ টমাসের কাছে কেরীর বাংলাভাষা শিক্ষা আরম্ভ হয়, এমনকি কেরী টমাসকে বাইবেলের বাংলা অনুবাদে সাহায্যও করেছিলেন।[৪] ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির অন্যতম আদর্শ ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচার। সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কেরী বাংলা ভাষা শিক্ষায় তৎপর হন।

কলকাতায় রামরাম বসুর নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে কেরী বসবাস করতে থাকেন, কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে কলকাতা অত্যন্ত ব্যয়বহুল স্থান, সুতরাং তাঁরা ব্যান্ডেলের উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে যাত্রা করেন। ব্যান্ডেলেও ধর্মপ্রচারের সুবিধা না হওয়ায় তাঁরা

নবদ্বীপ যান। নবদ্বীপ টমাসের পূর্বপরিচিত স্থান। চৈতন্যদেবের লীলাক্ষেত্র, বাংলার একসময়ের রাজধানী, শিক্ষার পীঠস্থান নবদ্বীপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা উইলিয়ম কেরী করেছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতরাও কেরীকে সেখানে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানান, কিন্তু জীবিকার কোন সুবিধা না হওয়ায় কেরী কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। রামরাম বসুর সহায়তায়, নেলু দত্তের বদান্যতায় কেরী মানিকতলায় একটি বাসা পান, কিন্তু আর্থিক সংকট চরমপর্যায়ে পৌঁছায়, এমনকি জীবনধারণের উপায়ও সংশয়াপন্ন হয়। ইংলন্ডের সোসাইটি প্রদত্ত কয়েকমাসের ব্যয়নির্বাহের অর্থ টমাসের বেহিসাবি আচরণে নিঃশেষ হয়। টমাস আবার তাঁর চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেন। কলকাতার য়ুরোপীয় সমাজ কেরীকে কোনপ্রকার সাহায্যই করেননি। রামরাম বসু সুন্দরবনের উপকণ্ঠে দেবহট্টে কেরীর জন্য কিছু জমি সংগ্রহ করেন, কেরী সেখানে একটি কুটীর বানান, চাষ আবাদ আরম্ভ করেন। কিন্তু জনমানবহীন অরণ্যাঞ্চল ডরোথি ও পুত্রদের কাছে ভয়ঙ্কর স্থানরূপে প্রতিভাত হয়। শারীরিক শ্রম, অনিশ্চিত জীবন যাত্রা, সামাজিক জীবনের অভাব, সর্বোপরি শ্বাপদসঙ্কুল ভয়ঙ্করস্থানের বিভীষিকা ডরোথির সহ্যের সীমা অতিক্রম করে, তাঁর মানসিক বিকার দেখা দেয়।

টমাস তাঁর প্রাক্তন নিয়োগকর্তা জর্জ উডনির শরণাপন্ন হন এবং উত্তরবঙ্গে মহীপালদিঘিতে একটি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের কাজ পান। কেরীর জন্যও তিনি একটি কর্মের সংস্থান করেন, মদনাবাটিতে কেরী আরেকটি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। কেরী আবার সপরিবারে রামরাম বসুর সঙ্গে উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। এই অনিশ্চিত জীবন ও জীবিকার বিপর্যয়ের মধ্যেও কেরীর ভাষা চর্চা একদিনের জন্যও বন্ধ ছিলনা এবং রামরাম বসুও কেরীকে পরিত্যাগ করেননি। মদনাবাটিতে সুনিশ্চিত জীবিকার নিশ্চিন্ত জীবনে সুস্থিত হওয়ায় কেরী ভাষা চর্চায় আরও মনোযোগ দেন; রামরাম বসুর সাহায্যে বাইবেলের বাংলা অনুবাদও চলতে থাকে। কেরী আশপাশের গ্রামে ধর্মপ্রচার করতে থাকেন, ধর্মপ্রচারের জন্য কখনও কখনও তিনি কুড়ি মাইল হাঁটতেন। মদনাবাটিতে কেরী নীলচাষ ও নীল উৎপাদনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অবহিত হন, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বৃক্ষলতাদি, চাষবাস এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। অপর দিকে পুত্রদের শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা না হওয়ায়, য়ুরোপীয় প্রথায় য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় পুত্রদের মানুষ করতে না পারায় ডরোথির অসন্তোষ বেড়েই চলে। মদনাবাটিতে অবস্থানের একবৎসরের মধ্যেই রোগভোগে কেরীর তৃতীয়পুত্র পিটারের মৃত্যু হয় এবং তাঁকে সমাহিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখজনক সামাজিক অপ্রীতিকর অবস্থা উদ্ভূত হওয়ায় ডরোথির মানসিক বিকার উন্মত্ততায় পরিণত হয়।

এই সময় কেরী বাংলাভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও শিখতে আরম্ভ করেন। পরবর্তী

কালে কলকাতায় বিখ্যাত পণ্ডিত বহুশাস্ত্রবিদ্ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের[৫] কাছে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা পূর্ণতা পায়।

কেরী মদনাবাটিতে বালকদের জন্য একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেন, সেখানে তিনি নিজেও মাঝে মাঝে নীতিশিক্ষা দিতেন। এর মধ্যে রামরাম বসু গুরুতর সামাজিক অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় কেরী দুঃখিতচিত্তে তাঁকে বিদায় দেন। রামরাম বসুর সঙ্গে পাঠশালার গুরুমশাইও পলায়ন করেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন ফাউনন্টেন নামে একজন ধর্মযাজক কেরীর সহায়করূপে মদনাবাটিতে আসেন। ফাউন্টেন অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাভাষা শিখে নেন। পুত্র ফেলিক্স এবং জন ফাউন্টেনের সাহায্যে কেরী বাইবেলের নিউটেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ সমাধা করেন এবং বাইবেলের অনুবাদ মুদ্রণের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হন। কিন্তু মুদ্রণের ব্যয় অত্যন্ত বেশি বিবেচিত হওয়ায় কেরীর অভিলাষ কার্যে রূপান্তরিত হয়নি। কলকাতায় একটি কাঠের মুদ্রণ যন্ত্র নিলামে বিক্রয় হবে এই বিজ্ঞাপন দেখে কেরী প্রেসটি ক্রয় করার জন্য ব্যগ্র হন। ধর্মপ্রাণ জর্জ উডনি মুদ্রণ যন্ত্রটি কিনে কেরীকে উপহার দেন। কিন্তু পরপর দুবছর বন্যা ও খরায় নীলচাষের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। একটি জাহাজডুবি হওয়াতেও জর্জ উডনির বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়। কেরীর প্রতি যথার্থ সহানুভূতি সম্পন্ন হলেও উদারহৃদয় উডনি মদনাবাটি ও মহীপালদিঘির নীলকুঠি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। কেরী আবার বেকার হয়ে পড়েন, অবশেষে নিজের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে নিকটবর্তী খিদিরপুরে একটি নীলকুঠি কিনে স্বাধীনভাবে নীলচাষের সিদ্ধান্ত নেন। মদনাবাটির দিনগুলিতেই অধ্যাপক কোলব্রুকের সঙ্গে কেরীর পরিচয় ঘটে, পরে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কোলব্রুক কেরীকে হিন্দুস্থানীভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত করেন।

শ্রীরামপুরমিশন, ফোর্টউইলিয়ম কলেজ ঃ

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে কেরী সংবাদ পান কয়েকজন ব্যাপটিস্ট মিশনারি বাংলাদেশে আসছেন। তাঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য কেরী ফাউন্টেনকে পাঠান। এই দলে ছিলেন মুখ্যত জোশুয়া মার্শম্যান,[৬] উইলিয়ম ওয়ার্ড[৭], ব্রান্সডন[৮], গ্রান্ট[৯] ও তাঁদের পরিবারবর্গ। তাঁদের কাছে উপযুক্ত ছাড়পত্র না থাকায় তাঁরা দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুর শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উইলিয়ম ওয়ার্ড কেরীর সঙ্গে পরামর্শের জন্য ফাউন্টেনের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে খিদিরপুরে যান। কেরী প্রথমে চেয়েছিলেন মিশনারিরা উত্তরবঙ্গে গিয়ে খিদিরপুরেই মিশন গঠন করেন। কিন্তু ওয়ার্ডের কাছে তিনি মিশনারিদের হায়রানির ঘটনা শোনেন। শ্রীরামপুরের দিনেমার অধিকর্তা কর্নেল বী-এর প্রদত্ত নিরাপত্তার আশ্বাস এবং কলকাতার যাজক ডেভিড ব্রাউন যে পরামর্শ দেন,[১০] সেই সমস্ত বিষয়ই কেরী ওয়ার্ডের কাছ থেকে বিস্তৃতভাবে শোনেন। নিরাপত্তার প্রয়োজনেই কেরী

শ্রীরামপুরেই মিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন নিজের কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত সমস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করে, কেবলমাত্র কাঠের মুদ্রণ যন্ত্রটি, বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ও অন্যান্য পুস্তকের খসড়া কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে আরেকবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পাড়ি দেন কেরী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যূষ লগ্নে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের শুভসূচনা হয়েছিল। মিশনারিরা সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ উইলিয়ম কেরীকে নেতা নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু কেরী যৌথনেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন। মিশন প্রতিষ্ঠার প্রথম সন্ধ্যাতেই কেরী সভা করে মিশনের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করেন এবং দায়িত্ব ভাগ করে দেন। মোরাভিয়ান প্রথায় বিশ্বাসী কেরী হিসাব করে দেখান যে মিশনারি পরিবারগুলি একটি যৌথপরিবারে সামিল হলে ব্যয়সঙ্কোচ করা সম্ভব। মিশনের বিভিন্ন কার্যের দায়িত্বও বিভিন্ন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয়—উইলিয়ম কেরী অনুবাদ সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারের ভার গ্রহন করেন। আর্থিক বিষয় এবং ঔষধাদি রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেন। জোশুয়া মার্শম্যান ও তাঁর পত্নী হানা মার্শম্যান শিক্ষার ভার নেন। শ্রীরামপুরে য়ুরোপীয় বালকবালিকাদের জন্য দুটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মিশনের অর্থকৃচ্ছতার দিনে বিদ্যালয় দুটি অর্থাগমের পথ সুগম করে। প্রেসের দায়িত্ব নিয়েছিলেন উইলিয়ম ওয়ার্ড। ইংলন্ড থেকে বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রার আগেই লন্ডনে উইলিয়ম ওয়ার্ডের সঙ্গে কেরী মিলিত হয়েছিলেন। তখনই কেরী ওয়ার্ডকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বঙ্গদেশে কেরীর কাজ যদি সফল হয়, তবে প্রয়োজনে ওয়ার্ড যেন বঙ্গদেশে এসে কেরীকে সাহায্য করেন।[১১] ওয়ার্ড ছিলেন সুদক্ষ মুদ্রাকর। ব্রান্সডন এবং উইলিয়ম কেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্স কেরী ওয়ার্ডের সাহায্যকারী ছিলেন। কাঠের মুদ্রণযন্ত্রটির সাহায্যেই ওয়ার্ড কাজ আরম্ভ করেন। মুদ্রণের ব্যয় সঙ্কোচের জন্য শ্রীরামপুরে কাগজের কল এবং প্রেসের কালি উৎপাদনের কারখানাও স্থাপিত হয়।

জন ফাউন্টেনের উপর গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং মিশনের মহিলারা পারিবারিক হিসাব রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বস্তুত শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকেই উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড এই তিনজনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং এঁরা শ্রীরামপুরত্রয়ী নামে বিখ্যাত হন।

মিশনপ্রতিষ্ঠার পরদিন সন্ধ্যাতেই শ্রীরামপুরত্রয়ী শ্রীরামপুরের দিনেমার অধিকর্তা কর্নেল বী-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং মিশন প্রতিষ্ঠার ও বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্পের সংবাদ দেন। কর্নেল বী তাঁদের উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ জানান এবং সাহায্যের আশ্বাস দেন। কর্নেল বী তাঁদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার প্রার্থনা জানিয়ে দিনেমার সম্রাটের কাছে আবেদনের পরামর্শ দেন। মিশনরিরা কর্নেল বী-এর মাধ্যমে সেইমতো আবেদন পত্র পাঠান। কিছুদিন পরে তাঁরা শ্রীরামপুরে বসবাস করার অনুমতি

ও নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করেন—"ডেনমার্কের রাজার আশ্রয়াধীন নাগরিক হন শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনারিরা।"

এদিকে উইলিয়ম ওয়ার্ডের নেতৃত্বে পুরোদমে ছাপাখানার কাজ চলতে থাকে। ১৮০০ সনের মার্চ মাসে সেন্টম্যাথুর সুসমাচারের একটি পৃষ্ঠা ছাপা হয়। "সেদিন মিশনারি গোষ্ঠীর উৎসাহের সীমা ছিল না।" ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে সেন্টম্যাথুর মঙ্গলসমাচারের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়—"মঙ্গল সমাচারো মতীয়ের রচিত।" শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত এটিই প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ। তার আগে খ্রিস্টীয়মন্ডলীতে গেয় কতকগুলি সঙ্গীত (যার কয়েকটি হয়তো কেরীর রচিত) এবং রামরাম বসু রচিত 'হরকরা' মুদ্রিত হয়। ম্যাথুর মঙ্গলসমাচার পুস্তিকাকারে বিতরণ করা হয়েছিল। ক্রমে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস এশিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রেসরূপে খ্যাতি লাভ করে।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও কলেজে বিভিন্নবিষয়ে যথারীতি পঠনপাঠন আরম্ভ হয়েছিল পরবৎসর ফ্রেব্রুয়ারি মাসে। ১৮০১ সনের ৮ই এপ্রিল উইলিয়ম কেরীর জীবনে একটি বিশেষ দিন। ঐদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উপাধ্যক্ষ ক্লডিয়াস বুকানন ও প্রোভোস্ট ডেভিড ব্রাউন কেরীকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলাভাষার শিক্ষকের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ঐ পদ গ্রহণে প্রথমে কেরীর মনে দ্বিধা ছিল, হয়তো শিক্ষকতা মিশনের কাজে বাধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু তাঁর যাজক ভ্রাতৃগণ তাঁকে এই পদগ্রহণে উৎসাহিত করেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে কেরী বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকরূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেন। দুমাস পরে তিনি সংস্কৃত বিভাগেরও শিক্ষক নিযুক্ত হন, পরে মারাঠা বিভাগের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কোলব্রুক উচ্চতর সরকারী কাজে ব্যাপৃত হন; তাঁর স্থলে সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন কেরী। এই সময়ে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক (প্রোফেসর) পদে উন্নীত হন।

উনিশ শতকের প্রথমদিকেই ১৮০৬ সনে কেরী এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। সোসাইটির মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৮০৭ সনে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় উইলিয়ম কেরীকে ডক্টর অফ ডিভিনিটি উপাধি প্রদান করেন। ঐ বৎসরই দীর্ঘ বারো বৎসর কঠিন রোগভোগের পর কেরীর পত্নী ডরোথির জীবনাবসান ঘটে। ঐ বৎসরই উইলিয়ম কেরী শার্লট রুমার নামে সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক জার্মান ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করেন। মিস রুমার দিনেমার রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি শ্রীরামপুর মিশনের নানা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ওল্ডটেস্টামেন্টের দ্বিতীয়বর্গ 'যিশরাএলের বিবরণ' মুদ্রিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই বাইবেলের বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। কেরীর জীবনের ব্রত "Expect great things from God. Attempt great things for God." সফল হয়। এই সাফল্যের উত্তেজনায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় দুমাস কঠিন জ্বর ও বিকারে পীড়িত থাকেন। এই সময়ের মধ্যে উইলিয়ম কেরীর গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মারাঠি, পঞ্জাবী ও কর্ণাটক ভাষায় ব্যাকরণ রচিত হয়। বিভিন্ন ভারতীয়ভাষায় অনূদিত বাইবেলের প্রকাশনাও চলতে থাকে।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দ শ্রীরামপুর মিশন তথা কেরীর জীবনে অত্যন্ত দুর্বৎসর। ঐ বৎসর মার্চমাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মিশনপ্রেসের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হয়, অনেক পুস্তক নষ্ট হয়। অগ্নিকাণ্ডে মিশনের ক্ষতিগ্রস্ত পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন ভাষার হরফ ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ দ্রবাদির তালিকা কেরী প্রস্তুত করান। দেখা যায় কেবলমাত্র আর্থিক ক্ষতিই হয়েছিল সত্তরহাজার টাকার। কিন্তু প্রকৃতক্ষতি হয় অপূরণীয়। শ্রীরামপুরমিশন অগ্নিকাণ্ডে প্রেসের ক্ষতির একটি হিসাব প্রস্তুত করেন এবং দেশবিদেশে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। এই আবেদনে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করে।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। উইলিয়ম কেরী প্রথমাবধিই ঐ সোসাইটির একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসরই শ্রীরামপুর মিশনের মুখ্যত্রয়ীর উদ্যোগে এশিয়াবাসী খ্রিস্টান যুবকদের উচ্চতরশিক্ষার জন্য শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ বছরই মে মাসে মিশনকর্তৃপক্ষ 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ সময়েই ইংরেজি মাসিক পত্রিকা 'দি ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরমিশনের মুখ্যত্রয়ী পত্রিকাটির পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মুখ্যত উইলিয়ম কেরীই ছিলেন পরিচালক। 'ফ্রেন্ড-অফ-ইন্ডিয়া'য় কেরীর কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শিক্ষামূলক মাসিক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন'ও এই সময় শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দেই কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধান প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি কেরীর উজ্জ্বলতম কৃতিত্ব। ১৮২০ সনে উইলিয়ম কেরী কলকাতায় এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা কেরীর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে কেরীর দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কেরী তৃতীয়বার বিবাহ করেন। ঐ বৎসরই তিনি বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির সদস্য হন। ১৮২২ সনে জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্সের মৃত্যুতে এবং ১৮২৩ সনে দীর্ঘকালের সুহৃদ শ্রীরামপুর মিশনের বিখ্যাতত্রয়ীর অন্যতম সদস্য উইলিয়ম ওয়ার্ডের মৃত্যুতে কেরী অত্যন্ত মানসিক

আঘাত পান। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে কেরী লন্ডন জিওলজিকাল সোসাইটি, রয়াল-এগ্রিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃতির সভ্য নির্বাচিত হন। ঐ বৎসরই শ্রীরামপুরে গঙ্গার ঘাটে নৌকা থেকে নামার সময় পড়ে গিয়ে কেরীর পা ভেঙ্গে যায় এবং তিনি দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম কেরী মাসিক তিনশত টাকা বেতনে ভারত সরকারের অনুবাদক নিযুক্ত হন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ই জুন ৭৩ বৎসর বয়সে উইলিয়ম কেরীর জীবনাবসান হয়। তখন শ্রীরামপুর মিশনের খ্যাতি পশ্চিমে ঢলেছে। মৃত্যুর বেশ কয়েকবছর আগেই বয়ঃকনিষ্ঠ কয়েকজন প্রিয়সহকর্মীকে তিনি হারিয়েছেন। নানা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই-এর পর জীবনে স্থিতি ও খ্যাতির সম্ভাবনার মুখেই হারিয়েছেন প্রিয়তমা পত্নী ডরোথিকে, এই খ্যাতি ও সঙ্গতির স্বাদগ্রহণেও তখন ডরোথি অসমর্থ; যখন কেরী খ্যাতির মধ্যাহ্ন-গগনে তখন প্রতিভাদীপ্ত অথচ ভাগ্যবিড়ম্বিত, প্রাণপ্রিয় ফেলিক্স দীর্ঘ রোগভোগের পর অস্তাচলে ঢলে পড়েছেন। যে বন্ধুদের সঙ্গে তিনি বিদেশে খ্রিস্টধর্মের জয়যাত্রার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাংলাগদ্যের জয়যাত্রায় যাঁরা তাঁর শিক্ষক ছিলেন, সহযাত্রী ছিলেন, আজ তাঁরা সকলেই বিদায় নিয়েছেন। বৃদ্ধ, অশক্ত, অসুস্থ কেরী শেষ পরিণামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, পাশে পুরোনো দিনের একমাত্র সুহৃদ বৃদ্ধ জোশুয়া মার্শম্যান এবং তাঁর সহধর্মিণী হানা মার্শম্যান। দীর্ঘজীবনের বহু সৎকাজ সম্পন্ন করা এবং সার্থকতা লাভের পরও একনিষ্ঠ খ্রিস্টান যাজকের মতোই তাঁর মনে হয়—".......but when I remember all my sins and manyfold imperfections I tremble."[১২]

ধর্মপ্রচারের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হিদেনদের মুক্তির পথ দেখানোর উন্মাদনায় রেভারেন্ড উইলিয়ম কেরী ইংলন্ডের নর্দাম্পটনশায়র থেকে সুদূর ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে আগমনের পর যাজকবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই তাঁর বহুবিধ কর্মধারা বিকশিত হয়েছিল।

ধর্মযাজক কেরী ঃ

উইলিয়ম কেরীর প্রথম ও প্রধান পরিচয় ছিল তিনি রেভারেন্ড উইলিয়ম কেরী, যিনি ডক্টর-অফ-ডিভিনিটি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে সব স্বল্প পরিচিত দেশ আছে সেই সব দেশের অনালোকিত 'ধর্মহীন' হিদেন মানুষদের যিশুখ্রিস্টের প্রেমময়বাণী শোনাবার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়েছিলেন এবং অজানাদেশের অপরিচিত পরিবেশে নির্ভয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন। কেরী মনে করতেন কোন জনগোষ্ঠীকে খ্রিস্টধর্মের আলোকে আলোকিত করতে হলে তাদের মাতৃভাষাতেই খ্রিস্টের বাণী প্রচার করা প্রয়োজন। আর যাঁদের কাছে তাঁরা ধর্মপ্রচার করবেন তাদের আস্থা অর্জনও

একান্ত আবশ্যক। তাই কেরী প্রিন্সেস মারিয়া জাহাজেই ডাঃ টমাসের কাছে বাংলাভাষা শেখা আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশে আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন। ১৭৯৪ সনে দেবহট্ট থেকে মদনাবাটি যাওয়ার পথে চামুরিয়া নামক একস্থানে কেরী প্রথম বাংলায় ধর্ম প্রচার করেন, কিন্তু তাঁর ভাষাজ্ঞানের স্বল্পতার জন্য এই বক্তৃতা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়নি। কেরী মদনাবাটিতে অবস্থানকালেই নিউটেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করেন এবং মুদ্রণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাইবেল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় অনূদিত এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রচারিত হতে থাকে। সংস্কৃত সমেত ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিকভাষা এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি ভাষায়, মোট চল্লিশটি ভাষায় বাইবেল অনূদিত ও প্রচারিত হয়। কেরী এবং তাঁর যাজক ভ্রাতৃবৃন্দ বাংলাভাষায় খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক কতকগুলি প্রচার পুস্তিকাও রচনা করেন, সেইগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কেরী নিজে, তাঁর মুনসি রামরাম বসু এবং শ্রীরামপুর মিশনের অন্যান্য সদস্যরা যিশুখ্রিস্ট বিষয়ক কিছু কিছু গীত রচনা করেন, এগুলি অবশ্য খ্রিস্টমণ্ডলীতেই গাওয়া হত।

উত্তরবঙ্গে মদনাবাটিতে অবস্থান কালেই কেরী কখনও পদব্রজে কখনও বা নৌকাযোগে দূরদূরান্তরের গ্রামে ধর্মপ্রচারে যেতেন। প্রথমদিকে ভাষার ব্যবধান যদিও বাধার সৃষ্টি করত তবুও গ্রামের সাধারণ মানুষ মন দিয়ে বাইবেলের বাণী শুনতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতার কালে কেরী সপ্তাহে তিনদিন কলকাতায় থাকতেন কিন্তু শ্রীরামপুরে ফিরে প্রতি শনিবার এবং অন্যান্য বারেও কাছাকাছি গ্রামে ধর্মপ্রচারে যেতেন। কেরীর চিঠিপত্র ও জার্নাল থেকে জানা যায় হিন্দুরা প্রায়ই মনোযোগ সহকারে ধর্মযাজকদের বক্তব্য শুনতেন, তবে ধর্মান্তর গ্রহণে কারুরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যেতনা। মুসলমান সম্প্রদায় অবশ্য কখনই খ্রিস্টধর্ম প্রচারকে ভাল চোখে দেখেননি।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুর মিশনের সমুখস্থ গঙ্গার ঘাটে কৃষ্ণপাল নামক জনৈক ভদ্রলোক কেরীর কাছে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পীতাম্বর সিংহ নামে অপর এক ভদ্রলোকও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। কিন্তু ধর্মান্তরিতকরণের ক্ষেত্রে কেরী বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেননি। সেই কারণে ইংলন্ডের মূল ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটি কেরীর প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট হন। ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তরিতকরণ কেরী পছন্দ করতেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল তিনি খ্রিস্ট ধর্মের মহিমা ও ঈশ্বরের বাণী প্রচার করবেন; ধর্মান্তর গ্রহণ করা বা না করা ঈশ্বরের ইচ্ছা নির্ভর। কেরী নিজেকে কোন সম্প্রদায়ের কাছে দায়বদ্ধ অপেক্ষা ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন সেবক ভাবতেই ভালবাসতেন।[১৩]

শিক্ষাব্রতী উইলিয়ম কেরী ঃ

বিদ্যালয় স্থাপন ছিল মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের অন্যতম অঙ্গ। মিশনারিরা দুঃস্থ অনাথ ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করতেন। এই সব বিদ্যালয় বা পাঠশালায় গল্পের ছলে যিশুখ্রিস্টের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হত এবং খ্রিস্টীয় নীতিশিক্ষার সাধারণ পরিচয় দেওয়া হত। মিশনারিরা আশা করতেন পরবর্তীকালে ছাত্রদের অনেকেই খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করবে। মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণত লেখা, পড়া ও গণিতই ছিল শিক্ষণীয় বিষয়।

উইলিয়ম কেরী ১৭৯৪ সনে মদনাবাটিতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮০০ সনে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পর কেরী তাঁর যাজকভ্রাতৃগণের সহযোগিতায় শ্রীরামপুরেও এই ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাঠশালা মুখ্যত ধর্মপ্রচারের সাহায্যের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমে এই পাঠশালাগুলিতে ছাত্র সংখ্যা ছিল খুবই কম, কারণ অভিভাবকরা মনে করতেন এই পাঠশালায় পড়ানোর ছলে ছাত্রদের খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা হবে। অভিভাবকদের সে চিন্তা অমূলক ছিলনা, কিন্তু অন্যান্য খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠানের মতো শ্রীরামপুর মিশনে ধর্মান্তরিতকরণের জন্য কোনপ্রকার জুলুম ছিল না। ক্রমশ বিনাবেতনে সামান্য লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য দরিদ্র পিতামাতারা সন্তানদের মিশনারি পাঠশালায় পাঠাতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর মিশন পরিচালিত পাঠশালাগুলি অনেকাংশে ধর্মনিরপেক্ষ হয় এবং লেখা, পড়া ও গণিতের সঙ্গে ভূগোল, ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়। শ্রীরামপুর মিশন গঙ্গার উভয়তীরে অনেকগুলি পাঠশালা স্থাপন করে। অনেক সময় স্থানীয় ধনী ও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থরা নিজেদের বাড়ির একাংশ বা নাটমন্দির পাঠশালা বসানোর জন্য ছেড়ে দিতেন।[১৪] এই সব বিদ্যালয়ে মুদ্রিত পুস্তক ও সারণী (table) উভয়ের সাহায্যেই শিক্ষাদান করা হত। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানই ছিল শ্রীরামপুর মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য। কেরীর উৎসাহে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হলেও শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষাব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের সর্বময় কর্তা ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যান। মার্শম্যানের বিখ্যাত রচনা 'Hints relative to Native Schools Together with the outline of An Institution for Their Extension and Management' (শ্রীরামপুর ১৮১৬)-এ মিশন পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[১৫] শ্রীরামপুর মিশন একটি নর্মাল স্কুলও স্থাপন করে। নর্মাল স্কুল থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।

বালকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও, শ্রীরামপুর মিশনের প্রথমযুগে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে উইলিয়ম কেরী বালিকাদের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। একবার বালকদের সঙ্গেই বালিকাদের শিক্ষার

ব্যবস্থা করা হয়। বালিকারা চিকের আড়ালে বসে পাঠগ্রহণ করত, কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। পরে অন্যান্য মিশনারি সোসাইটি যখন বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতে থাকে তখন শ্রীরামপুর মিশনও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে এগিয়ে আসে। শুধু শ্রীরামপুরে নয়, মিশন বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করে।[১৬] শ্রীরামপুরে ছাপা কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যায়। জনশিক্ষার জন্য কথকতা, পাঁচালীগান, মঙ্গলগান প্রভৃতি যে পুরাতন লৌকিক উপাদান আমাদের ছিল শ্রীরামপুরে ছাপা এই বইগুলি তারই স্থান অধিকার করেছিল।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও মুখ্যত এশীয় খ্রিস্টানযুবকদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য এই কলেজ স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্যই এই শিক্ষায়তনের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য এই কলেজ প্রতিষ্ঠাকে ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটি ভালচোখে দেখেননি। দূরদর্শী কেরী কলেজের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দিনেমার সম্রাটের কাছে এইমর্মে আবেদন করেন যে, শ্রীরামপুর কলেজ যেন ছাত্রদের উপাধি দান করতে পারে। শ্রীরামপুর মিশনের জনহিতকর কার্যে প্রীত হয়ে ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডরিক ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজকে রাজকীয় সনদ প্রদান করেন। এই সনদের বলে শ্রীরামপুর কলেজ উপাধিদানের ক্ষমতা লাভ করে এবং এশিয়া মহাদেশে প্রথম যুরোপীয় ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে উঠে।[১৭]

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট অনুসারে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একলক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। সরকারের প্রতিনিধিরূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভারতীয়দের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা রচনা করেন।[১৮] শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি প্রধানত ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করে।[১৯] উইলিয়ম কেরী ফ্যাকালটির একমাত্র য়ুরোপীয় সদস্য যিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুপারিশ করেছিলেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে কেরী ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছিল। এমনকি এই শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অর্থসংস্থানের উৎসগুলিও তিনি চিহ্নিত করেন। উইলিয়ম কেরী অপর একটি পরিকল্পনাও পেশ করেন; সেই পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষার্থী স্থানীয় যুবকদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ভর্তির সুপারিশ করা হয়। দুটি পরিকল্পনার কোনটি গৃহীত হয়নি। প্রথম পরিকল্পনাটি ছিল অনেকাংশে জনশিক্ষামুখী এবং পরিকল্পনাটি গৃহীত হলে বঙ্গদেশের শিক্ষার মানচিত্র অন্যরূপ ধারণ করত।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে বড়লাটের কাউন্সিল শিক্ষার ব্যাপারে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই সমিতির দশজন সদস্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও

ভারততত্ত্ববিদ্ হোরেস হেমান উইলসন।[২০] শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কর্মভার এই সমিতির উপর ন্যস্ত হয় এবং সমিতি শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সমস্ত অর্থই ভারতীয় প্রথাগত শিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন।[২১] ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষার স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

General Committee of Public Instruction-এর দশজন সদস্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। উইলসনের নেতৃত্বে একদল ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষার সুপারিশ করেন। অপরদল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন। ১৮৩৪ সনে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে General Committee of Public Instruction-এর সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যধারায় ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদানই শিক্ষানীতি রূপে স্বীকৃত হয়। বঙ্গদেশের দরিদ্র জনগণের কাছে উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।[২২]

অথচ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের অনেক আগে থেকেই কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান শুরু করেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শেখানো হত। তাঁরা সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি ভাষাকেও অবহেলা করেননি। শ্রীরামপুর মিশনের পরিচালকগণ একদিকে যেমন সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ, ষড্‌দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনাদি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন, তেমনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে অবহেলা করেননি। বড়লাট মার্কুইস অফ হেস্টিংস উইলিয়ম কেরীর এই শিক্ষাভাবনার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন।[২৩] কিন্তু কলকাতার ধনী, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কেউই শ্রীরামপুর মিশনের এই আদর্শ শিক্ষানীতির প্রতি মেকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি, বরং ইংরেজিকেই শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য রামমোহন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনেক আগেই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। অবশ্য মেকলের পরিচালনায় শিক্ষানীতিটি আইনে পরিণত হওয়ার আগেই রামমোহনের মৃত্যু হয়।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। কেরী এই সোসাইটির কার্যক্রমের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। তিনি এই সোসাইটির প্রথম পরিচালক সমিতির অন্যতম মাননীয় সদস্য ছিলেন। "স্কুলবুক সোসাইটি বঙ্গদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক সংকলন ও প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।" স্কুলবুক সোসাইটির কাজকর্ম ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়ম কেরী শিক্ষাপ্রচারের স্বার্থে এই ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করতে দ্বিধা করেননি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকরূপেও কেরী ছিলেন আদর্শ। বাংলা, সংস্কৃত ও

মারাঠাবিভাগের পণ্ডিত ও মুনসিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রীতির ও সৌহার্দ্যের, কর্তৃত্বের নয়। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়বিদ্যালঙ্কারের প্রতি কলেজ কর্তৃপক্ষের অবিচারের তিনি প্রতিবাদ করেন এবং তাঁকে অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেন।[২৪] কোন উদ্ধত ছাত্র শিক্ষকের প্রতি অবমাননাকর ব্যবহার করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তার শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করতেন। আবার তাঁর কোন ছাত্র কোন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। ছাত্রদের সকল প্রকার উদ্যোগের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রাণের সংযোগ। উইলিয়ম কেরী ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, বিশেষত বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উইলিয়ম কেরী ও বাংলা সাহিত্য ঃ

বাইবেলের বাংলা অনুবাদ প্রচারণার প্রায় সমকালেই বাংলাভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ একজন য়ুরোপীয় রূপে, য়ুরোপীয় সমাজে কেরী খ্যাতি লাভ করেন এবং সেই সূত্রেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড A Grammar of Bengal Language পুস্তকের ভূমিকায় সংস্কৃতভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার সম্পর্কটির প্রতি শিক্ষিতব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে, আরবি-ফারসি শব্দের অপরিমিত প্রয়োগ বাংলাভাষার পক্ষে ক্ষতিকর। হ্যালহেড, ফর্স্টার, ডানকান প্রমুখ উচ্চ রাজকর্মচারীগণ তাঁদের রচনায় আরবি-ফারসি শব্দ বিতাড়নের[২৫] যে মহাযজ্ঞ শুরু করেছিলেন অনেকেই কেরীর নামও তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

পরবর্তীকালে কোন কোন লেখক বাংলাভাষা থেকে আরবি-ফারসি শব্দবিতাড়নের জন্য য়ুরোপীয় লেখকদের এই প্রয়াসকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে করেছেন। ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ভাষার ক্ষেত্রেও এই রাজকর্মচারীরা পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের অস্তিত্বকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগ হয়তো সর্বাংশে সত্য নয়। মধ্যযুগে আলাওল, দৌলতকাজী প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিরা তৎসমবহুল শব্দেই তাঁদের কাব্যরচনা করেছেন। দলিল দস্তাবেজে, প্রাত্যহিক প্রয়োজনে আরবি, ফারসি শব্দ হয়তো প্রচুর ব্যবহৃত হত, কিন্তু সাহিত্যে তা তেমনভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রই প্রথম কবি যিনি কাব্যে প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করলেন এবং তা করেছিলেন কাব্যেরই প্রয়োজনে—“অতএব কহি কথা যাবনীমিশাল।”

যাইহোক, ভারতবর্ষে আগমনের পরে, বাংলাভাষা শিক্ষা শুরুকরার কিছুদিনের মধ্যেই উইলিয়ম কেরী বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বাংলাভাষার সাধু ও চলিত দুই রীতির সঙ্গেই তিনি পরিচিত ছিলেন যদিও সাধু ও

চলিত বাংলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব পরিষ্কার ছিলনা, বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে কেরী সচেতন ছিলেন এবং আশাপোষণ করতেন যে নিরন্তরচর্চায় এই শব্দসম্পদপূর্ণভাষা একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

উইলিয়ম কেরী বিশ্বাস করতেন—"The Bengalee Language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none." ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগে যোগদানের পর পাঠ্যপুস্তকের অভাবে কেরী বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হন। বিদেশী ছাত্রদের ভাষা শেখানোর উপযুক্ত কোন গদ্যগ্রন্থ ছিলনা। সমৃদ্ধ বাংলা ভাষায় উচ্চমানের সাহিত্যরচনার দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু সে সাহিত্য পদ্যে রচিত। বাংলাগদ্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত; গুহ্যসাধন বিষয়ক গদ্য পুঁথিও ছিল, কিন্তু সাহিত্যিক গদ্যের কোন নিদর্শন কেরী পাননি। কোন বিদেশী ছাত্রকে ভাষাশিক্ষা দেওয়ার প্রাথমিক স্তরে কবিতা উপযুক্ত বাহন নয়। সুতরাং বাংলা পঠনপাঠনের জন্য কেরী প্রথমেই পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি নিজে ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা এবং বাংলা-ইংরেজি অভিধান সংকলনে ব্রতী হন এবং 'কথোপকথন' গ্রন্থটি সংকলিত হয়। কেরী বাংলাবিভাগের পণ্ডিত ও মুনসিদের পাঠ্যপুস্তক রচনায় উৎসাহিত করেন। অত্যল্প কালের মধ্যেই রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে) মৌলিক গ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্যচরিত' রচনা করেন। বাইবেলের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের একমাসের মধ্যেই 'প্রতাপাদিত্যচরিত' প্রকাশিত হয় (১৮০১)। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে রামরাম বসুর অপর গ্রন্থ 'লিপিমালা' প্রকাশিত হয়। 'লিপিমালায়' চল্লিশটি চিঠি আছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় কিভাবে চিঠিপত্র লেখা হয়, বিদেশী ছাত্রদের সেই বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই পুস্তকটি রচিত।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দেই গোলকনাথ শর্মার (মৃত্যু-১৮০৩) 'হিতোপদেশ' শ্রীরামপুর মিশনপ্রেসে মুদ্রিত হয়। পুস্তকটি বিখ্যাত সংস্কৃত নীতিগল্প 'হিতোপদেশের' অনুবাদ। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থগুলি অবলম্বন করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনেকেই বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে 'বত্রিশসিংহাসন' এবং ১৮০৮ সনে 'হিতোপদেশ'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়, লেখক ফোর্টউইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ১৮০৮ সনে মৃত্যুঞ্জয় রচিত 'রাজাবলি' প্রকাশিত হয়। এটি অবশ্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব ছাত্রদের জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ব্যাকরণাদি বিভিন্নশাস্ত্র এবং জনপ্রিয় উপাখ্যানের সমন্বয়ে একটি অপূর্ব গ্রন্থ 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৮১৩ সনে রচিত হলেও তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাবিভাগের অন্যতম পণ্ডিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের

মৌলিক গ্রন্থ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্যচরিত্রং' মুদ্রিত হয়। চণ্ডীচরণ মুনসি (মৃত্যু ১৮০৮) ফারসি গ্রন্থ 'তুতিনামা'র হিন্দুস্থানী অনুবাদকে অবলম্বন করে 'তোতাইতিহাস' রচনা করেন, গ্রন্থটি ১৮০৫ সনে প্রকাশিত হয়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বিদ্যাপতির সংস্কৃত গ্রন্থ 'পুরুষপরীক্ষা'র অনুবাদ। তারিণীচরণ মিত্র (১৭৭২-১৮৩৭) যদিও হিন্দুস্থানী বিভাগের মুনসি ছিলেন, তবু তাঁর 'ওরিয়েন্টালফেবুলিস্ট' বাংলা গদ্য পাঠ্যগ্রন্থে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থটি 'ঈশপস্‌ফেবলস্‌'-এর বাংলা অনুবাদ। তারিনীচরণ নানা জনহিতকর কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এইভাবে কেরীর উৎসাহ ও পরিচালনায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগের ছাত্রদের জন্য বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। ছাত্রদের প্রয়োজনে রচিত এই গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের সূচনা করে। মূলত অনুবাদনির্ভর হলেও এই গ্রন্থগুলিতে বিশৃঙ্খল বাংলাগদ্যকে একটি সুশৃঙ্খল রীতিতে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, এমন কি কোন কোন গ্রন্থে যেমন মৃত্যুঞ্জয়বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের চকিত আভাসও দুর্লভ নয়। কিন্তু বাংলাগদ্যের এই প্রাথমিক প্রয়াস উইলিয়ম কেরীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। সমকালীন অনেক লেখকই কেরীর এই কৃতিত্বকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়েছেন। রামকমল সেন তাঁর সুবিখ্যাত অভিধানের ভূমিকায় কেরী ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন।[২৬]

বাংলা বিভাগের পণ্ডিতদের বিশেষত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রভাবে বাংলা পুস্তকগুলির ভাষা ক্রমশ সংস্কৃতঘেঁষা হতে থাকে। হ্যালহেড এবং ফর্স্টার বাংলাভাষাকে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগবাহুল্য থেকে মুক্ত করে তৎসম-শব্দপ্রধান করার যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন উইলিয়ম কেরী সেই প্রচেষ্টাকে আরও সফল করেন। কেরীর সমসাময়িক বাংলাসাহিত্যের অতিরিক্ত সংস্কৃতনির্ভরতা সম্বন্ধে সীটনকারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।[২৭] উইলিয়ম কেরী এবং তাঁর সহকর্মীদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় বাংলাগদ্য ক্রমেই একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করছিল।

কেবলমাত্র বাংলাভাষা নয়, মারাঠি ভাষার শিক্ষক কেরী মারাঠি ভাষারও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। মারাঠি ভাষার পণ্ডিত বৈদ্যনাথের সহায়তায় কেরী মারাঠি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার উন্নতিতেও কেরীর দান কম নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুনসিদের সাহায্যে কেরী ওড়িয়া, পঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণও রচনা করেন। শ্রীরামপুর মিশনে বাইবেল অনুবাদের সহায়তার জন্য যে সব পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন তাঁরাও কেরীকে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিলেন।

উইলিয়ম কেরী ও ভাষাতত্ত্ব ঃ

উইলিয়ম জোন্স সংস্কৃত, ইরানীয়, গ্রিক প্রভৃতি ভাষার মধ্যে সাদৃশ্যটি গভীর ভাবে পর্যালোচনা করেন। তাঁকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদ্যার জনক বলা হয়। উইলিয়ম কেরীও গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন এবং পারসিক ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্যটুকু তাঁর দৃষ্টির অগোচর ছিল না। কেরী তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় বারংবার উচ্চারণ করেছেন সংস্কৃত ভাষাই উত্তরভারতের অধিকাংশ ভাষার জননী। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালাম প্রভৃতি ভাষাগুলির উৎস সম্বন্ধে তাঁর সঠিক ধারণা ছিলনা। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সংস্কৃত ভাষা ঐ ভাষাগুলির শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেও ভাষাতত্ত্বের মূলতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য কেরী করেননি, আর তার অবকাশও ছিল। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা তখনও তেমন ব্যাপক প্রসারলাভ করেনি।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী উইলিয়ম কেরী ঃ

বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতির প্রতি উইলিয়ম কেরীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ রক্সবার্গ যখন অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যান তখন উইলিয়ম কেরী কিছুদিন অস্থায়ীভাবে বোটানিক্যাল গার্ডেন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৮] ডঃ রক্সবার্গের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে দুটি বিখ্যাত বই Hortus Bengalensis এবং Flora Indica শ্রীরামপুর মিশনপ্রেসে মুদ্রিত হয়। বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ডঃ রক্সবার্গ একপ্রকার গুল্মের নাম দেন 'কেরীয়া।' ডাঃ রক্সবার্গের মৃত্যুর পর তাঁর Flora Indica গ্রন্থটি উইলিয়ম কেরী সম্পাদনা করেন। শ্রীরামপুরে কেরী একটি বিশাল উদ্যান রচনা করেন। দেশীয় গাছপালার একটি দীর্ঘ তালিকাও তিনি প্রণয়ন করেন। কেরীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে ১৮৩৯ সনে Mr. J. O. Voigt কেরীর উদ্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[২৯] Mr. Voigt ভারতীয় বৃক্ষলতাদির সম্পর্কে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন তাতে কেরীকৃত তালিকাটিও অন্তর্ভূক্ত হয়।[৩০] কেরীর সংকলিত উদ্ভিদের নামগুলি উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হতে পারে এবং এই পরিভাষা বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করবে। কেবলমাত্র উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীরূপেই উইলিয়ম কেরী বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

জনকল্যাণ ব্রতে উইলিয়ম কেরী ঃ

নির্যাতিত, দুঃখিত, পাপীতাপী মানুষকে ত্রাণ করার জন্যই প্রেম ও করুণার আধার যিশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং মানবপ্রেম প্রচারে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, শেষপর্যন্ত অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। দরিদ্র ও পীড়িত মানুষকে সাহায্য করা, দুর্দশা থেকে উদ্ধার করাই খ্রিস্টধর্মের মহান

উদ্দেশ্য। একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, খ্রিস্টান ধর্মযাজকরূপে উইলিয়ম কেরী খ্রিস্টধর্মের এই মহিমাকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকেই বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য স্বদেশ ইংলন্ড থেকে সুদূর বঙ্গদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও নানা নিষ্ঠুরপ্রথা বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। এই নিষ্ঠুর প্রথাগুলিকে ধর্মের আবরণে আবৃত করা হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষ এই নিষ্ঠুর প্রথাগুলিকেপালন করাই ধর্মাচরণ মনে করতেন। এই রকম কিছু নিষ্ঠুর ও কুৎসিত প্রথা ছিল শিশুহত্যা, সতীদাহ, কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত দগ্ধ করা ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ এই প্রথাগুলিকে ধর্মের অঙ্গরূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং এইসব ব্যাপারে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে এইসব প্রথার নিষ্ঠুর কুৎসিত দিকগুলি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত। কিন্তু বিদেশীদের কাছে ঘটনাগুলি হত্যারই নামান্তর ছিল। বঙ্গদেশে আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উইলিয়ম কেরী এই সংস্কারগুলির সঙ্গে পরিচিত হন, তাঁর হৃদয় করুণায় আপ্লুত হয় এবং তিনি এই কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সাধারণ মানুষ মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জনকে বিশেষ পুণ্যজনক কর্ম বলে মনে করতেন। অনেক সময় বিশেষ কোন আপদ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিশুকে দেবতার কাছে মানত করা হত।[৩১] কেরী স্থির করেন এই নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপের জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী আলোকজান্ডার ডাও এবং চার্লস গ্রান্ট কেরীর আগেই এই বর্বর প্রথাগুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, কিন্তু কোন কার্যকর ভূমিকা তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকরূপে তাঁর নিযুক্তিতে কেরী কোম্পানি সরকারের ঊর্ধতন রাজপুরুষদের নিকটতর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। তাঁর বন্ধু জর্জ উডনি তখন গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের একজন সদস্য। উইলিয়ম কেরী তাঁর মাধ্যমে শিশুহত্যার কুসংস্কারটি গভর্নরজেনারেল ওয়েলেসলির গোচরে আনেন। বড়লাট ওয়েলেসলি কেরীকেই ব্যাপারটির সমীক্ষার ভার দেন এবং ব্যাপারটি হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত কিনা সে ব্যাপারেও মতামত গ্রহণ করতে বলেন। কেরী ব্যাপারটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মতামত নিয়ে জানান যে সন্তানবিসর্জনের ব্যাপারটি দেশাচার মাত্র হিন্দুশাস্ত্রে এই প্রথার কোন অনুমোদন নেই। কেরী বড়লাট ওয়েলেসলির নিকট তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন এবং ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে শিশুহত্যা রহিত করার জন্য নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয়।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম আন্দোলনে কেরী সাফল্য লাভ করেন এবং হিন্দু সমাজের অন্যান্য কুপ্রথাগুলি দূর করার জন্য সচেষ্ট হন। সতীদাহ এবং কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো নিষ্ঠুর ঘটনারও কেরী প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কলকাতা

আগমনের পথে নয়াসরাই নামে এক স্থানে কেরী প্রথম সতীদাহ প্রত্যক্ষ করেন। এই বীভৎস দৃশ্যে তিনি খুবই বিচলিত হন। পরে গঙ্গার ধারে হয়তো তিনি সতীদাহের বিভীষিকাময় দৃশ্য আরও দেখে থাকবেন। এই কুপ্রথা বিলোপের জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হন এবং আন্দোলন সংগঠিত করেন।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাবলিক ডিসপিউটেসনে হিন্দুস্থানী বিভাগ সতীদাহবিষয়ক একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে। বিতর্কের বিষয় ছিল—"The suicide of Hindoo widows by burning themselves with the bodies of their deceased husbands is a practice repugnant to the natural feelings and inconsistent with moral duty." এই প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন Mr. W. Chaplin, প্রধান নিরোধক Mr. R.T. Godwin এবং সঞ্চালক ছিলেন হিন্দুস্তানী বিভাগের অধ্যাপক John Gilchrist. বিতর্কসভা কলেজের শিক্ষাকার্যক্রমেরই অন্তর্গত ছিল। তবু এটিই প্রথম প্রকাশ্য সভা যেখানে সতীদাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হয়। এই বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোম্পানির ঊর্ধতন কর্মচারীরা সতীদাহের বীভৎস প্রথা সম্পর্কে অধিকতর সজাগ এবং অধিকতর অন্বিষ্ট হন। উইলিয়ম কেরী স্বয়ং হুগলী ও নিকটবর্তী জেলাগুলি থেকে সতীদাহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় মাত্র ছয়মাসে ঐসব অঞ্চলে ১০৯টি সতীদাহের ঘটনা ঘটে।[৩২] উইলিয়ম কেরী সতীদাহের বয়সভিত্তিক এবং জাতিভিত্তিক একটি বিবরণ বড়লাট ওয়েলেসলির কাছে দাখিল করেন। ওয়েলেসলি নিজেও এই বীভৎস প্রথা রহিত করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করায় সমগ্র ব্যাপারটি তখনকার মতো ধামাচাপা পড়ে। কিন্তু দৃঢ়চেতা কেরী উদ্যম হারাননি। তিনি জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। ইংলন্ডে তখন উইলবারফোর্স ক্রীতদাসপ্রথা প্রভৃতি সমস্ত নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন। কেরী উইলবারফোর্সের মাধ্যমে সহমরণের ব্যাপারটি আলোচনার জন্য ইংলন্ডের পার্লামেন্টে উত্থাপন করান।[৩৩] খ্রিস্টানমিশনারিদের ভারতে আগমন ও তাঁদের মিশনারি কার্যকলাপ চালানোর বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল ১৮১৩ সনে তার কার্যকারিতা রহিত হয়। তখন শ্রীরামপুর মিশনের নানা পত্রপত্রিকায় সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রচার চলতে থাকে। শ্রীরামপুর মিশনের মুখ্যত্রয়ীর অন্যতম উইলিয়ম ওয়ার্ড এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারে তাঁর The Hindus বইটি উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ আন্দোলনের পর অবশেষে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সনে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করে আইন প্রণয়ন করেন। এই কুপ্রথা রহিত করার আগে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষ্য ও মতামত গ্রহণ করা হয়। বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ্ জজপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত ভাষায় যে অভিমত দেন তার সারমর্ম (সদ্য বিধবার) "চিতারোহণ অপরিহার্য নয়, ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন ও ধর্মজীবন যাপন

এই উভয়ের মধ্যে শেষেরটি শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তেনা।"৩৪

সহমরণ নিরোধক আইনটি যখন পাশ হয়, উইলিয়ম কেরী তখন সরকারী অনুবাদক। আইনটি প্রণয়ন ও অনুমোদনের পর বাংলা তর্জমা করার জন্য উইলিয়ম কেরীর কাছে পাঠান হয়। সেদিন ছিল রবিবার, বিশ্রামের দিন। তবু বৃদ্ধ কেরী সমস্তদিন পরিশ্রম করে আইনটির তর্জমা করেন এবং পরেরদিন স্বহস্তে বড়লাটের কাছে পৌঁছে দেন। একটি নিষ্ঠুর কুৎসিত প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন কেরী শুরু করেছিলেন দীর্ঘ দুই দশকেরও পরে সেটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

উইলিয়ম কেরীর দ্বিতীয়পুত্র উইলিয়ম (জুনিয়র) ছিলেন কাটোয়ার ব্যাপটিস্ট মিশনের ধর্মযাজক। কাটোয়ায় উইলিয়মের কাছে থাকার সময় কেরী জনৈক কুষ্ঠরোগীর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন। অসহায় মানুষটি আগুনের বেষ্টন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন এবং স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়রা তাঁকে জোর করে আগুনের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলেন। এই নিষ্ঠুর দৃশ্য কেরীকে বিচলিত করে এবং তিনি এই নিষ্ঠুর প্রথাকে নির্মূল করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সতীদাহনিরোধক আইন প্রণীত হওয়ার আগেই কুষ্ঠরোগীদের পুড়িয়ে মারা বন্ধ হয়। কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজে উইলিয়ম কেরী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এছাড়া চড়কপূজায় নানাপ্রকার শারীরিক নির্যাতন সহ্য করা অথবা উঁচু চড়কগাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করা, জগন্নাথের রথের চাকায় আত্মদান, মুমূর্ষু রোগীর অন্তর্জলী যাত্রা ইত্যাদি আত্মনির্যাতন ও আত্মহননের প্রথাকে নির্মূল করতে না পারলেও উইলিয়ম কেরী এই সমস্ত প্রথাকে অনেকটা সংযত করেছিলেন। কেবলমাত্র খ্রিস্টান যাজকের কর্তব্যবোধেই নয়, মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই কেরী এই সব জনহিতকর কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

উইলিয়ম কেরী ভারতবর্ষে এসেছিলেন 'অন্ধকারাচ্ছন্ন হিদেনদের' মধ্যে খ্রিস্টধর্মের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করতে। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আচার আচরণের সমালোচনায় তখন তিনি মুখর। মদনাবাটি থেকে ইংলন্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি ও বিভিন্ন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট মনোভাবে পরিপূর্ণ। কেরী হিন্দুদের মূর্তিপূজার নিন্দা করেছেন, তাঁর জার্নালে তিনি মহামায়া দেবীকালিকাকে দানবী আখ্যা দিয়েছেন। হিন্দুরা যে মূর্তিগুলিকে পূজা করেনা, বিগ্রহগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিতভাব শক্তি, বিদ্যা প্রভৃতিকে শ্রদ্ধা জানায়, এই ব্যাপারটি কেরী অনুধাবন করতে পারেননি। বিগ্রহগুলি যে এক অখণ্ড পরমেশ্বরের প্রতিনিধি স্থানীয় হিন্দুদের এই বক্তব্যও কেরী বিশ্বাস করতে পারেননি। অপরপক্ষে মুসলিম জনগণের ফকিরের মাজারে প্রার্থনার বিরুদ্ধে তিনি নানা যুক্তিজাল বিস্তার

করেছেন, এমনকি নানা ব্যাপারে পরিহাসও করেছেন। এক ফকির কেরীকে বলেছিলেন যে তিনি জলকে দুধে পরিণত করতে পারেন; কেরী তাঁকে নিষ্ঠুর পরিহাস করেছিলেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই শূকরের মাংসকে গোমাংসে রূপান্তরিত করতে পারেন।[৩৫] বলাবাহুল্য এখনকার মতো তখনও গ্রামবাংলায় ভোজবাজি, হটযোগ প্রভৃতি খুবই প্রচলিত ছিল এবং অজ্ঞ জনসাধারণ সেগুলি অলৌকিক ঐশ্বরিকসিদ্ধিরূপে বিশ্বাসে করতেন। কেরী অবশ্য গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত মানুষের সঙ্গেই ধর্মালোচনা করেছেন এবং আক্ষেপ করেছেন এঁরা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধেও অজ্ঞ। কেরী অভিযোগ করেছেন গ্রামের মানুষ বিভিন্ন পূজা ইত্যাদির অজুহাতে কাজকামাই করে এবং নানাপ্রকার সুখাদ্যের ভোজে ও আমোদ-আহ্লাদে দিনটি অতিবাহিত করে। কেরীর এই বর্ণনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদের সার্বিক অবক্ষয়ের একটি চিত্র হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালে অজ্ঞ, দরিদ্র জনসাধারণের এইটিই একমাত্র বিলাস। বিদ্বিষ্ট মনোভাবের জন্য কেরী হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত গভীর দর্শনকে উপলব্ধি করতে পারেননি।

ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনেই কেরী সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করতে থাকেন। পুরাণ প্রভৃতি ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের কাহিনীগুলিতে কেরী কেবলমাত্র অতিশয়োক্তি ও মিথ্যাভাষণের পরিচয়ই পেয়েছিলেন। মিঃ সাটক্লিফকে কেরী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে সব ভারতীয় বাইবেলের অলৌকিক ঘটনার নিন্দা করে, তারাই আবার হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সমস্ত অসঙ্গতিকে মেনে নেয়।[৩৬] কেরী এইসব 'worthless productions' এর অনুবাদ করতে চাননি। কোন বিবেচক, বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী মানুষ কেমন করে পুরাণাদির এই সমস্ত কাহিনীকে বিশ্বাস করে তা তাঁর বোধগম্য ছিলনা। হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তার অনুবাদ ছিল উইলিয়ম কেরীর কাছে এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলির অসারতা প্রমাণেরই একটি অস্ত্র।

ক্রমশ উইলিয়ম কেরীর মন থেকে হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে এই বিদ্বেষ ক্ষীণ হতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের পর বাংলা ও সংস্কৃতবিভাগের পণ্ডিতদের সাহচর্যে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাদির প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মায়। বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের শিক্ষাগুণেই কেরী ভারতীয় অস্তিক্যদর্শনের গভীর তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক কোলব্রুকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অধ্যাপক কোলব্রুক মনে করতেন সমকালীন হিন্দুধর্ম হিন্দুধর্মের যথার্থ পরিচয় বহন করেনা; তা হিন্দুধর্মের অবক্ষয়ের নিদর্শনমাত্র। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই ভারতের গৌরবময়যুগের পরিচয় নিহিত আছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌রা ভারতের এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে উদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। এঁদের সংস্পর্শে ভারতের গৌরবময়যুগের পুনরুদ্ধারের আবেগ উইলিয়ম কেরীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। শেষ

পর্যন্ত তাঁর সংস্কৃতপ্রীতি এমন পর্যায়ে উন্নীত হয় যে তিনি বিশ্বাস করতে থাকেন যে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় মননের শক্তি পরিপক্ক এবং বুদ্ধি পরিণত হয়। উইলিয়ম কেরী নিঃসন্দেহে একজন নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান ধর্মযাজক ছিলেন, কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন ক্রমশ উদার হয় এবং ধর্মের গোঁড়ামি বিলুপ্ত হয়। খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মপ্রচারণার সহায়করূপে যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রীরামপুর মিশন স্থাপন করে, ধর্মান্তর গ্রহণের হার সন্তোষজনক না হলেও এই বিদ্যালয়গুলি মিশন কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেয়নি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও কেরী ও তাঁর যাজক ভ্রাতৃবৃন্দের এই উদার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীরামপুর কলেজ দেশীয় খ্রিস্টান যুবকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে কোন যুবক উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতেন।

ধর্মযাজকের স্বাভাবিক করুণায় এবং দীর্ঘকাল নিকট সাহচর্যের ফলে কেরী শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অশিক্ষিত দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান জনগণকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। একদিকে ভারততত্ত্বের মননশীলতা অপরদিকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম এই দুই-এর সংমিশ্রণে খ্রিস্টান ধর্মযাজক, বিদেশী উইলিয়ম কেরী রূপান্তরিত হলেন 'ভারত বন্ধু' উইলিয়ম কেরীতে। ভারতবর্ষে আগমনের পর উইলিয়ম কেরীর জীবনের মূল নিয়ামক ছিল দুটি ঘটনা (১) শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা এবং (২) শিক্ষকরূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান। মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারিরা যখন ভারতে পৌঁছলেন তখন কেরী স্থির করেছিলেন খিদিরপুরে (তৎকালীন দিনাজপুরে) তাঁর নীলকুঠিকে কেন্দ্র করেই ধর্মপ্রচারের কাজ পরিচালনা করবেন। ফাউন্টেনসহ গ্রান্ট, ব্রান্ডসন প্রমুখ সদ্য আগত মিশনারিরাও নীলকুঠির কর্মীরূপেই পরিচিত হবেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ধর্মযাজকরূপে কেরী হয়তো অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারতেন, খিদিরপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলের বেশকিছু সংখ্যক অধিবাসী হয়তো খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতেন, বাইবেলের বাংলা অনুবাদও হয়তো মুদ্রিত হত, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠার ফলে দিনেমার রাজপ্রতিনিধি কর্নেল বী-র কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চিত আশ্বাস পাওয়া যায়, অন্যান্য নানাবিষয়েও শ্রীরামপুর মিশন সহায়তা লাভ করে। শ্রীরামপুরেই বাইবেলের বাংলা অনুবাদের মুদ্রণ সহজসাধ্য হয়; পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। শ্রীরামপুরে অবস্থানের ফলেই বাইবেলের অনুবাদকরূপে উইলিয়ম কেরীর খ্যাতি বিস্তৃত হয় এবং তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগে শিক্ষকপদে যোগদানের জন্য আহূত হন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা কেরীর জীবনকে নানাভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে। বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষ কেরী পাঠ্যপুস্তকের অভাবপুরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক

রচনায় ব্রতী হন এবং বিভাগীয় পণ্ডিত ও মুনসিদের বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তনায় উইলিয়ম কেরীর এই কীর্তি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নামকে চিরভাস্বর করেছে।

উইলিয়ম কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতার সূত্রে সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদা লাভ করেন, ফলে তাঁর নানা কল্যাণমূলক কাজে সরকারী সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ সহজসাধ্য হয়। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে এবং স্বয়ং গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে কেরীর পরিচয় ঘটে ও কালক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়; ফলে শ্রীরামপুরের দরিদ্র, অবহেলিত মিশনারিরা কলকাতার য়ুরোপীয় অভিজাত মহলে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। অভিজাত য়ুরোপীয় মহলে মেলামেশার ফল সুদূরপ্রসারী হয়। সরকারী মহলে ঘনিষ্ঠতার জন্য কারণে অকারণে শ্রীরামপুর মিশনপ্রেসের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ বন্ধ হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নানাভাষা শিক্ষাদানের জন্য ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়েছিল। কেরী এই পণ্ডিতদের কাছে নানা প্রাদেশিক ভাষা শেখার সুযোগ লাভ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের য়ুরোপীয় অধ্যাপকগণ প্রায় সকলেই এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেরী নিজেও এশিয়াটিক সোসাইটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই ওরিয়েন্টালিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় কেরীর রক্ষণশীলতা অনেকাংশে দূরীভূত হয়; ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি কেরী শ্রদ্ধাশীল হন এবং শেষপর্যন্ত তিনি একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ রূপে বিখ্যাত হন।

উইলিয়ম কেরীর চরিত্রের মানবিকতা মানবহিতৈষণার বাস্তব উদ্যমে রূপ লাভ করেছিল। ভারতীয় সমাজের নিষ্ঠুর কুসংস্কারগুলিকে বিলোপের জন্য তিনি আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অন্তত কিছু পরিমাণে সাধারণ মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভূক্তির প্রয়াস পেয়েছেন। শ্রীরামপুর অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের সঞ্চয়ে অভ্যস্ত করে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছেন, শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে এবং কাগজের কলে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, এইভাবে উইলিয়ম কেরী সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করেছেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কলকাতায় পদার্পণের পর আর কখনও তিনি স্বদেশে গমন করেননি; ভারতই তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ হয়ে উঠেছে, ভারতীয় জীবনযাত্রাকে তিনি আপন করে নিয়েছেন। ধর্মান্তরিতকরণের কাজে হয়তো তিনি সেই পরিমাণে সফল হননি, কিন্তু ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ ভক্তের মতো বলেছেন—“ধর্মান্তরিত হওয়া বা না হওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছানির্ভর, আমরা চেষ্টা করতে পারি মাত্র।” ইংলন্ডে কেটারিঙের

খ্রিস্টীয় ধর্মমণ্ডলীর সভায় তাঁর বিখ্যাত উক্তি "Expect great things from God. Attempt great things for God", ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করেছিল, আর দূর ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদের সাফল্যে, ভারতীয়দের নানা হিতসাধনে এবং কল্যাণকামনায় তাঁর জীবনে সার্থক হয়ে উঠল তাঁরই বাণী— "Expect great things from God. Attempt great things for God." ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে যিনি ছিলেন কেবলমাত্র খ্রিস্টান ধর্মযাজক উইলিয়ম কেরী, জীবনের পরিণতিতে তিনি হয়ে উঠলেন পৃথিবীতে বিখ্যাত 'ভারতবন্ধু' উইলিয়ম কেরী, 'মহাত্মা' উইলিয়ম কেরী।

ইংরেজি ভাষায় তো বটেই অন্যান্যভাষায়ও উইলিয়ম কেরীর বহু পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হয়েছে; তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণাগ্রন্থেরও অভাব নেই। বর্তমান গ্রন্থটি উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃতচর্চার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার বিনীত প্রয়াস মাত্র। 'উইলিয়ম কেরী ও সংস্কৃত সাধনা' নামক বর্তমান গ্রন্থটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, কেরীর ভারতে আগমনের প্রাক্ পর্বে এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার একটি সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়েকজন বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ও সংস্কৃত প্রেমিক য়ুরোপীয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, যাঁরা উইলিয়ম কেরীর ভারতে আগমনের পূর্বেই সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য এবং শাস্ত্রগ্রন্থ চর্চার একটি পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতপ্রীতি। এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে ভারতে আগমনের পর উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত শিক্ষার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অংশে উইলিয়ম কেরী তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায়, নানাব্যক্তির কাছে লিখিত চিঠিপত্রে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের যে প্রশস্তি করেছেন তারই নির্বাচিত অংশের বিবরণ।

চতুর্থ অধ্যায়টি 'ক' ও 'খ' এই দুটি ভাগে বিভক্ত। 'ক' অংশ উইলিয়ম কেরী লিখিত A Grammar of Sungskrit Language গ্রন্থটির বিচার বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক রচনা হেনরি টমাস কোলব্রুক ও চার্লস উইলকিন্স লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণও আলোচিত হয়েছে। চর্তুর্থ অধ্যায়ের 'খ' অংশটিকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমভাগে কেরীর সংকলিত অপ্রকাশিত সংস্কৃত অভিধানের আলোচনা এবং দ্বিতীয়ভাগে উইলিয়ম কেরীর চিঠিপত্রাদিতে বহু উল্লিখিত Polyglot Dictionary বা বহুভাষিক শব্দকোষের অপ্রকাশিত খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিটির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয় অনুবাদ। এই অধ্যায়টিকেও দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে,

প্রথমভাগে বিদেশী ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ এবং দ্বিতীয় অংশে সংস্কৃত ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ। প্রথম অংশে গ্রিকভাষায় রচিত নিউটেস্টামেন্টের সংস্কৃত অনুবাদ এবং হিব্রুভাষায় রচিত ওল্ডটেস্টামেন্টের সংস্কৃত অনুবাদের বিবরণ। দ্বিতীয়ভাগে স্থান পেয়েছে বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম দুটি কাণ্ডের অনুবাদের আলোচনা। অনুবাদক উইলিয়ম কেরী ও জোশুয়া মার্শম্যান।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংস্কৃতশিক্ষার ব্যাপারে উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন প্রচেষ্টার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। অধ্যায়ের প্রথম অংশে শ্রীরামপুর মিশনের কলেজ প্রতিষ্ঠা, সেই কলেজের সংস্কৃত পঠনপাঠন, পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ও প্রকাশনবিভাগ প্রভৃতি সংস্কৃতশিক্ষার বিভিন্নদিকের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। অপর অংশের বিষয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃতবিভাগের শিক্ষক ও অধ্যাপকরূপে উইলিয়ম কেরীর অবস্থান।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্পর্শে কেরী ক্রমশ সংস্কৃতমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কেরীর লিখিত ও সংকলিত বিভিন্ন বাংলাগ্রন্থ ও ব্যাকরণ প্রভৃতি বাংলাভাষার সহায়ক গ্রন্থে সংস্কৃতপ্রবণতার স্বরূপনির্ণয়ই সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়।

কেরীর ক্রমবর্ধমান সংস্কৃত প্রবণতা শ্রীরামপুর মিশনের পরবর্তী প্রজন্মকেও প্রভাবিত করেছিল, অষ্টম অধ্যায়ে উইলিয়ম কেরীর উত্তরসূরী ফেলিক্স কেরী প্রমুখের রচনায় সংস্কৃত প্রবণতার ব্যাপারটি আলোচিত হয়েছে।

নবম তথা শেষ অধ্যায়ের বিষয় বর্তমানযুগে কেরীর রচনার প্রাসঙ্গিকতা। কেবলমাত্র ভারতীয় সংহতিবোধ নয়, সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে কেরী ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এই অধ্যায়ে সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

গ্রন্থরচনার প্রারম্ভেই কয়েকটি ব্যাপার লেখিকাকে বিভ্রান্ত করে, প্রথমত সংস্কৃত বা 'Sanskrit' শব্দটির বিভিন্ন বানান। কেরী নিজেই Sungskrit, Sanguskrit, Sunguskrito, Sungskrita ইত্যাদি বিভিন্ন বানান বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করেছেন। Sungskrita বা সংস্কৃত শব্দটির বিভিন্ন লেখ্যরূপে 'u' অক্ষরটি কিন্তু মূল 'u' নয়। হ্রস্ব অকারের প্রতিরূপ 'u' ও 'o' এর মাঝামাঝি ধরণের একটি চিহ্ন, যা কেরীর লেখায় ব্যবহৃত হয়েছে। এখনকার মুদ্রণব্যবস্থায় সেই প্রতীকটির প্রতিস্থাপনা সম্ভব নয়। পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর সহকর্মীরা উইলিয়ম কেরীর প্রয়োজনে সেই হরফটি খোদাই করেছিলেন। এছাড়া Periodical Accounts প্রভৃতি পুরানো গ্রন্থে Shanskrit বানান লিখিত হয়েছে। অধ্যাপক কোলব্রুক এবং চার্লস উইলিকিন্স লিখেছেন Sanskrit। তৎকালীন অন্যান্য লেখকের লেখায় আরও বিভিন্ন ধরণের বানান লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত সেই প্রাথমিক যুগে যখন বাংলা ও সংস্কৃত বানানের রোমান লিপ্যন্তরের

কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম গড়ে উঠেনি, তখন এই ধরণের বানান-বৈচিত্র্য খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য উইলিয়ম কেরী রোমান অক্ষরে বানানকে উচ্চারণের কাছাকাছি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর চিঠিপত্রে উল্লেখ করেছেন যে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের রোমান লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেসের বানানই অনুসরণ করা উচিত, কিন্তু এশিয়াটিক রিসার্চেসে প্রযুক্ত সংস্কৃত শব্দাদির লিপ্যন্তরও তখনও কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করেনি।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, দুশ বছর বা তারও আগে লেখা ইংরেজি গ্রন্থাদির ভাষাবৈশিষ্ট্য। সেই ইংরেজিভাষার সঙ্গে যে বর্তমানযুগে ব্যবহৃত ইংরেজিভাষার কতকাংশে পাথর্ক্য ঘটেছে, বর্তমানগ্রন্থে পুরানো ইংরেজি গ্রন্থাদির উদ্ধৃত অংশ থেকে পাঠক নিজেই তা উপলব্ধি করবেন।

গ্রন্থটি পুনরুক্তদোষদুষ্ট মনে হতে পারে, কিন্তু বিষয়ের উপস্থাপনায় কোন কোন অংশে পুনরুক্তি এড়ানো সম্ভব হয়নি। একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি, মুদ্রণ-প্রমাদ থেকেই গেছে। লেখিকা তার জন্য দুঃখিত।

উইলিয়ম কেরীর বহু সুবিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থের অঙ্গহানির আশঙ্কায় আমরা উইলিয়ম কেরীর জীবনের বিভিন্ন দিকের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। Carey Eustace, Memoirs of William Carey. London 1836. p-7

২। কেরী ভারত সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন—'হিন্দুস্থান—১০০,০০০,০০০ লোকসংখ্যা; মহমেডান ও পেগান (মুসলমান ও ধর্মহীন); ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র (জাতি); চাল, লেবু, জাম, মূলা (ফল); অশ্বত্থ, বট (গাছ); ৮০০০০০০ ভারতীয়, বলশালী, যুদ্ধপ্রিয়, নিষ্ঠুর, ধর্মহীন।'
উল্লিখিত তথ্য শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত।
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বড়সাধ বড়সেবা, শেওড়াফুলী, ১৯৮৯।

৩। জন টমাস (১৭৫৭-১৮০২)ঃ
জন টমাস বঙ্গদেশে আগত একজন ব্যাপটিস্ট মিশনারি। ইংলন্ডের ফেয়ার ফোর্ডে টমাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ফেয়ার ফোর্ডের ব্যাপটিস্ট চার্চের একজন উচ্চপদস্থ যাজক ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই টমাসের মধ্যে ধর্মভাব প্রবল ছিল। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে আর্ল-অফ-অক্সফোর্ড জাহাজের চিকিৎসক রূপে তিনি বঙ্গদেশে আসেন। কলকাতার য়ুরোপীয় সমাজে ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্যে তিনি মর্মাহত হন এবং খ্রিস্টের বাণী প্রচারে উদ্যোগী হন। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আর্ল-অফ-ইংলন্ড জাহাজ যোগেই তিনি ইংলন্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে

বঙ্গদেশে ফিরে আসেন। এদেশে ডেভিড ব্রাউন, চার্লস গ্রান্ট, জর্জ উডনি প্রমুখ ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ধর্মপ্রাণ গ্রান্টের আহ্বানে টমাস জাহাজের চিকিৎসকের পদে ইস্তফা দেন এবং ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু স্থানীয় ভাষায় অজ্ঞতা ধর্মপ্রচারের কাজে বাধা হওয়ায় তিনি চার্লস গ্রান্টের শরণাপন্ন হন। চার্লস গ্রান্ট উইলিয়ম চেম্বার্সের ফারসি শিক্ষক মুনসি রামরাম বসুকে টমাসের কাছে পাঠান। রামরাম বসুর তত্ত্বাবধানে টমাসের বাংলাভাষা শিক্ষার কিছুটা অগ্রগতি হয়। ১৭৯২ সনে তিনি আবার স্বদেশে যান। বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় উইলিয়ম কেরী সপরিবারে তাঁর সঙ্গী হন। টমাসের উৎসাহেই ব্যাপটিস্ট সোসাইটি বঙ্গদেশে মিশন স্থাপনে উৎসাহী হন। মুনসি রামরাম বসুর সহায়তায় টমাস সেন্ট ম্যাথু, সেন্ট মার্ক প্রভৃতির গস্‌পেলের বাংলা অনুবাদ করেন, সেই অনুবাদ উইলিয়ম কেরীর বাইবেলের অনুবাদের মধ্যেই হারিয়ে গেছে। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে এদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়। দোষেগুণে জন টমাস ছিলেন এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব।
Lewis. C.B, The Life of John Thomas. London 1873.

৪। উইলিয়ম কেরী সম্ভবত টমাসকে হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেল অনুবাদ করে দেন।
শক্তিব্রত ঘোষ, উইলিয়ম কেরী সাহিত্য সাধনা। বর্ধমান ১৯৮০। পৃ-২০

৫। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলকাতার একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। আনুমানিক ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরে তাঁর জন্ম হয়। পরে তিনি নাটোরের রাজবাড়ির চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষান্তে তিনি কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে নিজের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাসিক দুইশত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগের প্রধান পণ্ডিত রূপে যোগ দেন, সংস্কৃতবিভাগের শিক্ষকতাও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগের পাঠ্যপুস্তকের অভাব নিরসনের জন্য তিনি চারটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন—বত্রিশসিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি ও প্রবোধচন্দ্রিকা। প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থটি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। পাঠ্যপুস্তক রচনা করলেও মৃত্যুঞ্জয়ের বাংলা রচনাতেই প্রথম একটি শিল্পরীতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি বাংলাভাষায় সাধু ও চলিত ভেদটি লক্ষ্য করেন এবং উভয়রীতিতেই লেখনী চালনায় তিনি ছিলেন নিপুন। উইলিয়ম কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে তাঁর একটি হার্দিক সম্পর্ক ছিল। কেরীর সংস্কৃতশিক্ষায় ও গ্রন্থরচনায় মৃত্যুঞ্জয় বহুবার সাহায্য করেছেন। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকতার পদে মৃত্যুঞ্জয় ইস্তফা দেন এবং সুপ্রিম কোর্টের জজপণ্ডিত নিযুক্ত হন। জজপণ্ডিত রূপে তিনি নানাশাস্ত্র আলোচনা করে সতীদাহ বা সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে মতামত দেন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। হিন্দুকলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে সমিতি গঠিত হয় মৃত্যুঞ্জয় সেই সমিতির সভ্য ছিলেন। স্কুলবুক সোসাইটির পরিচালন-সমিতির তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে তীর্থভ্রমণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মুর্শিদাবাদের কাছে গঙ্গাতীরে তাঁর মৃত্যু হয়।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিত মালা-৩ (ষষ্ঠমুদ্রণ) কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

৬। জোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭) ছিলেন শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠায় উইলিয়ম কেরীর অন্যতম প্রধান সহকারী। তাঁর জন্মস্থান ইংলণ্ডের উইল্টশায়রের ওয়েস্টবেরি অঞ্চলে। পিতা জন মার্শম্যান ছিলেন তন্তুবায়। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ তিনি সামান্যই পেয়েছিলেন, কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। অল্পবয়সেই তিনি এক পুস্তক ব্যবসায়ীর সহকারী রূপে কাজে যোগ দেন, ভেবেছিলেন সেখানে গ্রন্থপাঠের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা না হওয়ায় তিনি তন্তুবায় বৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থপাঠের অভ্যাস বজায় থাকে। এই সময় তিনি গ্রিক ভাষা শেখেন। তেইশ বছর বয়সে তিনি ব্যাপটিস্ট পরিবারের কন্যা হানা ক্লার্ককে বিবাহ করেন এবং ব্যাপটিস্ট সোসাইটির প্রতি আগ্রহান্বিত হন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রিস্টলের এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। জোশুয়া মার্শম্যান তাঁর ছাত্র উইলিয়ম গ্রান্টের উৎসাহে মিশনারিরূপে বঙ্গদেশে আসেন। উইলিয়ম কেরীর সঙ্গে তিনিও ছিলেন শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীরামপুর মিশনে তিনি শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এবং তাঁর পত্নী হানা ইংরেজ এবং মিশ্রশ্বেতাঙ্গ বালক বালিকাদের জন্য শ্রীরামপুরে দুটি আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। এই বিদ্যালয় থেকে মিশনের কিছু অর্থাগম হত। শিক্ষাবিদ্ রূপে জোশুয়া মার্শম্যান খ্যাতি লাভ করেন। আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর-অফ্-ডিভিনিটি উপাধি দান করে। জোশুয়া মার্শম্যান সুকঠিন চিনাভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেন। তিনি চিনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন, কনফুসিয়স সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা এবং চিনাভাষা শিক্ষার সহায়ক গ্রন্থ রচনা করেন। সাময়িক পত্র প্রকাশেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। 'ফ্রেন্ড-অফ্-ইন্ডিয়া' ও 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনায় তিনি অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। লন্ডনের ব্যাপটিস্ট সোসাইটির সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা কল্পে তিনি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে গমন করেন। য়ুরোপের নানা দেশে শ্রীরাপুর মিশনের প্রচার এবং ডেনমার্কের রাজার কাছ থেকে শ্রীরামপুর কলেজের উপাধি প্রদান সম্পর্কিত অধিকারের সনদ গ্রহণ করে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে ফিরে আসেন। ১৮৩৭ সালে শ্রীরামপুরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

৭। উইলিয়ম ওয়ার্ড(১৭৬৯-১৮২৩)

উইলিয়ম ওয়ার্ড ডার্বি শহরে অত্যন্ত সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্পবয়সেই পিতৃহীন হন। শৈশব থেকেই মাতার ধর্ম ও নীতিশিক্ষার পরিমণ্ডলে তিনি চালিত হন। বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার শেষে তিনি মুদ্রণালয়ে শিক্ষানবিসের কাজে যোগদেন এবং ক্রমে একজন দক্ষ মুদ্রাকর হয়ে উঠেন। প্রথম যৌবনে ওয়ার্ড Derby Mercary নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক হন; সাংবাদিকতায় তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ওয়ার্ডের মতামত ছিল প্রগতিশীল, তিনি ফরাসি বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। ১৭৯৬ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাপ্টাইজড হন। বঙ্গদেশে পাড়ি দেওয়ার সময় উইলিয়ম কেরী ওয়ার্ডকে বঙ্গদেশে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। একসময় উইলিয়ম ওয়ার্ডের জীবনে সাংবাদিকতা অপেক্ষা ধর্মপ্রচারই শ্রেয় মনে হয়। ১৭৯৮ সনে তিনি ব্যাপটিস্ট সোসাইটিতে যোগ দেন। মার্শম্যান প্রমুখ অন্যান্য মিশনারিদের সঙ্গে তিনি বঙ্গদেশে পাড়ি দেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠায়

তিনি ছিলেন উইলিয়ম কেরী ও জোশুয়া মার্শম্যানের সহযোগী, শ্রীরামপুর মিশনের মুখ্যত্রয়ীর অন্যতম।

শ্রীরামপুর মিশনে তিনি মুদ্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অচিরেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসকে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ১৮০২ সনে ওয়ার্ড জন ফাউন্টেনের বিধবাকে বিবাহ করেন। হিন্দুদের ধর্মকর্ম সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি দুইখণ্ডে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্ড ইংলন্ড যাত্রা করেন এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে শ্রীরামপুর মিশনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে কলেরা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

৮। ব্রান্সডন—ধর্মযাজকরূপে মার্শম্যান প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্গদেশে আসেন। উইলিয়ম ওয়ার্ডের সহকর্মীরূপে মিশন প্রেসের কাজে যোগ দেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

৯। উইলিয়ম গ্রান্ট—জোশুয়া মার্শম্যানের ছাত্র ছিলেন। অল্প বয়সেই ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ব্যাপটিস্ট ধর্মমণ্ডলীতে যোগ দেন। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে জোশুয়া মার্শম্যান বঙ্গদেশে আসেন। শ্রীরামপুরে আসার অল্পদিন পরেই, মিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১০। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৬১

১১। Carey. E., প্রাগুক্ত, p-35

১২। শক্তিব্রত ঘোষের প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃ-৫৫

১৩। ১৭৯৫ সনের ৩০শে জানুয়ারি মদনাবাটি থেকে মিঃ ফুলারকে লেখা কেরীর পত্র। শ্রীরামপুর কলেজের নির্দেশিকা পুস্তিকাতেও কেরী বলেছেন তাঁরা খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে চেষ্টা করছেন মাত্র, সফলতা ঈশ্বরের ইচ্ছা-নির্ভর।

১৪। Mukhopadhyay, Gopal, Mass Education in Bengal (1882-1914) Calcutta 1984. p-9

১৫। তদেব, p-28

১৬। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৮

১৭। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫১

১৮। Kopf. David, British Orientalism and Bengal Renaissance. Calcutta. 1969, p-149.

১৯। তদেব, p-149

২০। হোরেস হেমান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০)—হোরেস হেমান উইলসন বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্। উনিশ শতকে তিনি নিরলস ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা করেন। তাঁর জন্ম ইংলন্ডের লন্ডন শহরে। তিনি লন্ডনের সোহো স্কোয়ার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। পরে সেন্ট টমাস হাসপাতালে চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন; ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চিকিৎসকের চাকুরি নিয়ে তিনি কলকাতায় আসেন। কলকাতায় আগমনের পর তিনি গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। উইলসন এশিয়াটিক সোসাইটির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তিনি কয়েকবার সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। কলকাতা টাকশালের তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পরে তিনি কমিটি-অফ-পাবলিক-ইনস্ট্রাকসনের সচিব নিযুক্ত হন। ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার প্রতি

তাঁর পক্ষপাত ছিল। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুদিন ইন্ডিয়া-হাউস লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান এবং ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ডাইরেক্টর ছিলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ আজীবন অব্যাহত ছিল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে উইলসন কালিদাসের মেঘদূত কাব্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকও তিনি অনুবাদ করেছিলেন। The Theatre of the Hindus তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা Rigveda, Vishnu Purana, Lectures on the Religious and Philosophical Systems of the Hindus, Grammar of Sanskrit Language প্রভৃতি। ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং হিন্দু আইন সম্পর্কেও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন।

বিশ্বকোষ (৫ম খণ্ড), লোকশিক্ষা প্রকাশন, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮) পৃ-৯-১০

২১। Mukhopadhyay, Gopal, প্রাগুক্ত, p-8

২২। তাদেব, p-8

২৩। Kopf. David, প্রাগুক্ত, p-149

২৪। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, p-86

২৫। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (দে'জ পাবলিশিং) কলকাতা। ১৯৮৮। পৃ.-৪৬

২৬। সজনীকান্ত দাসের উল্লিখিত গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ-১০০

২৭। তদেব, পৃ-৪৮

২৮। A.R. Das, Carey as Superintendent of the Botanical Garden. (Published in Carey's Obligation and India's Renaissance'. Ed. J.K Daniel and R.E. Hedlund Serampore 1993) p-280

২৯। Voigt. J.O, Hortus Surburbanus Calcuttensis, Calcutta-M.D. CCCXLV. Preface.

৩০। তদেব,

৩১। কেরীর জার্নাল, সেপ্টেম্বর ২৭, ১৭৯৫।

৩২। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৫

৩৩। তদেব, পৃ-১২৫

৩৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৩ (ষষ্ঠ মুদ্রণ) কলিকাতা-১৩৯৪, ।

৩৫। মদনাবাটি থেকে মিঃ সাটক্লিফকে লেখা কেরীর ১৬ই জানুয়ারী ১৭৯৮ তারিখের চিঠি।

৩৬। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ মিঃ সাটক্লিফকে লেখা কেরীর পত্র।

প্রথম অধ্যায়

উইলিয়ম কেরীর আগমনের প্রাক্কালে বাংলা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরীর বাংলায় আগমন কালে বাংলার ইতিহাস একদিকে যেমন ছিল দ্রুত পরিবর্তনশীল, অপর দিকে তেমনি নানা বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলার রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে কেরী যখন কলকাতায় এলেন তখন দেশের শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজদের আধিপত্য ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৭৬৫ খ্রিঃ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় নামেমাত্র নবাবের রাজত্ব থাকলেও কার্যত ইংরেজ কোম্পানির রাজত্ব আরম্ভ হয়। সামরিক ও শাসন ক্ষমতা, ধনসম্পদ সবই ইংরেজদের হস্তগত হয়। প্রকাশ্যে নবাবকে সাজিয়ে রেখে পরোক্ষে ইংরেজদের কলকাঠি নাড়ার এই যে বিচিত্র ধরনের শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হল, বাংলার ইতিহাসে তাই দ্বৈত-শাসন নামে পরিচিত। ইংরেজদের প্রকৃত রাজনৈতিক অভিপ্রায় ও অর্থনৈতিক শোষনের আসল চেহারা যাতে দেশের মানুষ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিক সম্প্রদায় বুঝতে না পারে তারই জন্য ক্লাইভ এই দ্বৈত-শাসনের ব্যবস্থা করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অন্যায় জোর জুলুম ও বেআইনি ব্যবসা ক্লাইভ খানিকটা সংযত করলেও কয়েক বছরের মধ্যে দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা চরমে ওঠে বাংলা ১১৭৬ সনে (ইং ১৭৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দ)। সারা দেশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। প্রায় এক কোটি মানুষ অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। বাংলার ইতিহাসে যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।[১] এই দুর্ভিক্ষের দুবছর পরেই ইংলণ্ড থেকে ওয়ারেন হেস্টিংসকে পাঠানো হয় বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর নিযুক্ত করে—বলা যায় এই ভয়াবহ মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই। রাজনৈতিক দিক থেকে হেস্টিংসের রাজত্বকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় ইংরেজ কোম্পানি নিজের হাতে দেশের শাসনভার গ্রহণ করে; এযাবৎ কাল যা ছিল বকলমে কোম্পানির এদেশস্থ কর্মচারীদের হাতে। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলকাতা ব্রিটিস ভারতের রাজধানী হয়। তারপর থেকেই বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে কলকাতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।[২]

ওয়ারেন হেস্টিংসের সব থেকে বড় কাজ হচ্ছে ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানি কতৃর্ক সরাসরি শাসন ও রাজত্বের দায়িত্ব গ্রহণ। বলা যায় বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিস শক্তির সরাসরি আত্মপ্রকাশ ও প্রসারে এই ঘটনাই প্রথম সুদৃঢ় পদক্ষেপ। হেস্টিংস তাঁর দীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে ক্লাইভের যুগের অপশাসন অনেকখানি পরিবর্তন করে রাষ্ট্রনীতি, প্রশাসন, বিচারবিভাগ, রাজস্ব, বাণিজ্য, অর্থনীতি বিষয়ে স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও হেস্টিংসের শাসনকাল ভারতে ইংরেজ শাসনের এক গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায় হিসাবে সূচিত।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট দ্বারা সমগ্র ভারতে কোম্পানির অধিকৃত স্থানগুলির শাসন একজন গভর্নর জেনারেল ও চারজন সদস্যযুক্ত এক শাসন-পরিষদের ওপর ন্যস্ত হল। বাংলার গভর্নর হলেন গভর্নর জেনারেল। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণর এবং শাসন পরিষদ বাংলার বড়লাট ও তাঁর শাসন পরিষদের অধীন হলেন।

কোম্পানির কর্মচারীদের অপরাধের বিচার করার জন্য কলকাতায় একটা উচ্চ আদালত (সুপ্রিমকোর্ট) স্থাপিত হল। হেস্টিংসের বন্ধু ইলাইজা ইম্পে হলেন এই আদালতের প্রধান বিচারপতি।

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্টের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় তবে এর কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পার্লামেন্টের গোচরীভূত হয়। হেস্টিংসের কোন কোন কাজ সম্পর্কেও পার্লামেন্টে প্রশ্ন ওঠে। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিস পার্লামেন্টের অধিকার ও প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে 'ইন্ডিয়া এ্যাক্ট' নামে এক নতুন আইন বিধিবদ্ধ করানো হয়। এই আইনের বলে বিলাতে 'বোর্ড অব্ কন্ট্রোল' নামে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি স্বরূপ এক শাসন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে স্থায়ীভাবে ও সম্পূর্ণরূপে এই পরিষদের অধীন করা হয়। বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতির হাতেই ভারতীয় ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কোম্পানির কর্তৃপক্ষের হাতে সামান্য ক্ষমতা থাকে।

হেস্টিংসের আমলে বিচার ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করা হয়। দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ইংরেজ বিচারকদের ওপরই দেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও তাঁদের দেওয়া হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংসের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস নায়েব নাজিমের হাত থেকে ফৌজদারি বিচারের ভার ইংরেজ বিচারকদের অধীন এক নতুন শ্রেণীর ভ্রাম্যমাণ আদালতের হাতে দিলেন। এই ভাবে প্রশাসন ও বিচারের প্রতিটি স্তর থেকে নবাবী আমলের চিহ্ন মুছে দিয়ে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। নবাবের ক্ষমতার মধ্যে রইল উপাধি বিতরণ।[৩]

হেস্টিংসের আমলেই রাজনৈতিক অস্থিরতা, সরকারী আমলা, জমিদারদের অত্যাচার ও অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলা ও তার আশপাশ অঞ্চলে

অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ছোট বড় আকারের কৃষক, সন্ন্যাসী, ফকির ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ঘটে।[৪]

ওয়ারেন হেস্টিংসের পর গভর্নর জেনারেল হিসাবে আসেন লর্ড কর্নওয়ালিস। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে এক প্রস্তাবে বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতিকে বাংলাদেশে ভূমিরাজস্বের হেস্টিংস প্রবর্তিত বাৎসরিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন প্রথা প্রবর্তন করতে বলা হয়। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্যই ইংলন্ডের জমিদার শ্রেণীর অন্যতম প্রতিনিধি লর্ড কর্নওয়ালিসকে উপরোক্ত পদে নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। কর্নওয়ালিসের নিজের কথায় বলা যায় যে তিনি এদেশে এসে দেখলেন, 'কৃষি ও ব্যবসাবাণিজ্য ধ্বংসের মুখে, জমিদার ও প্রজারা গভীর আর্থিক সংকটে, কেবলমাত্র মহাজনরাই ফুলে ফেঁপে উঠছে।' তৎকালে প্রচলিত ভূমিরাজস্বের বাৎসরিক ব্যবস্থা জমিদার বা প্রজার কারুরই স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। প্রথমে দশশালা ও পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন কর্নওয়ালিস—ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রসারে এবং পরবর্তীকালে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই ভূমি ব্যবস্থার বিশেষ অবদান আছে।

আপাত দৃষ্টিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার নানা সংকটের মুস্কিলআসান হিসাবে দেখা হলেও এর পেছনে লর্ড কর্নওয়ালিসের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিস সাম্রাজ্যের স্বার্থে এমন এক নতুন সামন্ত শ্রেণী তৈরী করা যাঁরা জাতীয় ঐতিহ্য ও বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হবেন না এবং যাঁদের ওপর নির্ভর করে এই দেশকে চিরদিনের জন্য অনগ্রসর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে আবদ্ধ রেখে দেশের ভবিষ্যৎ আর্থিক কাঠামোকে পঙ্গু করে দেওয়া যাবে। কৃষি নির্ভর এই দেশের আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়লে দেশজ ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য তার বাজার হারাবে এবং সেই সুযোগে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় ইংলন্ড থেকে আমদানি করা শিল্পজাত দ্রব্য দেশজ শিল্পজাত দ্রব্যকে হটিয়ে এদেশের বাজার দখল করবে; কারণ শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলন্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঃ ১) ইংরেজ সরকারের রাজস্বের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা, ২) হাতে প্রচুর টাকা আছে, শহরের এমন কিছু ধনী ব্যক্তিকে জমিদারি ও মধ্যস্বত্বের অধিকার কিনে নিতে জমা অর্থ নিয়োগে উৎসাহিত করা। অর্থাৎ আর্থিক পুঁজিকে শিল্প বা অন্য কোন ক্ষেত্রে নিয়োজিত না করে, কৃষিতে নিয়োজিত করা। আর তা হলেই ভারতবর্ষ একটি কৃষিমূলক দেশ হিসাবে ইংলন্ডের শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামাল সরবরাহ করে যাবে এবং ইংলন্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের বা পণ্যের স্থায়ী বাজারে পরিণত হবে। এদেশে শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে না। উপরন্তু এই ব্যবস্থা ধনী জমিদারদের সঞ্চিত অর্থ তাঁদের জমিদারির উন্নতি সাধনে ব্যয় করতে উৎসাহিত করবে, ফলে কৃষিজাত খাদ্য

শস্যের বা পণ্যের সংকট দেখা দেবে না। আর খাদ্য-শস্যের মোটামুটি সুরাহা হলে রাজশক্তির সামনে কোন জরুরী সংকট দেখা দেবে না, ৩) এই নতুন গজিয়ে ওঠা জমিদাররা নিজেদের স্বার্থেই ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখবেন; কখনই ইংরেজ শাসনের পরিবর্তন কামনা করবেন না।

নতুন জমিদারি প্রথার সঙ্গে ইংরেজ শাসনের এই যোগাযোগের ফলে বাংলাদেশে একটা নতুন সামাজিক স্তর গড়ে ওঠে; পত্তনিদার, দরপত্তনিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায় এই মধ্যস্বত্বপ্রথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যাদের মধ্য থেকে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়।

আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন বা ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাংলা তথা ভারতে যাতে ঐ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস অত্যন্ত সুচতুরভাবে চিরস্থায়ী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন। উইলিয়ম কেরীর কলকাতা আসার এক মাস আগে কর্নওয়ালিস ভারত ত্যাগ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন স্যার জন শোর। জন শোর ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও উদাসীন, কোন উদ্যোগই তিনি গ্রহন করেননি।[৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে কলকাতা বাংলার নবাবী আমলের অন্যান্য শহরগুলির থেকে জনসংখ্যা, ব্যবসাবাণিজ্য, সাংস্কৃতিক চর্চা, শিক্ষা ইত্যাদিতে অনেকখানি এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কলকাতার নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক স্তর বিন্যাসেও পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছে; মধ্যস্বত্বভোগী নতুন জমিদার শ্রেণী কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক কর্মেরত বেনিয়ান, দেওয়ান, মহাজন, সুবর্ণবণিক, তন্তুব্যবসায়ী বসাক ও তাঁদেরই পাশাপাশি পাশ্চাত্য ভাবধারায় আকৃষ্ট সংস্কৃতিমনা মার্জিত শিক্ষিত ঠাকুর পরিবারের মত কিছু পরিবারের উল্লেখযোগ্য সহ-অবস্থান দেখা যায়। এঁদের বেশীর ভাগের পূর্বপুরুষই নতুন রাজানুকূল্য বা অধিক ধনসম্পদের আশায় গ্রামবাংলা থেকে কলকাতায় বসবাস স্থাপন করেন। সমাজে তাঁদের মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য অনেকেই মন্দির নির্মাণ, জলাশয় খনন, ঘাট নির্মাণ, চন্ডীমন্ডপ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে অর্থব্যয় করতেন। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের দান ধ্যান, ভোজ দেওয়া ইত্যাদি বিশেষ মর্যাদাজ্ঞাপক কাজ বলে মনে করতেন। তাঁরা কলকাতায় বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন এবং তা পশ্চিম থেকে আমদানি করা নানা মূল্যবান কাঁচ, কাঠ, পাথর ও ধাতুর সামগ্রী দিয়ে সাজাতেন। এই শ্রেণীর অনেক লোকই য়ুরোপীয়দের সঙ্গে জাহাজ-পরিবহন, কয়লা উৎপাদন বা বিভিন্ন এজেন্সি হাউসে ব্যবসায়ে রত হয়েছিলেন। তবে ক্রমশ দেখা যায়

ব্যবসায়ে আশানুরূপ সাফল্যলাভ না করায় বা সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য জমিতেই তাঁদের পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছিলেন।

বাংলায় বাঙালি ছাড়াও ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মাড়োয়ারি, সিন্ধি, শেঠিয়া, ক্ষেত্রি প্রভৃতি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির ব্যবসা করতেন। সেই সঙ্গে মহাজনী কারবারও এঁদের একটা প্রধান ব্যবসা ছিল। বাঙালিদের মতো ব্রিটিস ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এঁরা বিশেষ যোগ দিতেন না; নিজেদের আলাদা উত্তর ভারতীয় 'বানিয়া' জীবনযাত্রা প্রণালী বজায় রেখেছিলেন।

ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর থেকেই ইঙ্গভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্যের চরিত্র দ্রুত পাল্টাতে থাকে। ইংলন্ড শিল্পায়নে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও কৃৎকৌশল প্রয়োগ করতে থাকে; অপরদিকে বাংলা তথা ভারতের কৃষক ও কারিগররা মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন। কারিগরি কৃৎকৌশলের এই বৈষম্য দুই জাতির অর্থনৈতিক বিকাশধারায় বিরাট ফারাক সৃষ্টি করে। ফলে এদেশে ব্রিটিসের অর্থনৈতিক চাপ ও প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ইংলন্ডের ফ্যাক্টরিজাত পণ্য বাংলা তথা ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলে এবং দেশজ পণ্য বাজার হারায়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন আমদানিকৃত পণ্যের অর্থ জোগানের জন্য ভারতীয় জমিদাররা খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী জমিগুলিতে বাণিজ্যিক কৃষিজাত পণ্য যথা আফিম, নীল, আখ (চিনির জন্য), চা, কফি, তুলো, পাট ইত্যাদি উৎপাদন করতে থাকেন এইভাবে বাংলা তথা ভারত বিশ্ববাণিজ্যের শৃঙ্খলে জড়িয়ে পড়ে এবং দেশীয় কৃষকদের চরম দুর্দশা আরম্ভ হয়।[৬]

ব্রিটিস মালিকরা তাদের উন্নত শিল্প দিয়ে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যকে সমৃদ্ধতর করতে পারতেন। নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরী করে বহুমানুষের কর্মসংস্থান করতে পারতেন কিন্তু তা না করে তাঁরা ভারতবর্ষকে তাঁদের শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী অনুন্নত দেশে পরিণত করে রাখলেন। ভারতের কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদকে লুঠ করে ব্রিটিসরা এদেশের ওপর তাঁদের অর্থনৈতিক শোষনকে তীব্রতর করে তুললেন।[৭]

তৎকালীন বাংলার বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবনের দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায় তবে দেখা যায়, অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাই বেশী, পূর্বাঞ্চলে কিছু বৌদ্ধের বাস। হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ও তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। জীবিকার দিক থেকে ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা অধ্যাপনা, যজন-যাজন, কায়স্থরা লেখাপড়া ও চাষবাস, তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেরা কৃষিমজুর ও কুলবৃত্তি অর্থাৎ ছুতোর, কামার, কুম্ভকার, কাঁসারী, শাঁখারী, মৎস্যজীবী হিসাবে নিযুক্ত থাকতেন। সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা গ্রামের উপান্তে বসবাস করতেন এবং বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরী করা বা পাইক, বরকন্দাজ, পালকি বেহারা, চর্মকার ইত্যাদির কাজ করতেন।

রেভারেন্ড উইলিয়ম কেরী যখন বাংলা দেশে এসেছিলেন তখনকার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি তাঁর চিঠিপত্রে, জার্নালে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ অনুসরণ করেই আমরা দেখতে পাই, সেই সময় জাতিভেদ প্রথা বংশপরম্পরায় প্রচলিত ছিল। উত্তর পুরুষ পিতৃপিতামহের জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। জাতিভেদ প্রথা হিসাবে হিন্দুরা চারভাগে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হিসাবে বিভক্ত হলেও মূলত ভাগ ছিল দুটি—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। শূদ্রদের মধ্যে কায়স্থরা উচ্চ শ্রেণীর। সবচেয়ে নিম্নবর্ণের হচ্ছে হাড়ি। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে অবস্থাপন্ন লোকেরা স্বচ্ছল জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন আর গরীবরা নানা অনটনের মধ্যে থাকতেন। অবস্থা ভেদে বাসস্থানেরও তারতম্য হত। খাদ্যশস্য ও নানা জিনিষপত্র উৎপাদনে প্রাচীন স্থানীয় কারিগরিই ব্যবহৃত হত। যানবাহনও ছিল সেকেলে।

শহরে ও গ্রামে দেবদেউল, মন্দির, মসজিদ ছিল। হিন্দুরা ছিলেন তথাকথিত পৌত্তলিক। আরাধ্য দেবদেবীর মধ্যে লৌকিক দেবদেবীরও স্থান ছিল। সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, চড়কপূজা, বাংলা নববর্ষের উৎসব খুব ধূমধামের সঙ্গে হত। চড়কপূজাকে কেন্দ্র করে নানা রকম শারীরিক ও আত্মপীড়নমূলক প্রথা প্রচলিত ছিল। মুসলমানরা ছিলেন একেশ্বরবাদী। ঈদ্, মহরম, শবেবরাৎ ইত্যাদি অনুষ্ঠান তাঁরা করতেন। মুসলমান পীরের মাজারে মুস্কিল আসানের জন্য বহু হিন্দুকেও যেমন প্রার্থনা করতে দেখা যেত তেমনি হিন্দুদের বহু দেবস্থানেও মুসলমানেরা পূজা দিতেন। হিন্দু ও মুসলমান মানুষ পাশাপাশি বহুদিন একসঙ্গে বসবাস করার জন্য এবং বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই নানা কারণে ধর্মান্তরিতহিন্দু হওয়ার জন্য পরস্পরের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পরস্পর সহযোগিতা করতেন।

তৎকালে অপুষ্টিজনিত ও নানাবিধ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। শিশু মৃত্যুর হার ছিল বেশী। সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল। প্রচলিত ছিল কৌলিন্য প্রথা ও পণপ্রথাও। পারিবারিক অবস্থা বিশেষে বিবাহে জাঁকজমক হত। বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল না। অন্যায় নিষ্ঠুর বিধিনিষেধের ফলে সমাজে বহু নারীর জীবনই বিড়ম্বিত হয়েছে।

হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্জলী যাত্রা প্রচলিত ছিল। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে নদীর তীরে, বিশেষ করে গঙ্গানদীর তীরে সাময়িক ছাউনির তলায় রাখা হত এবং তাঁর পা দুটি নদীর জলে ডুবিয়ে দেওয়া হত। ফলে ঠান্ডা লেগে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হত। সতীদাহ বা সদ্য বিধবা স্ত্রীর সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। অবশ্য এই প্রথার বিরুদ্ধে একটা জনমত ক্রমশ গড়ে উঠছিল। হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করতেন, মুসলমানেরা কবর দিতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই কুসংস্কার বশত জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের বা বর্ণের মৃতদেহ স্পর্শ করতেন না। (মদনাবাটিতে কেরীর পারিবারিক জীবনে এই

সম্পর্কে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল)। অবশ্য সেই সময় ইংলন্ড সহ পৃথিবীর সবদেশের মানুষের মধ্যেই নানা রকম কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল।

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিশুদ্ধ বাংলা বলতেন। সাধারণ মানুষ নানা জায়গায় প্রচলিত উপভাষা ব্যবহার করতেন। দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে থাকায় বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে বহু আরবি, ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। উত্তর ভারত থেকে আগত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করতেন।[৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তৃত হয়, ফলে নানাবিধ ব্যাভিচার প্রবেশ করে। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যদিকে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব লক্ষণীয়। এদের মধ্যে ধর্ম, জাতি ইত্যাদি কোন ভেদাভেদ ছিল না বটে তবে নৈতিক দিকটি প্রশ্নাতীত নয়।

মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য কবি ভারতচন্দ্রের এবং আধুনিক যুগের প্রথম প্রবক্তা কবি ঈশ্বরগুপ্তর মধ্যবর্তীকালে কোন উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্য রচিত হয়নি। রচনার মধ্যে ছিল কবিগান, তর্জা, আখড়াই, খেউড় ইত্যাদি জাতীয় জিনিষ যা একান্তভাবেই আদিরসাত্মক ও নিম্নরুচির। এই সব সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অল্প শিক্ষিত বা নিম্নরুচির জমিদার, মহাজন এবং এক শ্রেণীর অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ, যাঁদের মধ্যে সুস্থ মানসিকতার অভাব ছিল।[৯]

বাংলা সাহিত্যিক গদ্য বলতেও যা বোঝায় তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়নি। দলিল, দস্তাবেজ ও ব্যবসায়িক কারণে বা আদান প্রদানে আরবি, ফারসি বহুল গদ্য ব্যবহৃত হত। অবশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এইসব বাংলা পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতবহুল বাংলা থেকে অপেক্ষাকৃত কম কৃত্রিম ছিল। রাধাবল্লভ দাসের 'সহজ তত্ত্ব'র মত কিছু গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা গদ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তা আজকালের 'অদীক্ষিত' মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। মহারাজ নন্দকুমারের কিছু ব্যক্তিগত পত্রও এই শ্রেণীর।

এই সময় কিছু কিছু খ্রিস্টান মিশনারি এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বাংলার চর্চা করেছেন তাঁদের ধর্মপ্রচার ও ব্যবসায়িক স্বার্থে। তারও আগে মানোএল দা আপসুম্পসাঁও, দোম আন্তনিও'র প্রচেষ্টা এদিক থেকে উল্লেখ করা যায়, তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যিক গদ্যের ক্রমবিকাশে এঁদের লিখিত বইগুলির অবদান নগণ্য। সমসাময়িক সিভিলিয়ানদের মধ্যে এন. বি. হ্যালহেড 'এ গ্রামার অব্ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' নামে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে একটি বই প্রকাশ করেন। তখন বাংলা বর্ণমালার ছাপাখানা না থাকায় তিনি চার্লস উইলকিন্সের সহায়তা গ্রহণ করেন। উইলকিন্স এ

ব্যাপারে পঞ্চানন কর্মকার সহ কয়েকজন বাঙালি মুদ্রণ শিল্পীর সাহায্য পান। কলকাতায় সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর আইনের ধারাগুলি বাংলায় অনুবাদ করার গুরুদায়িত্ব পড়ে জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমনস্টোন এবং এইচ. পি. ফর্স্টারের ওপর। আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ গড়ে তোলার ব্যাপারে হ্যালহেড ও ফর্স্টারের বিশেষ অবদান থাকলেও সৃজনশীল বাংলাগদ্যের গঠন ও পুষ্টির মূলে প্রাচ্য ভাবধারায় আকৃষ্ট মননশীল ব্রিটিস চিন্তাবিদদের ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব অনস্বীকার্য।[১০]

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালের শেষ সময়ে দেশে একটা রাজনৈতিক স্থিতি এসেছিল এবং নতুন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উত্থান হয়েছিল; এঁরা সুস্থির ভাবে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা আরম্ভ করেছিলেন। বাঙালি সমাজজীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা বাংলা গদ্য শৈলীর মধ্য দিয়ে একটা সুস্থ বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজছিল। তৎকালীন খ্রিস্টান মিশনারিরা একদিকে যেমন বাংলা গদ্যের মাধ্যমে তাঁদের ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেছিলেন, তেমনি তাঁদের মতবাদকে খন্ডন করে হিন্দু ধর্মসংস্কারকরাও বাংলা গদ্যের মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন। উইলিয়ম কেরীও সেই প্রচেষ্টার একজন উদ্যোক্তা। ব্রিটিস সরকারী কর্মচারীরাও তাঁদের ব্যবসায়িক ও শাসন সংক্রান্ত কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে থাকেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে ভারত সম্পর্কে একটা বিশেষ ঔৎসুক্য জাগে। এঁদের মধ্যে ভোলতেয়ার, এ্যাবি রেন্নাল এবং জাঁ সিলভা বেইলির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের দৃষ্টি অনুসরণ করে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু পন্ডিত ব্যক্তি ভারতের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আকৃষ্ট হন। এই পন্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে এ্যাডাম ফার্গুসান, উইলিয়াম রবার্টসন, জন প্লেফেয়ার এবং এ. মিউকোনোচি অন্যতম। মিউকোনোচি তাৎকালিক ভারত সম্পর্কিত ব্রিটিস কর্তৃপক্ষকে জানান যে ভারতের বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, পুরাতত্ত্ব বিষয়ে যদি তথ্য সংগ্রহ করা যায় তবে তা য়ুরোপীয় গবেষণার দ্বারা আরো সমৃদ্ধশালী হবে। ভারতের ইতিহাস, কাব্য, পুরাণ বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাসকে জানতে য়ুরোপীয়দের বিশেষভাবে সহায়তা করবে। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বাস্তব প্রশাসনিক প্রয়োজনে ব্রিটিস কর্তৃপক্ষের কাছে হিন্দু ও মুসলমানের আইন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি, অঞ্চল বিশেষে রাজস্বব্যবস্থা ইত্যাদি জানার জন্য উচ্চপদস্থ ব্রিটিস কর্মচারীদের মধ্যে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শিক্ষার বিশেষ তাগিদ দেখা দেয়। সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শিক্ষা করতে গিয়ে এই সব ভাষার সাহিত্যিক সম্পদের প্রতি অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং গভীর অধ্যয়ন ও গবেষনায় মন দেন। ইংলন্ডের এই প্রাচ্যবিদ্‌দের আমরা 'ব্রিটিস ওরিয়েন্টালিস্ট' বলে থাকি। প্রশাসনিক ব্যাপার ছাড়াও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আগত কয়েকজনও এই দলে পড়েন। এই সব ব্রিটিস

ওরিয়েন্টালিস্টদের মধ্যে উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন্, জেমস্ প্রিন্সেপ এবং উইলিয়ম কেরী অন্যতম। প্রাচ্যদেশীয় ভাষা বিশেষ করে সংস্কৃত ও ফারসি, ভারতীয় দর্শন, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন। এঁরা এদেশীয় সাধারণ মানুষকে আপনজন বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিশে কলকাতাকে কেন্দ্র করে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। দুই ভিন্ন দেশের, দুই ভিন্ন সমাজের, দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র ঘটিয়ে একটা নতুন সমাজ সচেতনতা ও মানসিকতা সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে আমরা পরবর্তী সময়ের তথাকথিত বাংলা রেনেশাঁসের ভিত্তিভূমি বলতে পারি; অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রভাব ও তার ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার লীলাক্ষেত্র হয়েছিল কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলাদেশ। অপরদিক থেকে বলা যায় ব্রিটিস ঔপনিবেশিকদের স্বার্থে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে 'ভারতীয়করণ' (Indianisation) করতে এই ব্রিটিস ওরিয়েন্টালিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।[১১]

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানতে পারা যায় যে ব্রিটিস প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থার আগে বাংলা তথা ভারতের অতি উচ্চমানের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দ্বিস্তর বিশিষ্ট এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠশালা, মক্তব বা ফারসি শিক্ষার পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যদিয়ে সাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপযোগী লেখাপড়া, হিসাব কষা ইত্যাদি সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষার উপকরণের অভাব থাকলেও খোলামেলা জায়গায়, উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে এই শিক্ষা দেওয়া হত। সেই সময় ইংলন্ডে যে ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তুলনামূলকভাবে তার চেয়ে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিবেশ অনেক উন্নত ছিল। পাঠশালার শিক্ষক সাধারণত গুরুমশাই নামে পরিচিত ছিলেন; ব্রাহ্মণ ছাড়াও বহুক্ষেত্রে শিক্ষিত কায়স্থরাও গুরুগিরি করতেন। পাঠশালায় 'সর্দার পোড়ো' প্রথার চল ছিল। ইংলন্ড আমাদের দেশ থেকে এই প্রথা তাদের প্রাথমিক শিক্ষায় চালু করেছিল। জমিদার, উদারমনা ব্যক্তি ও রাজপুরুষেরা এই গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মসজিদকে কেন্দ্র করে মক্তব গড়ে উঠত। মক্তবের শিক্ষককে 'আখানজী' বলা হত। এখানে আরবি ফারসির প্রাথমিক পাঠ ও ইসলামধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত।

বহুক্ষেত্রে জাতিভেদের কুসংস্কার ও অভিভাবকের অর্থনৈতিক দুরবস্থা অনেক ছেলের পাঠশালায় যোগদানের প্রতিবন্ধক ছিল। সামাজিক কুসংস্কার ও পর্দা প্রথার জন্য প্রকাশ্যে স্ত্রীশিক্ষার চল ছিল না। উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পরিবারে বাড়ীতে স্ত্রীশিক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে দু-চারজন উচ্চ শিক্ষাও লাভ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে খ্রিস্টান মিশনারিরা স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ করে খ্রিস্টান বালিকাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[১২]

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে হিন্দুদের টোল, চতুষ্পাঠী ও মুসলমানদের মাদ্রাসাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। হিন্দু ছাত্রদের সাধারণত বারো বছর বয়স হলে পাঠশালার পাঠ শেষ করে টোলে বা চতুষ্পাঠীতে উচ্চমানের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হত। বিদগ্ধ পন্ডিতগণ এই সব প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করতেন। উইলিয়াম এ্যাডামের প্রতিবেদনে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকেই কলেজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার প্রায় প্রতিটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে একাধিক টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। কোন কোন জায়গায় ছাত্রসংখ্যা কয়েক শতাধিক। সুদূর নেপাল, আসাম, ত্রিহুত, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে নবদ্বীপে ছাত্ররা অধ্যয়ন করতে আসতেন। নবদ্বীপকে পূর্বের বারাণসী বলা হত।

উচ্চমানের এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, পুরাণ, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতির্বিদ্যা, তন্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয় পড়ান হত। মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। ছাপার অক্ষরে কোন বই ছিল না। পন্ডিতেরা হাতে লেখা পুঁথি থেকে বা বংশ পরম্পরায় আয়ত্ত করা বিদ্যা নিজেদের স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে শিক্ষাদান করতেন। কিছু ধনী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বেদ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলি অধ্যয়ন করতেন। অল্পসংখ্যক মহিলাই এই উচ্চতর শিক্ষা অন্তঃপুরে পৃথকভাবে লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে দু-একজন খ্যাতিও লাভ করেছেন। বৈদ্যরা ভেষজ বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতেন।

ছাত্রদের প্রদত্ত উপহার, কায়িকশ্রম ব্যতিরেকে জমিদার ও ধনী ব্যক্তিগণ পন্ডিত মশাইদের ব্রহ্মোত্তর ভূমিদান, নানারকম দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থ দক্ষিণা হিসাবে প্রদান করতেন। রাজানুকূল্যেরও অভাব হত না। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত প্রগাঢ় পান্ডিত্য ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী পণ্ডিত হুগলীতে শিক্ষাদান করতেন।

টোল ও চতুষ্পাঠীর মতো উচ্চমানের ইসলামী শিক্ষার জন্য বহু অঞ্চলে মাদ্রাসা বিদ্যমান ছিল। আরবি ফারসি সাহিত্য, ইসলামী সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে নানা বিষয় পড়ান হত। এক্ষেত্রে রাজকীয় বা জমিদারি সনদের ওপর নির্ভর করে বা সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের আনুকূল্যে ব্যয়ভার নির্বাহের ব্যবস্থা হত। মুসলমান সমাজেও সাধারণভাবে নারী শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা হত। মুষ্টিমেয় সম্ভ্রান্ত পরিবারে জেনানা পদ্ধতিতে কয়েকজন মুসলমান নারী শিক্ষালাভ করেছিলেন।[১৩]

পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকেই বাংলায় সরকারী প্রশাসন ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। নবাবী পরিবারে একদিকে বিলাসব্যসন এবং অন্যদিকে নানাবিধ গুপ্ত ষড়যন্ত্র রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্রকে বিকল করে দেয় এবং শিক্ষা ও জনহিতকর কাজে সরকারী অর্থের সদ্ব্যবহার বন্ধ হতে থাকে। ফলে বাংলার নিজস্ব প্রাথমিক ও উচ্চমানের শিক্ষাব্যবস্থা আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করে এবং নবাবের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগের গাফিলতির জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রশাসন ও পরিদর্শন বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলতে থাকে। ফলে

স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পারেনা।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে বাংলায় ইংরেজ শাসন অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় নবাবী আমলের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা এবং ধনী, অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর মানুষেরা ইংরেজদের আনুকূল্য লাভের আশায় ও বংশধরদের ইংরেজদের অধীনে সরকারী কাজে নিযুক্ত করার বাসনায় ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকার খ্রিস্টান মিশনারিদের এদেশে ধর্মপ্রচারের কাজকে ভাল চোখে না দেখলেও মিশনারিরা এদেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষার ব্যাপারে দেশীয় শিক্ষার কিছু কিছু পরিকাঠামো গ্রহণ করলেও নিজেদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করতে থাকেন।

সুইডেনবাসী ধর্মযাজক জে. জেড. কিয়েরনাণ্ডার ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর কলকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে য়ুরেশীয় খ্রিস্টান ছেলেমেয়েরাই শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর প্রতিষ্ঠিত মদনাবাটির বিদ্যালয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলার ছেলেমেয়ে পড়তে পারত। সুতরাং আধুনিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোয় ও পরিকল্পনায় কেরীর বিদ্যালয়ই বাংলার সাধারণ মানুষের প্রথম বিদ্যালয় বলে ধরে নেওয়া যায়।[১৪]

খ্রিস্টান মিশনারিরা বা কোম্পানির শাসনকালের ব্রিটিস ওরিয়েন্টালিস্টগণ প্রাথমিক বা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পথ গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের দেশে প্রচলিত দেশীয় বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বিধানের জন্য নয়। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবহেলিত রেখে, সেগুলির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তাঁরা তাঁদের দেশের অনুরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পথ বেছে নিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় 'দেশের মাটীর দেশীয় গাছগুলির মূল থেকে মাটী সরিয়ে নিয়ে সেগুলিকে অবহেলিত অবস্থায় শুকিয়ে যেতে দিয়ে, ইংলন্ড থেকে নতুন চারা গাছ এনে তাঁরা রোপণ করলেন।' অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে পরিকল্পিতভাবে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিজাতীয়করণের যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল, পরবর্তী শতাব্দীতে কলকাতা কেন্দ্রিক তথাকথিতবাংলা রেনেশাঁসের মধ্যদিয়ে তা পরিণতি লাভ করল। বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ গণশিক্ষার ফল্গুধারা শেষপর্যন্ত মরা সোঁতায় পরিণত হল; আর ইংরেজি শিক্ষার প্রবক্তাদের আবেগে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্যশিক্ষা রাজপথের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল।[১৫]

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কি ধাঁচে গড়া হবে, বাংলা তথা ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থা কি হবে ওয়ারেন হেস্টিংস তার একটা ছক তৈরী করেছিলেন। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন 'কলিকাতা মাদ্রাসা'। ব্রিটিশ রাজশক্তির স্বার্থে শিক্ষিত মুসলমানদের কিভাবে খাপখাওয়াতে হবে তারই নক্সা তৈরী করে দিলেন 'কলিকাতা মাদ্রাসা'র পঠনপাঠন ও পরিচালনায়। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল 'এশিয়াটিক

সোসাইটি। সমৃদ্ধশালী প্রাচ্যদেশীয় ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারার জারকরসে জারিত করার তিনি ব্যবস্থা করলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট দেশীয় ব্যক্তিত্বদের সেই জারক রসে অভিসিঞ্চত করে 'ব্রিটিস ওরিয়েন্টালিস্ট' গণ দেশজ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার তথাকথিত নবজাগরণের আবির্ভাবের পথকে মসৃণ করেছিলেন।[১৬]

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিকযুগ) ৩য় খণ্ড, (২য় সং, কলিকাতা, ১৩৮১ বং) পৃঃ ৪।

২। তদেব পৃঃ ৫; Hunter, W.W.—The Annals of Rural Bengal (Govt. of W.B. Pub., Calcutta 1996) p.17.

৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার—প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০-১১; Roberts, P.E.—History of British India under The Company and The Crown (O.U.P., London, 1921, Reprinted Second. Edn. 1952) p. 182.

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার—প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১-২৫.

৫। Sinha, N.K.—Economic History of Bengal (Vol. II), Calcutta, 1962. Ch. VII; Dutta, R.P.—India Today (Bombay, 1947) p. 192; অমলেন্দু দে,—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী (কলিকাতা, ১৯৮১) পৃঃ ১-৩.

৬। Kling, Blair B.—Partner in Empire (Calcutta, 1981), Introduction; For special reference Kling, Blair B. 'Economic Foundations of The Bengal Renaissance' (An essay in Aspects of Bengali Society—Ed. by Baumer, Rachel Van, Honolulu, 1976).

৭। Sinha, N.K.—Economic History of Bengal (Vol. I) Calcutta, 1956, Ch. X.

৮। B.M.S.—Periodical Accounts (Vol. I) London, 1800.

৯। De, S.K.—History of Bengali Literature In The Ninteenth Century (Calcutta, 1919) p. 42-43.

১০। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (কলিকাতা, ১৩৬৩ বং), দ্বিতীয় অধ্যায়; Mukherjee, Amitabha—Reform And Regeneration In Bengal (Calcutta, 1968) pp. 343-44.

১১। Kopf, David—British Orientalism And The Bengal Renaissance (Calcutta, 1969), p. 5; Dharampal—The Beautiful Tree (New Delhi, 1983), Introduction. Sec II.

১২। Mukhopadhyay, Gopal—Mass Education In Bengal (Calcutta, 1984) Chap I, Sec.1; Mukherjee, Amitabha—প্রাগুক্ত., p. 339; Adam. W—Reports On The State of Education in Bengal (Calcutta 1941) pp. 480-81; Dharampal—প্রাগুক্ত., p. 14.

১৩। Adam. W—প্রাগুক্ত., pp. 166-84.

১৪। Mukhopadhyay, Gopal—প্রাগুক্ত., p. 27.

১৫। Dharmapal—প্রাগুক্ত., p. 56; Gandhi, Mahatma, The Collected Works of—Vol. 48, The Publications Division, Govt. of India, (New Delhi, 1971), p. 199.

১৬। Asiatic Society of Bengal, Contemporary Review of, from 1784 to 1883. (Calcutta) p. 8; Kopf, David, প্রাগুক্ত., p. 20.

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্-কেরী-যুগে কলকাতায় বিদেশীদের সংস্কৃত চর্চা

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ব্রিটিস ইত্যাদি য়ুরোপের নানা জাতি কোম্পানি গঠন করে প্রাচ্যদেশ বিশেষত ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়। অপরদিকে অভিযান-প্রিয় কোন কোন ব্যক্তি একক অথবা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে স্থলপথে অথবা জলপথে ভ্রমণের এবং দেশ আবিষ্কারের নেশায় বেরিয়ে পড়েন। এঁদের ভ্রমণকাহিনীর রোমাঞ্চকর বিবরণ নানা শ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করে। শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মানুষও প্রাচ্যদেশ তথা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহলী হন। ভারতের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার বিশেষত ভারতীয় ধর্মদর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেন—এঁদের মধ্যে ভোলতেয়ার বা এ্যাবি রেনাল এবং জাঁ সিলভাঁ বেইলি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন অগ্রগণ্য।[১]

ভারত-অনুসন্ধিৎসার এই প্রবণতা য়ুরোপথেকে ব্রিটিস দ্বীপপুঞ্জে সংক্রমিত হয়; এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এডাম ফার্গুসন, উইলিয়াম রবার্টসন, জন প্লেফেয়ার, এ.সি. মিউকোনোচি প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হন।[২] এই আগ্রহ ভারততত্ত্বের গবেষণায় পর্যবসিত হয়।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির কুঠিয়াল ছিলেন জে. মার্শাল। ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দেই তিনি ভাগবতের দশম স্কন্দের ইংরেজি অনুবাদ করেন[৩] এবং সেই তর্জমা লন্ডনে প্রেরণ করেন। তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংস্কৃত শেখেন। এরপর প্রায় একশ বছরের মধ্যে কোম্পানির আর কোন কর্মচারীর সংস্কৃত বা অন্য কোন দেশীয় ভাষা সম্পর্কে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে আসেন, তখন তিনি বাংলার গভর্নর, পরে হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল বা ভারতের বড়লাটের পদে উন্নীত হন। হেস্টিংসের ভারতে আগমনের আগেই কোম্পানির দুই এক জন কর্মচারী ভারতের পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করেন। এঁদের মধ্যে একজন জন. হলওয়েল। ভোলতেয়ার হলওয়েলের লেখা থেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেছিলেন।[৪] আলেকজান্ডার ডাও নামে কোম্পানির আরেকজন কর্মচারীও ভারতীয় ইতিহাস ও

দর্শন চর্চা করেছিলেন। উইলিয়ম কেরীর দিনপঞ্জী ও তাঁর লিখিত নানা চিঠিপত্রে হলওয়েল ও ডাও-এর গ্রন্থের উল্লেখ আছে।[৪ক]

হেস্টিংস ও প্রাচ্যবিদ্যা ঃ

বড়লাটের পদ অলঙ্কৃত করার পরই হেস্টিংস ভারতের শাসন পদ্ধতিকে শৃঙ্খলার সঙ্গে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় দেশীয় ভাষা শিক্ষা। দেশীয় ভাষায় জ্ঞান না থাকলে কখনই ন্যায়বিচার করা যায়না।[৫] বিজিত জাতির আস্থা অর্জনের জন্য তাদের আচার-ব্যবহার ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য হেস্টিংসের আগে ক্লাইভও বাংলাভাষা শেখার প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু হেস্টিংসই কোম্পানির কর্মচারীদের নানাভাবে দেশীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত করতেন। হেস্টিংস অনুধাবন করেছিলেন দেশে প্রচলিত পুরাতন আইনের সাহায্যেই বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত, তাতেই এদেশের অধিবাসীরা ন্যায় বিচার লাভ করবেন। বিদেশী বিচারক যাতে দেশীয় আইনের সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারেন তাই তিনি হ্যালহেডের উপর আইনের অনুবাদের ভার অর্পণ করেন। বাংলা ব্যাকরণ রচনাতেও তিনি হ্যালহেডকে উৎসাহিত করেন, কোম্পানির সিভিলিয়ন কর্মচারীদের বাংলা ভাষায় শিক্ষিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। চালর্স উইলকিন্সের গীতার অনুবাদ তাঁর আনুকূল্যেই মুদ্রিত হয়; উইলকিন্সকে বাংলা হরফ নির্মাণে তিনিই উৎসাহিত করেন।

হেস্টিংস সুপ্রিম কোর্টের দোভাষী উইলিয়ম চেম্বার্সকে ইম্পে-কোডের ফারসি তর্জমার ভার দেন এবং জোনাথান ডানকান এই আইনের বাংলা অনুবাদ করেন।

মুসলিম জনগণের সুশিক্ষার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হেস্টিংসের অন্যতম প্রয়াস। এইভাবে তিনি মুসলিম জনগণের সঙ্গেও যোগসূত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন।

উইলকিন্সের শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অনুবাদ কোম্পানির অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। হেস্টিংস গ্রন্থটির যথাযোগ্য প্রচারের চেষ্টাও করেছিলেন। মনে হয় উইলকিন্সের অনুবাদ পাঠ করে গীতার মর্মবাণী তিনি কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির তদানীন্তন চেয়ারম্যান ন্যাথানিয়েল স্মিথকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন কৃষ্ণের শেষ উক্তিটিই গীতার মর্মবাণী—

"The last sentence with which 'Kreeshna closes his instruction to Arjoona, and which is properly the conclusion of the Geeta : 'Hath what I have been speaking, O Arjoona, been heard with thy mind fixed to one point? Is the distraction of thought, which arose from thy ignorance, removed?" তিনি বুঝেছিলেন জ্ঞানের আলোকে একটি লক্ষ্যবিন্দুতে মনের স্থিরীকরণই জীবনের পরম ব্রত। তাই তিনি আরও লিখেছেন—"I

hesitate not to pronounce the Geeta a performance of great originality, of a sublimity of conception, reasoning and diction almost unequaled"[৬] গীতার বাণী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি হেস্টিংসকে আকৃষ্ট করে। কোম্পানির কর্মচারীদের মনে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারে তাঁর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। ডেভিড কফ হেস্টিংসের এই প্রচেষ্টাকে আখ্যা দিয়েছেন সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রয়াস। অবশ্য অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হেস্টিংসের 'ভারতীয়করণে'র চিন্তাধারাকে প্রশংসা করলেও 'সংস্কৃতির সমন্বয়কে' দূরান্বয়ী ভাবনা মনে করেন।[৬ক]

উইলিয়াম জোন্স প্রমুখ কোম্পানির যে সব বিদগ্ধ কর্মী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে 'ভারতাত্মার' অনুসন্ধানে একাগ্র চিত্তে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে হেস্টিংসের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার কেন্দ্ররূপে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠায় হেস্টিংসের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের সাধনা ও ভারতের ধ্যান-ধারণাই ভারতীয়দের মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাঠি এবং একদিন যখন ভারতে ব্রিটিস শাসনের বিলুপ্তি ঘটবে তখনও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকীর্তি সগৌরবে বিদ্যমান থাকবে—"But such instances can only be obtained in their writing : and these will survive when British dominion in India shall have long ceased to exist."[৭]

হ্যালহেড ও সংস্কৃত চর্চা ঃ

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠারও আগে কোম্পানির য়ুরোপীয় কর্মচারীদের মধ্যে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডই (১৭৫১-১৮৩০) প্রথম সংস্কৃতের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হ্যালহেড অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন, বিখ্যাত নাট্যকার রিচার্ড শেরিডন (১৭৫১-১৮২৫) তাঁর সহপাঠী ছিলেন। সাহিত্য রচনা ও নাটক অভিনয়ের প্রতি হ্যালহেডের আগ্রহ ছিল।[৮] পরবর্তী কালের বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ উইলিয়ম জোন্সও তাঁর সহপাঠী ছিলেন। উইলিয়ম জোন্স হ্যালহেডকে প্রাচ্যভাষা শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেন এবং ভারতে আগমনের আগেই হ্যালহেড ফারসি ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৮৭২ সনে কোম্পানির কেরানি হয়ে তিনি ভারতে আসেন এবং কর্মক্ষেত্রে নানা পদের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবশেষে ফারসি অনুবাদকের পদ লাভ করেন। তাঁর ফারসি জ্ঞান ও কবিত্ব খ্যাতির কথা শুনে হেস্টিংস তাঁকে ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্র ফারসি ভাষায় তর্জমার ভারদেন, A Code of Gentoo Laws তারই ফসল।

Gentoo Laws তর্জমার সময় হ্যালহেডের সংস্কৃত জ্ঞান গভীর ছিল না; নিজেই বলেছেন 'A Code of Gentoo Laws লেখার সময় তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান ছিল, "very defective and insufficient" সুতরাং কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্মৃতিশাস্ত্রের

বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচনা করে ব্যবহারোপযোগী বিধিগুলি (laws) সংকলন করেন এবং ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। এই পণ্ডিতরা নামমাত্র পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন, দৈনিক একটাকা মাত্র। হ্যালহেড সেই ফারসি তর্জমাকে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত করেন। হ্যালহেড আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, ভাবানুবাদ করেছেন মাত্র। এই সময় তাঁর বয়স বাইশ বৎসর মাত্র, কিন্তু তখনই তিনি Gentoo Laws-এর তর্জমার সুবাদে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

যাইহোক ভরতে আগমনের পরেই তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিখতে থাকেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হ্যালহেড A Grammar of Bengal Language রচনা করেন। অবশ্য এটিই বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ নয়, তার অনেক আগেই অগাস্টিয়ান ধর্মযাজক মনোএল-দা-আসসুম্পসাঁও[৯] তাঁর Vocabularies রচনা করেছিলেন। দুখণ্ডে প্রস্তুত এই 'Vocabulario'র সঙ্গে বাংলাভাষার একটি ক্ষুদ্র ব্যাকরণও যুক্ত ছিল। ঐ বাংলা ব্যাকরণ পোর্তুগীজ ভাষায়, ল্যাটিন ব্যাকরণের আদর্শে ও রোমান হরফে রচিত হয়েছিল। এই ব্যাকরণটি মনোএলের নিজের প্রয়োজনে এবং পোর্তুগীজ পাদরিদের প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল। যদিও এটি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ তবু ব্যাকরণটি রচিত হওয়ার তিনদশকের মধ্যেই পুস্তকটি বিস্মৃতির অতলে চলে গিয়েছিল। হ্যালহেড মনোএলের গ্রন্থের উল্লেখ করেননি।

হ্যালহেডের ব্যাকরণও বাঙালিদের জন্য রচিত হয়নি, কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলাশেখানোর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, সুতরাং এই ব্যাকরণের অধ্যায় বিন্যাসেও ইংরেজি ব্যাকরণের রীতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু হ্যালহেডই প্রথম সংস্কৃতের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি লক্ষ্য করেন। ব্যাকরণের ভূমিকায় হ্যালহেড লিখেছেন—"The grand source of Indian Literature, the Parent of almost every dialect from Persian Gulph to Chaina Seas, is the Shanskrit, a language of most venerable and unfathomable antiquity, which although at persent shut up in the libraries of Bramins, and appropriated solely to the records of their religion, appears to have been current over most of the Oriental world; and the traces of its original extent may still be discovered in almost every district of Asia "[১০]

A Grammar of Bengal Language গ্রন্থে হ্যালহেড সংস্কৃতভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছেন[১১] এবং সংস্কৃতভাষার সঙ্গে হিন্দুস্থানী ভাষার সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করেছেন।[১২]

হ্যালহেডই প্রথম জোরের সঙ্গে বলেন যে সংস্কৃতভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং অন্তত কিছুটা সংস্কৃত জানা না থাকলে বাংলাভাষার জ্ঞান অসম্পূর্ণ

থেকে যায় "For if the Arabic language (as Mr. Jones excellently observed) be so intimately blended with the Persian as to render it impossible for the one to be accurately understood without a moderate knowledge of the other; with still more propriety may be urged the impossibility of learning Bengal dialect without a general and comprehensive idea of Shanskrit as the union of these two languages is more close and more general and they bear an original relation and consanguinity of each other."[১৩]

হ্যালহেড আরও বলেছেন তাঁর আগে যেসব য়ুরোপীয় বাংলাভাষার চর্চা করেছেন তাঁরা সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কটি খুঁটিয়ে বিচার করেননি।

রাজশক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে বহুবিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। মুসলমানী শাসনের দীর্ঘ কয়েকশ বছরে বহু আরবি, ফারসি শব্দ, বিশেষত শাসন ব্যবস্থা-সংক্রান্ত শব্দ বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। বহু পোর্তুগীজ শব্দ এবং ব্রিটিসশাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে বহু ইংরেজি শব্দও বাংলাভাষায় স্থানলাভ করেছে।[১৪] শব্দের এই অনুপ্রবেশকে হ্যালহেডকখনই সুনজরে দেখেননি। তিনি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত খাঁটি বাংলাভাষার ব্যাকরণই রচনা করতে চেয়েছেন—"The following work presents the Bengal language merely as derived from its Parent Shanskrit. In the course of my design I have avoided, with some care, the admission of words as are not natives of the country, and for that reason have selected all my instances from the most authentic and ancient composition"

হ্যালহেডই প্রথম লক্ষ্য করেন যে সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দের সঙ্গে গ্রিক ও ল্যাটিনভাষার বহু শব্দের সাদৃশ্য বর্তমান—"I have been astonished to find the similitude of Shanskrit words with those of Persian and Arabic and even of Latin and Greek"[১৫] উইলিয়ম জোন্সের আগেই ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে হ্যালহেড সচেতন হন এবং শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১৬]

Gentoo Laws তর্জমা করার সময় হ্যালহেডের সংস্কৃত জ্ঞান অগভীর ছিল সত্য, কিন্তু তিনি সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন। হ্যালহেড মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।[১৭] এছাড়া তিনি পুরাণার্থপ্রকাশ, ভাগবতপুরাণ, শিবপুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন।[১৮]

A Grammar of Bengal Language-এর প্রচ্ছদে মুদ্রিত সংস্কৃত শ্লোকটি হ্যালহেডের সংস্কৃত প্রীতির সাক্ষ্য বহন করে—

"ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং।।"[১৯]

ইন্দ্র প্রভৃতি (বৈয়াকরণরাও) যে শব্দ সমুদ্রের অন্ত পাননা, কোন নর সেই সমস্ত প্রক্রিয়া বলতে সক্ষম। প্রচ্ছদ পত্রে হ্যালহেড পুস্তকটি রচনার কারণও উল্লেখ করেছেন সংস্কৃত ভাষায়—'বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং/ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং।" [২০]

এই বিদগ্ধ সংস্কৃত প্রেমিক ব্যক্তিটির শেষ জীবন স্বদেশে, বিড়ম্বিত ও অপমানিত ভাবে অত্যন্ত কষ্টে যাপিত হয়।

চার্লস উইলকিন্স ঃ

চার্লস উইলকিন্স (১৭৫০-১৮৩৬) ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে কেরানির কাজ নিয়ে ভারতে আসেন। পরে কোম্পানির মালদহের কুঠির সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হন। উইলকিন্স হ্যালহেডের A Grammar of Bengal Language পুস্তকে উদ্ধৃত বাংলা উদাহরণগুলির জন্য হরফ নির্মাণ করেন। হেস্টিংস জানতেন যে উইলকিন্স দুই একবার আপন খেয়ালে ছেনী কেটে বাংলা কয়েকটি অক্ষর নির্মাণ করেছিলেন। তিনি উইলকিন্সকে হ্যালহেডের গ্রন্থের বাংলা হরফ প্রস্তুতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। উইলকিন্স হুগলীর অধিবাসী পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্যে ছেনী কেটে বাংলা হরফের ছাঁচ নির্মাণ করেন এবং ঢালাই করেন। বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় হ্যালহেড উইলকিন্সের প্রভূত প্রশংসা করেছেন। হ্যালহেডের ভাষায় উইলকিন্স একাধারে "The Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer."[২১] দুঃখের বিষয় তিনি পঞ্চানন কর্মকারের নাম উচ্চারণ করেননি। ভারতবর্ষে উইলকিন্সই প্রথম বাংলা, নাগরি, ফারসি প্রভৃতি লিপির সুদৃশ্য, সুছাঁদ হরফ উৎকীর্ণ ও ঢালাই করেন। ভারতীয় ভাষার অক্ষর নির্মাণের প্রথম শিল্পী রূপে এবং বিভিন্ন ধরণের হরফ খোদাই-এ পারদর্শিতার জন্য তাঁকে 'ভারতের ক্যাকস্টন'[২২] আখ্যা দেওয়া হয়। হ্যালহেডের উৎসাহে উইলকিন্স ফারসি ও সংস্কৃত ভাষা শিখতে থাকেন। হ্যালহেডের মতো উইলকিন্সের কলেজীয় শিক্ষার পটভূমিকা ছিলনা, কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তি বলে অল্পকালের মধ্যেই তিনি ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম হন। বাংলা ভাষা তিনি আগেই আয়ত্ত করেছিলেন। উইলকিন্স শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ইংরেজি অনুবাদ করেন। এটিই কোন য়ুরোপীয় কৃত সম্পূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ। তার আগে কাশিমবাজারের কুঠিয়াল জে. মার্শাল ভাগবতের অংশবিশেষ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। বড়লাট হেস্টিংসের আগ্রহাতিশয্যে কোম্পানির অর্থানুকূল্যে উইলকিন্সের গ্রন্থটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। গীতার ইংরেজি অনুবাদ হেস্টিংসকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল।

অক্সফোর্ডে সুশিক্ষিত ফারসি ভাষায় অভিজ্ঞ উইলিয়ম জোন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন। প্রথমে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। উইলকিন্সই তাঁকে সংস্কৃতভাষার প্রতি আকৃষ্ট করেন। উইলিয়ম জোন্স ও

চার্লর্স উইলকিন্স একযোগে প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের জন্য কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র Asiatic Researches পত্রিকায় উইলকিন্সের ভারত তত্ত্ব সম্পর্কিত বহু গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে উইলকিন্স ইংলন্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে উইলকিন্সের Fables of Pilpay প্রকাশিত হয়, এটি সংস্কৃত নীতি গল্প হিতোপদেশের অনুবাদ। ১৮০৮ সনে The Grammar of Sanskrit Language প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার অনেক আগেই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিনি একটি ক্ষুদ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সংস্কৃত ধাতুর তালিকা, The Radicals in Sanskrit Language. তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের কাহিনীরও ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদ তাঁর অসাধরণ কৃতিত্বের পরিচয়। উইলকিন্সই প্রথম কুটিল লিপিতে লিখিত দেবপালের মুঙ্গের অনুশাসনের পাঠোদ্ধার করেন। বাংলাভাষা থেকে আরবি, ফারসি শব্দ বিতাড়নের যজ্ঞে হ্যালহেডের সঙ্গে উইলকিন্সও ছিলেন অন্যতম হোতা, কিন্তু তিনি রিচার্ডসনের Persian, Arabic and English Dictionaryর দুটি খণ্ড যথাক্রমে ১৮০৬ ও ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করেন।[২৩]

১৮০৫ সনে ইংলন্ডের হেলিবেরিতে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়ন কর্মচারীরা ভারতে আগমনের আগে শিক্ষালাভ করতেন। উইলকিন্স ঐ কলেজের সংস্কৃতবিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ঐ কলেজের ছাত্রদের প্রয়োজনেই তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণটি রচনার বেশ কিছু পরে প্রকাশিত হয়।[২৪] মৃত্যুর তিন বছর আগে তিনি নাইটহুডে ভূষিত হন। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।[২৫] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে হ্যালহেডই প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চার্লস উইলকিন্স সেই সাহিত্যের রত্নরাজির কয়েকটিকে অনুবাদের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনেন; সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রতি শিক্ষিত সমাজকে আকৃষ্ট করেন।

উইলিয়ম জোন্স ঃ

উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪) ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন। ছাত্রজীবনেই তিনি প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ফারসি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ফারসি ভাষায় তিনি গ্রন্থাদিও রচনা করেন। জোন্স বহুভাষাবিদ্ ছিলেন; গ্রিক, ল্যাটিন, ফারসি, স্প্যানিস, আরবি, প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রতি প্রথমে তাঁর কোন অনুরাগ ছিল না। চার্লস উইলকিন্সই ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত উইলিয়ম জোন্সের মনে সংস্কৃত ভাষার

প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করেন। জোন্স নিজেও স্বীকার করেছিলেন যে "সংস্কৃতের প্রতি তাঁর আকর্ষণের মূল কারণ উইলকিন্স।"

উইলিয়াম জোন্স বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সাহায্যে তিনি মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদ করেন। তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ য়ুরোপে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। হিতোপদেশ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অনেকেই আকৃষ্ট হন এবং প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির আলোচনার একটি বাতাবরণ প্রস্তুত হয়। প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণার জন্য স্থাপিত এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম জোন্স ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ। তিনি আজীবন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে 'ভারতাত্মার' অনুসন্ধানই ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণার মহৎ কার্যক্রম।

চার্লস উইলকিন্স ছাড়াও অধ্যাপক কোলব্রুক, গিলখ্রিস্ট, প্রিন্সেপ প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিরা জোন্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সোসাইটির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন, সোসাইটির গবেষণা কার্যে তাঁরা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

সোসাইটির মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেসের প্রথম কয়েকটি খণ্ডে জোন্স ভারততত্ত্ব ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। ইংরেজ পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে জোন্সই প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদ্যার জনক বলা হয়। তাঁর আগে হ্যালহেড সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে গ্রিক, ল্যাটিন ও ফারসি শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলেন। বহুভাষাবিদ্ জোন্সের গবেষণার ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নামে এক নতুন বিদ্যার আবির্ভাব ঘটে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে জোন্স যে ভাষণ দেন তাতে তিনি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রিক, ল্যাটিন, কেলটিক ইত্যাদি ভাষার প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করেন। প্রাচীন পারসিক ভাষার সঙ্গে এই ভাষাগুলির প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান এগুলির উৎস একটি মূলভাষা। সেই ইন্দো-য়ুরোপীয় মূলভাষার অনুমান বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে ধারণা ও মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারণাকে নানাভাবে পরিবর্তিত করে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে জোন্সের স্বাস্থ্যহানি হয় এবং মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর অকালপ্রয়াণ ঘটে। প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার পথিকৃৎ উইলিয়ম জোন্সকে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

এইচ. টি. কোলব্রুক ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বঙ্গদেশে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌দের অন্যতম প্রধান ছিলেন হেনরি টমাস কোলব্রুক(১৭৬৫-১৮৩৭)। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে কোলব্রুক ভারতবর্ষে আসেন, তিনি কোম্পানির বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন ছিলেন। ভারতে আগমনের পর তাঁর কর্মস্থল ছিল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে। তখন তিনি গ্রিক ক্ল্যাসিক সাহিত্যের ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং সরকারী কাজের ফাঁকে ফাঁকে গ্রিক সাহিত্যের চর্চায় কালাতিপাত করতেন।[২৬] সংস্কৃতের প্রতি তখন তাঁর কোন অনুরাগ ছিলনা এবং উইলকিন্স প্রমুখ সংস্কৃত প্রেমীদের পরিহাস করতেন। কর্মসূত্রে তিনি বারাণসীতে বদলি হন, সেখানে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সংস্পর্শে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন ও সংস্কৃত সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার (১৮০০খ্রিস্টাব্দ) পরই তিনি কলেজের হিন্দু আইন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কলকাতার আপীল কোর্টের বিচারকও ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ সদস্যদের অন্যতম ছিলেন কোলব্রুক। ১৮০৭-১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। অমরসিংহের বিখ্যাত অমরকোষ কোলব্রুক ব্যাখ্যা ও টীকা সহ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বেদবিদ্যাচর্চার তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। বেদের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য তিনি অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন।[২৭] ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে কেলব্রুকের সুবিশাল, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ A Grammar of Sanskrit Language (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। কোলব্রুকের রচিত "On the Duties of a faithful Hindoo Widow", "On the Vedas or the sacred writtings of the Hindoos" প্রভৃতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানা প্রবন্ধ এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে প্রবন্ধগুলি Miscellaneous Essays পুস্তকের অর্ন্তভূক্ত হয়। ভারতীয় দর্শন এবং প্রাচীনভারতীয় গণিতশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতীয় নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত রূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

ভারতীয় সমাজ ও ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে কোলব্রুক অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পাঠ করে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে বৈদিক ভারতে সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথা প্রচলিত ছিল না এবং জাতিভেদ প্রথাও কাঠোর নিষ্ঠুর রূপ লাভ করেনি।[২৮] কোলব্রুক মনে করতেন তান্ত্রিকতা এবং পৌরাণিক ধর্মই ভারতীয় সমাজের অধঃপতনের মূল কারণ।[২৯] কোলব্রুক বিশ্বাস করতেন "Civilization had its origin in India"[৩০] ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যে অনুরাগের সূচনা হ্যালহেড করেছিলেন কোলব্রুকের মধ্যে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

জোনাথান ডানকান ঃ

জোনাথান ডানকান (১৭৫৬-১৮১৯) ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়ন রূপে কলকাতায় আসেন। পরে তিনি বারাণসীর রেসিডেন্ট ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গভর্নর হন। ডানকান ফারসি জানতেন, বাংলাও ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত ইম্পে-কোডের বাংলা অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলাভাষায় মুদ্রিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। ডানকান ভাল সংস্কৃত জানতেন। জোনাথান ডানকান উপলব্ধি করেন যে এ দেশের বিচার ও আইন ঘটিত নিষ্পত্তির জন্য শুধু দেশীয় ভাষা নয়, সংস্কৃতের জ্ঞানও অতি প্রয়োজন।[৩১]

হেনরি পিটস ফর্স্টরি ঃ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম বিখ্যাত সিভিলিয়ন ছিলেন হেনরি পিটস ফর্স্টার (১৭৬১-১৮১৫)। ১৭৮৩ সনের আগস্ট মাসে তিনি কলকাতায় কাজে যোগদান করেন। ফর্স্টরি ত্রিপুরার কালেক্টর ও চব্বিশপরগণার দেওয়ানি আদালতের রেজিস্ট্রার হন। ১৮০৩ সনে তিনি কলকাতা টাকশালের দায়িত্ব নেন। ফর্স্টার কর্নওয়ালিস-কোড বাংলায় অনুবাদ করেন, কিন্তু অভিধানকার রূপেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর অভিধান 'A Vocabulary' দুই খণ্ডে রচিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ড (ইংরেজি-বাংলা) ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা-ইংরেজি) ১৮০২ সনে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং একটি ক্ষুদ্র সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করেন।[৩২] তাঁর অভিধানের ভূমিকা থেকে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর অভিধানে ইংরেজির প্রতিশব্দরূপে অনেক তৎসম শব্দ সংকলিত হয়েছে। তিনি মনে করতেন সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলাভাষার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ডানকান এবং ফর্স্টার দুজনেই শাসনকার্যের সর্ববিভাগে বাংলাভাষা ব্যবহারের সুপারিশ করেছিলেন।[৩৩] তাঁরা দুজনেই বাংলা আইনের ভাষা এবং সামগ্রিক ভাবে বাংলা ভাষা থেকে আরবি ফারসি শব্দ যথাসম্ভব বর্জন এবং তৎসম শব্দ ব্যবহার করে বাংলাভাষাকে সংস্কৃতগন্ধী করতে চেয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন এবং সংস্কৃতের প্রসার কামনা করতেন। এই সব সংস্কৃত অনুধ্যায়ীদের মধ্যে উইলিয়ম জোন্স, চালর্স উইলকিন্স, হেনরি টমাস কোলব্রুক প্রমুখ মনীষীরা সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডারে আকৃষ্ট হয়ে সংস্কৃত-প্রেমিক হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা ভারততত্ত্ববিদ্ উপাধিতে সম্মানিত হন।

ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তবু তাঁদের সংস্কৃত ও বাংলাভাষা

প্রীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসন কার্যের সুপরিচালনা এবং ব্রিটিস শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী করা। তাঁরা জানতেন ব্রিটিস শাসনকে দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল করতে হলে দেশীয় ভাষায় আইন প্রণয়ন প্রয়োজন, তাঁরা আরও মনে করতেন যেসমস্ত আইন যুগ পরম্পরায় ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, সেগুলি তাঁদের জানা আবশ্যক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলিকে প্রচলিতরাখাও প্রয়োজন এবং এইসব কর্মকাণ্ডকে সফল করতে হলে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য।

সুতরাং উইলিয়ম কেরী যখন কলকাতায় এলেন তখন সংস্কৃত-চর্চার একটি পরিবেশ সেখানে ছিল এবং বেশকিছু বিদেশী ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম ছিলেন এবং সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবশত তাঁরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে ও প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। Dharmpal, প্রাগুক্ত P-8

২। তদেব, P-9

৩। সজনীকান্তদাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা ১৯৮৮। (দে'জ সংস্করণ) পৃ-৪০

৪। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (পঞ্চম খণ্ড) কলকাতা-১৯৮৫। পৃ-২০৯

৪ক। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তরে উইলিয়ম কেরী লিখেছেন যে তিনি Holwell বা Dow এর বই দেখেননি, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকেই প্রমাণিক বলা যেতে পারে। ডঃরাইল্যান্ডকে এক চিঠিতে তিনি জানান যে Dowএর হিন্দুস্থানের ইতিহাসে চতুর্বেদের নামগুলি সঠিক ভাবে লিখিত হয়নি, কেরী বেদগুলির সঠিক উচ্চারণ সম্বন্ধে রাইল্যান্ডকে লেখেন। (Periodical Accounts, প্রাগুক্ত, P.355).

৫। সেকালে অশিক্ষিত বাদীপ্রতিবাদীর কোন মামলার বিবরণ বাংলাভাষায় লিপিবিদ্ধ করে ফারসি ভাষায় তর্জমা করে এবং তৎপরে ইংরেজি ভাষায় তর্জমা করে আদালতে বিচারকের কাছে পেশ করতে হত। আবার বিচারকের রায় বিপরীত ক্রমে ইংরেজি থেকে ফারসি ও ফারসি থেকে বাংলায় তর্জমা হয়ে বাদীপ্রতিবাদীদের কাছে পৌঁছত; এ যেন 'সাত নকলে আসল খাস্তা'। আসল ব্যাপারটি চাপা পড়ে যেত অথবা অন্য আকার ধারণ করত। ফর্স্টার সাহেব আদালতের ভাষা বিভ্রাটের একটি কৌতুককর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য সজনীকান্ত দাসের প্রাগুক্ত গ্রন্থ)।

৬। সজীকান্তদাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯-৬০

৬ক। Kopf, David, প্রাগুক্ত, pp-17-18

৭। সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৬১

৮। Halhed. N.B., A Grammar of Bengal Language, Hoogly. 1778 Introducation, p-9

৯। মনোএল-দ্য-আপসুম্পাসাঁও রোমান ক্যাথলিক অগাস্তানীয় শাখার যাজক ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের নাগোরি গ্রামের গির্জার মঠাধ্যক্ষ। তাঁর Vocabulurio em idioma Bangalla e Portuguez vividido em duas parts" গ্রন্থটি দুটি খন্ডে লেখা বাংলা পোর্তুগীজ এবং পোর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ। এই শব্দকোষের সঙ্গে একটি অতিক্ষুদ্র বাংলা ব্যাকরণও বাধাঁই করা ছিল এইটি পোর্তুগীজ ভাষায় রোমান অক্ষরে লেখা বাংলা ব্যাকরণ। গ্রন্থটি ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগর থেকে প্রকাশিত হয়। এটিই বিদেশী ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।

১০। Halhed N.B প্রাগুক্ত, Preface III

১১। তদেব, Preface VII

১২। তদেব, Preface IX-XI

১৩। তদেব, Preface XI-XX

১৪। তদেব, Preface XXI

১৫। তদেব , Preface III

১৬। সংস্কৃত থেকেই বাংলাভাষার সরাসরি উদ্ভব, হ্যালহেডের এই ধারণা সঠিক নয়। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত অপভ্রংশ ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব। তবু হ্যালহেড ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। য়ুরোপে হয়তো কেউ কেউ তাঁর আগে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, কিন্তু হ্যালহেডই প্রথম ইংলন্ডবাসী যিনি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করেছেন।

১৭। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে হ্যালহেডের অনূদিত মহাভারতের সুবিশাল পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

১৮। নিখিল সরকার লিখিত হ্যালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। আনন্দ পাবিলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কৃত পুনর্মুদ্রণ -১৯৮০ p-19

১৯। ইন্দ্র এখানে প্রাচীন বৈয়াকরণ ইন্দ্র। 'ইন্দ্রাদয়োপি' বানানটি অশুদ্ধ। শ্লোকটি অনুভূতি স্বরূপাচার্যের সারস্বত প্রক্রিয়ায় আছে। গুরুপদ হালদার, সংস্কৃত ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, কলকাতা ১৩৫০, পৃ-৪৯১, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সারস্বত ব্যাকরণের পঠন পাঠন জনপ্রিয় ছিল। মুসলমান শাসনকর্তারা সারস্বত ব্যাকরণের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।Belvalkar. S.K, Systems of Sanskrit Grammar. Amritsar 1980, p-70

২০। ফিরিঙ্গি শব্দ সেকালে য়ুরোপীয়দের প্রতি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য ছিল। পোর্তুগীজ বংশোদ্ভূত বিখ্যাত কবিয়াল এন্টনি 'ফিরিঙ্গি' নামে অভিহিত ছিলেন।

২১। Halhed. N.B , প্রাগুক্ত , Preface XXIV

২২। উইলিয়ম ক্যাক্সটন ইংলন্ডে প্রথম ছাপাখানা চালু করেন। লন্ডনে তিনি যে ছাপাখানা স্থাপন

করেন সেখান থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হয় Dictes and Sayings of the Phylosophers.

২৩। সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৪।

২৪। Dictionary of National Biography, Vol XXI

২৫। বিশ্বকোষ (একাদশ খণ্ড), লোকশিক্ষা প্রকাশন, কলকাতা-১৯৮১

২৬। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৫

২৭। উইলিয়ম ওয়ার্ডের দিনপঞ্জী। পিরিওডিকাল এ্যাকাউন্টসে উদ্ধৃত।

২৮। এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত "On the Duties of a faithful Hindoo Widow" ইত্যাদি প্রবন্ধ। কোলব্রুক, উইলিয়ম কেরী প্রমুখ বিদেশীরা যখন সতীদাহের বিরুদ্ধতা করছেন, তখন সতীদাহ সম্পর্কে যুবক রামমোহন নীরব ছিলেন।

২৯। কোলব্রুকের "On the Religious Cerimonies of the Hindus" প্রবন্ধ। Miscellaneous Essays গ্রন্থে সংগৃহীত।
Kopf, David, প্রাগুক্ত, p-41

৩০। উক্তিটি ডেভিড কফ তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে কোলব্রুকের Miscellaneous Essays থেকে উদ্ধৃত করেছেন। p-39

৩১। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৫

৩২। De. Sushil Kumar, History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, Calcutta, 1919, p-90

৩৩। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৫।

তৃতীয় অধ্যায়

উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃতশিক্ষা ও সংস্কৃতপ্রীতি

ভাষাশিক্ষার প্রতি উইলিয়ম কেরীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। অল্পবয়সেই তিনি গ্রিক ও ল্যাটিনভাষা আয়ত্ত করেন। অল্পবয়সে যখন তিনি জুতোর কারখানায় কাজ করতেন তখন মাঝে মাঝেই দোকানের মালিক টমাস ওল্ডের সঙ্গে তাঁর ধর্মবিষয়ক তত্ত্বালোচনা হত এবং সেই আলোচনা তর্কে পরিণত হত। তর্কে জয়লাভ করার অদম্য ইচ্ছায় গ্রিক, হিব্রু প্রভৃতি প্রাচীনভাষায় রচিত বাইবেল পাঠের প্রতি তিনি আগ্রহী হন এবং সেইসব ভাষায় যথেষ্ঠ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার আগে মাত্র বারো বৎসর বয়সেই তিনি ল্যাটিন ভাষা শেখেন এবং ল্যাটিন শব্দকোষ মুখস্থ করেন।[১] এইভাবে ভাষাশিক্ষার প্রতি কেরীর প্রবণতা জন্মায় এবং অল্পসময়েই যে কোন ভাষা আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে সহজ সাধ্য হয়। প্রিন্সেস মারিয়া জাহাজেই তিনি ডাঃ টমাসের কাছে বাংলাভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। ডাঃ টমাসের বঙ্গদেশের মানুষ ও বাংলাভাষা সম্পর্কে সাধারণজ্ঞান ছিল।[২]

বঙ্গদেশে আগমনের পর অনিশ্চিত জীবিকায় ও দুঃখকষ্টের মধ্যেও মুনসি রামরাম বসুর কাছে কেরীর ভাষাশিক্ষা অক্লান্ত ভাবে চলতে থাকে। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে যখন কেরী মদনাবাটিতে নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক তখন তাঁর সংস্কৃতভাষাশিক্ষাও শুরু হয়। ইংলণ্ডের Baptist Missionary Societyও বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট গিলসবরোতে অনুষ্ঠিত সোসাইটির সভায় বঙ্গদেশে প্রেরিত মিশনারিদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

"As it will be necessary for sometime, that they should have assistance of some natives in order to enable them to learn the Sanscrit and Bengalee languages, the sum of £20 per annum be allowed to each, towards the discharge of extra-expenses".[৩]

ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির ১৭৯৫ সনের ১৮ই জানুয়ারি একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে তাঁদের যাজক ভ্রাতা উইলিয়ম কেরী মহাভারতের কয়েকপাতা অনুবাদ পাঠিয়েছেন।[৪] ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর কেরী একটি চিঠিতে লিখেছেন যে

তিনি মহাভারতের কয়েকপাতা অনুবাদ করেছেন—"I have been trying to compose a compendious grammar of the language, which I send to you, together with a few pages of the Mahabharat, with a translation which wrote out for my own exercise in Bengalee"[৫]

১৭৯৫ সনেই কেরী মহাভারতের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেন, অবশ্য তাঁর নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে তাঁর সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের আগেই আরম্ভ হয়। যে ব্যাকরণের উল্লেখ কেরী করেছেন সেটি অবশ্যই বাংলা ব্যাকরণ।

কেরীর জীবনীকার S.P. Carey লিখেছেন—"From his second Mudnabati year Carey gave a third of his long working day to this language, which Ram Ram Basu extolled as almost divine"[৬] এই প্রসঙ্গে S.P. Carey কাব্যিক ভাষায় সংস্কৃত ভাষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আর পাঁচজন ভারতীয় হিন্দুর মতো রামরাম বসুও যে সংস্কৃতকে দেবভাষা মনে করতেন তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সুতরাং উত্তরবঙ্গে জীবিকার ও বসবাসের মোটামুটি স্থায়ী সংস্থান হওয়ায় কেরীর ভাষাশিক্ষাও পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়। সজনীকান্ত দাস বলেছেন "১৭৯৫ সন হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।" কিন্তু ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দেই তিনি মহাভারতের কয়েকপাতা অনুবাদ করেন। ১৭৯৫ সনেই মিঃ ফুলারকে একটি পত্রে কেরী লিখেছেন স্থানীয় ব্যক্তিরা পাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমনকি তারা ধর্মগ্রন্থ ও ব্যাকরণের পার্থক্য সম্বন্ধেও সচেতন নয়।[৭] কেরী অন্তত ব্যাকরণ ও ধর্মগ্রন্থের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষা কিছুটা অগ্রসর না হলে, সে সচেতনতা আসে না। ঐ চিঠিতেই কেরী আরও লিখেছেন—"The writing esteemed sacred by the Hindoos of two kinds the Bedas or the original scripts and the Shastras or the commentaries of the Beda"[৮] অর্থাৎ ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দেই কেরী জানতেন যে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থই বেদের ব্যাখ্যা, এই মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর ধারণা তখনও স্বচ্ছ নয়, কিন্তু সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে।

সজনীকান্ত দাস আরও বলেছেন—"তিনি কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোলকনাথ শর্মা নামক দুইজন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত শিখিতে থাকেন।"[৯] কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোন উৎস নির্দেশ করেননি। ১৭৯৬ সনের ১৭ই জুন একটি পত্রে কেরী লিখেছেন—"I have a young Pundit with me who I hope will be proved useful".[১০]

১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জন ফাউন্টেন[১০ক] কেরীকে পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃতশিক্ষায় রত দেখেন। তিনি লিখেছেন—"Brother Carey most kindly received me when I entered, his Pundit stood by him teaching him Shanscrit."[১১]

১৭৯৬ সনের ১লা নভেম্বর মিঃ মুলারকে লিখিত একটি পত্রে কেরীও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[১২] উভয়ের কেউই পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেননি। অবশ্য ফাউন্টেনের পক্ষে সেই মুহূর্তে সংস্কৃত-শিক্ষকের নাম জানা সম্ভব ছিলনা।

১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কেরী খুব সম্ভবত পুরাণ পাঠ আরম্ভ করেন। হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থে বিধৃত অতিকথাগুলির অবাস্তবতা সম্বন্ধে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর বিদ্বিষ্ট মনোভাবও অপ্রকাশিত থাকেনি—"I shall now and then note some parts of their Mythology as I find represented in their Shastras, which I have now begun to read, and which fill me with astonishment when I think they are seriously believed by any rational creature."[১৩] এই সময়েই কেরী গীতার ও মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদের সন্ধান পান। চতুর্বেদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও কিছুটা পরিণত হয়। মিঃ রাইল্যাণ্ডকে একটি চিঠিতে তিনি জানান যে পিরিওডিক্যাল একাউন্টসে Dow-এর হিন্দুস্থানের ইতিহাস থেকে বেদের যে নামগুলি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি সঠিক নয়, "Their real names are Reek, Jozoo, Sam, Atharpa."[১৪] কিন্তু কেরীও যে সংস্কৃত নামের লিপ্যন্তরে অভ্যস্ত হননি, তা তাঁর প্রদত্ত নাম থেকেই স্বপ্রকাশ।

১৭৯৬ সন নাগাদ কেরী হিন্দুশাস্ত্র সমূহের অন্তর্নিহিত সত্যকে নিজেই জানার চেষ্টা করেছেন।[১৫] ১৭৯৬ সনের ডিসেম্বর মাসেও আমরা কেরীকে সংস্কৃতশিক্ষায় নিবিষ্ট দেখি। লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটিকে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখছেন, যাতে নিজেই হিন্দুধর্মশাস্ত্রগুলি পড়তে পারেন।[১৬]

১৭৯৭ সনে কেরী সংস্কৃত ভাষায় কিছুটা পারদর্শিতা লাভ করেছেন, কেননা তখন তিনি সংস্কৃত ও হিব্রুভাষার তুলনামূলক আলোচনায় সক্ষম। তিনি লক্ষ্য করেছেন—"There is however a total difference between the 'Shanscrit language and the Hebrew, though many words in common use seem derived from the Hebrew. Yet it is remarkable that very few Shanscrit words have any affinity to it."[১৭]

এই সময়ের মধ্যে কেরীর সংস্কৃতশিক্ষার বেশ অগ্রগতি ঘটেছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণের 'জাতি' বা 'সামান্য' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"Thus in the Shanscrit Grammar, called Beeakarana, Jati signifies a species or kind which may be distinguished by its outward appearence from every other kind."[১৮]

অবশ্য খ্রিস্টান ধর্মযাজকসুলভ মানসিকতায় তিনি কূট প্রশ্ন তুলেছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, দৈবজ্ঞ (Dybyggy) প্রভৃতি, যারা সকলেই পৈতা ধারণ করে তাদের জাতিত্ববিচার কিভাবে হবে, অথবা ভগবানেরই জাতি কিভাবে নির্ণীত হবে? অবশ্য পরবর্তীকালে কেরীর এই বিদ্বিষ্ট মনোভাব হ্রাস পায় এবং সংস্কৃত সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়।

কেরীর সংস্কৃতজ্ঞান ক্রমেই পরিপক্কতা লাভ করছিল। কোন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ অনুসারে সঠিক বানান লেখা উচিত। স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিরা এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় সংস্কৃতশব্দের যে বানান ব্যবহার করেন তাই সঠিক এবং তিনিও সংস্কৃত ও বাংলা শব্দের লিপ্যন্তরকরণে জোন্স প্রমুখকেই অনুসরণ করবেন। কেরী মনে করতেন পুরাণ ও বিভিন্নশাস্ত্র সম্বন্ধে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিই বহুলাংশে প্রামাণিক। কেরী মনে করতেন হিন্দু-অবতারবাদ, বহুসংখ্যক দেবতা এবং এক এক জন দেবতার বহুসংখ্যক নাম খুবই বিভ্রান্তিকর। তিনি শিবের শম্ভু, ঈশ, পশুপতি, শূলী প্রভৃতি আটচল্লিশটি নামের উল্লেখ করেছেন। কোন প্রামাণ্য অভিধান থেকে কেরী নাকি নিজের হাতে এই প্রতিশব্দগুলি টুকে রেখেছিলেন।[১৯]

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মিঃ সাটক্লিফকে এক চিঠিতে কেরী লেখেন—"Having just reading a Shanscrit book called Soordhe Sangrha, which is a collection of laws from various Shastras arranged under their proper heads, I shall give you an extract from it." এই চিঠিতে হিন্দুশাস্ত্রে সহমরণ সম্পর্কে কি বিধান আছে কেরী তা সাটক্লিফকে জানান। তিনি ঋকবেদ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপরাণ এবং অঙ্গিরা, গৌতম, প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত বিভিন্ন অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সংস্কৃতভাষায় যে তাঁর অধিকার জন্মেছে এবং তিনি যে শিক্ষকের সহায়তা ব্যতিরেকেই হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে প্রবেশে সক্ষম এই চিঠিতে তা স্বপ্রকাশ। তিনি বিনয় সহকারে লিখেছেন—"I am just beginning however to see for myself by reading the original Shastras" [২০] এই সময়েই তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা ও অভিধান সংকলন প্রায় সমাপ্তির পথে—"To accomplish thus I have nearly translated the Sanskrit grammar and dictionary into English and have made a considerable progress in compiling a dictionary of Sanskrit including Bengali and English."[২১]

অবশ্য ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে কেরীর যে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় তা কোন সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবাদ নয়, কেরীর স্বাধীন রচনা। একটি বাংলা-ইংরেজি অভিধান পরে প্রকাশিত হলেও সেই অভিধানে সংস্কৃতভাষা অন্তর্ভূক্ত হয়নি, যদিও সেই অভিধানের

সঙ্গে সংস্কৃতের যোগ ছিল সুনিবিড়। বস্তুত কেরী নিজের প্রয়োজনেই ব্যাকরণ রচনা ও অভিধান সংকলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সত্য সত্যই তিনি নিজেকে আরও প্রস্তুত আরও সংস্কৃতজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন। আর সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁর পরিশ্রমের বিরাম ছিল না। উত্তরবঙ্গে একটি নির্দ্দিষ্ট জীবিকা ও স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার জন্য কঠিন পরিশ্রম শুরু হয়।

কিন্তু মূল শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে অনুবাদের সামর্থ অর্জন করলেও কেরীর সংস্কৃতশিক্ষা তখনও সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। সংস্কৃতভাষাকে তিনি বলেছিলেন পৃথিবীর কঠিনতম ভাষা। ১৭৯৮ সনের জানুয়ারি মাসেও তিনি মিঃ সাটক্লিফকে বলেছেন—"Besides my ordinary labours I am learning Shanskrit language which......is perhaps the hardest language in the world."[২২]

কেরীর জীবনীকার স্মিথ লিখেছেন—"For seven years, since his first settlement in Dinajpur district, Carey had given one third of his long-working day to the study of Sanskrit."[২৩]

কিন্তু কেরীর সংস্কৃতশিক্ষা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলাভাষার শিক্ষকরূপে যোগদানের পর তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সংস্পর্শে আসেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাহায্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষার গভীরে প্রবেশ করেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রস্থানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ও দর্শনের বিভিন্ন দিক, তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও সত্য তাঁর কাছে নতুনরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়; তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে। স্মিথ বলেছেন—"By September 1804 Carey had completed the first three years' course of collegiate training in Sanskrit."[২৪]

কিন্তু সমস্ত কাজেরই থাকে নেপথ্য প্রস্তুতি পর্ব। কেরীর সংস্কৃতশিক্ষার নেপথ্য প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল ভারতে পদার্পণের আগেই। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়ায় অবস্থান কালেই কেরী জানতেন নবদ্বীপ সংস্কৃতশিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র এবং সংস্কৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে কাশী, পুনা বা কাঞ্চিপুরম্ নগরের প্রতিস্পর্ধী। তিনি মনে করেছিলেন নবদ্বীপের অধিবাসী পরমপণ্ডিত অথচ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই 'হিদেন'দের জয় করতে পারলেই দেশের অবশিষ্টাংশে খ্রিস্টধর্ম্মের জয়যাত্রা সুগম হবে। তিনি নবদ্বীপে বসবাসের বিষয় চিন্তাও করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

সুতরাং সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার আগেই সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে হিন্দু ধর্মশ্রাস্ত্রগুলির সম্পর্ক এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উপর এই ভাষার প্রভাব সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাধনরূপে যে ভাষা তিনি শিখতে শুরু করেছিলেন সেই ভাষার সঙ্গে পরে তাঁর প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

কেরীর সংস্কৃতপ্রীতি ঃ সংস্কৃত ভাষণ ঃ

সংস্কৃতভাষার সঙ্গে কেরীর সম্পর্ক যতই নিবিড় হতে থাকে, ততই তিনি এইভাষার মাধুর্য ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর সংস্কৃতপ্রীতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রদত্ত ভাষণে পরিলক্ষিত হয়। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বার্ষিক Public-Disputation উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।[২৫] এই সভায় বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বহুবিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক ও শিক্ষকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, কলেজের সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যগণ, সেনাবিভাগের পদস্থ অফিসারগণ, বহু দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং বাগদাদের রাষ্ট্রদূত Solymon-Aga.[২৬] সংস্কৃতবিভাগের শিক্ষকরূপে এই Public Disputation- এ সংস্কৃতবিভাগের সঞ্চালক ছিলেন উইলিয়ম কেরী। কেরী তাঁর ভাষণটি সংস্কৃতে রচনা করেন অবশ্য ভাষণের ইংরেজি অনুবাদও পরিবেষিত হয়।

ভাষণের প্রথমেই কেরী জানিয়েছেন যে সঞ্চালকরূপে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ একটি চিরাচরিত রীতি, তাই উপস্থিত সুধীবৃন্দকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—"হে মহাশয়, যঃ শিষ্যো যস্যাং ভাষায়াং বাক্যানি কথয়ামাস তস্য ভাষা তদ্ভাষানৈপুণ্যং যৎ পর্য্যন্তং সভায়াং তদ্ভাষাচার্যস্য তদ্বিষয়কাত্মমনোবিচারঃ কথং প্রকটিতৈদ্বাদানুবাদ-স্যৈকাব্যবস্থাসীৎ"।[২৭]

ঐ সভায় মান্যতম অতিথি তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি মহোদয়কে সম্বোধন করে কেরী বলেছেন— "হে সর্ব্বাধ্যক্ষ,

তব প্রসাদাৎ যা ভাষা প্রথমতোঽব্যস্থাভূৎ তয়াভাষয়া কৃতজ্ঞোভূত্বা প্রথমতঃ তদনুগ্রহস্বীকরণং তব প্রশংসাকরণাশ্চ কর্ত্তব্যম্।

যেয়ং প্রাচীনভাষা কুমারিকাখণ্ডীয়পূর্ব্বকালীনসর্ব্বাধ্যক্ষান্ প্রতি আত্মপ্রকাশং কর্ত্তুমসম্মতাসীৎ সেয়ং ভাষা তবাজ্ঞয়া স্বকীয়সকলভাণ্ডারদ্বারং মুক্ত্বা অতিপূর্ব্বকালীন-বিবরণবিধিবিদ্যাভিঃ পৃথ্বীং ধনবতীং করোতি'।

কেরী এখানে লর্ড ওয়েলেসলির স্তুতি করেছেন, যিনি সর্বদাই সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের প্রসার কামনায় সদয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কেরীর ভাষা এখানে সমাস-বহুল, একটি সমাসোক্তি অলঙ্কার ব্যবহার করে ভাষাকে সাহিত্য গুণান্বিত করার চেষ্টাও করেছেন। এই ভাষণে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যসম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা প্রসঙ্গে

কেরী সংস্কৃতের স্তুতি ও প্রশংসা করে বলেছেন—"পর্য্যায়েন শৈষিকী কাঠিন্যেন প্রাথমিকী এতাসাং সর্ব্বাসাং ভাষানাং জননী প্রাচীনা সংস্কৃতভাষা স্নেহময়ীমাতেব স্বীয়গর্ভজাতসন্ততীঃ স্বীকর্ত্তুং তথা তাসাং পরস্পর কুটুম্বতামেকগোষ্ঠিতাঞ্চ দৃঢ়ীকর্ত্তুং এবং তয়া অস্মাকং পূর্ব্বদেশীয়বিদ্যাভ্যাসস্য সর্ব্বথা পূরয়িতুং প্রকাশং প্রাপ্নোতি।"[২৮] প্রথম শিক্ষার্থীর নিকট অত্যন্ত কঠিনরূপে প্রতিভাত হলেও এই সংস্কৃতভাষা ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার জননী। পরম স্নেহময়ী জননী যেমন নিজের গর্ভজাত সন্তানদের এক গোষ্ঠীবন্ধনে আবদ্ধ করেন তেমনই সংস্কৃতভাষা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে আমাদের পূর্বদেশীয় বিদ্যাভ্যাসকে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

বিভিন্ন ভাষার আকররূপে সংস্কৃতভাষার উপযোগিতা স্বয়ংপ্রকাশ। কিন্তু ভারতবর্ষের পূজাপদ্ধতি, দণ্ডনীতি, কলাবিদ্যা প্রভৃতির আধারস্বরূপা এই ভাষার মর্য্যাদা ও উপযোগিতা অনেক বেশি—"সংস্কৃতভাষায়াং চলিতভাষানামাকরংশ্চেতি বোধ্যায়াং কৃতায়াং তস্য উপযোগিত্বং জ্ঞেয়ং ভবেৎ। কিন্তু কুমারিকাখণ্ডীয়লোকানাং ঈশ্বর-পূজাবিধান-দণ্ডনীতি-কলাবিদ্যানাং আধাররূপায়াং তস্যাং ভাষায়াং মান্যানাং সত্যাং তস্যোপযোগিতা গৌরবাধিক্যং ভবতি।"[২৯]

সংস্কৃতভাষার প্রশংসায় কেরী আরও বলেছেন—সংস্কৃতভাষা যেন কাঁটার বেড়া দেওয়া পত্রপুষ্পফলশোভিত এক সুন্দর অরণ্য, যেখানে প্রবেশাধিকার সীমিত, কিন্তু জোন্স, উইলকিন্স প্রমুখ পণ্ডিতরা সেখানে প্রবেশ করেছেন—"অতিসুন্দরপত্র সতেজস্কপুষ্পসুস্বাদু ফলময়্যন্তবড্রা (?) কাপ্যটবীব সংস্কৃতবিদ্যাংস্তে কিন্তু অনতিক্রম-কন্টময়ৈব মহারণ্যং তদটবীস্থপুষ্পাদিকচয়িতুং কামান্ জনান্ তন্মধ্যে প্রবেষ্টুং ন্যষেধীতিতি ব্রাহ্মণা কথয়ন্তি।

কিন্তু জোঞ্জবিল্কিঞ্জাদয়ঃ কিয়ন্তঃ পণ্ডিতাঃ তদ্বাধাবরণং স্থানে স্থানে বভঞ্জুঃ তদনন্তরং ফোর্টউইলিয়ামবিদ্যালয়েন তন্মধ্যে প্রবেশায় পন্থাঃ কৃতোঽস্তি।"[৩০]

কেরীর সমগ্রভাষণটি বেশ দীর্ঘ, তার কথঞ্চিৎ নমুনা এখানে প্রদত্ত হল। এই ভাষণের ভাষা দীর্ঘসমাসকন্টকিত এবং অত্যন্ত আড়ষ্ট। সংস্কৃতভাষার সাবলীল মাধুর্য এই ভাষণে কিছুমাত্র প্রকাশিত হয়নি। ইংরেজিভাষার মননই যে সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে খুব স্পষ্টভাবেই তা অনুভব করা যায়। তবু এই ভাষণে অধ্যাপক কেরীর প্রাণের আবেগ এবং সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি তাঁর অনুরাগ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ কেরীর সংস্কৃত ভাষণের একটি উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়েছেন—"But the question, if ever since the marble hall of the Governor General's palace has witnessed a sight more profoundly significant than that of William Carey addressing the Marquis of Wellesly in Sanskrit, and in the presence of the future Duke of Wellington......"[৩১]

পত্রাদিতে প্রকাশিত সংস্কৃতপ্রীতি ঃ

এই ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় এবং নানা ব্যক্তিকে লিখিত পত্রাদিতে সংস্কৃতভাষার প্রতি কেরীর অনুরাগ স্বতোৎসারিত। বঙ্গদেশে পদার্পণের পর যখন কেরী ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছেন, তাঁর জীবিকা ও বাসস্থানের কোনও স্থিরতা নেই তখনও তিনি সংস্কৃত মুগ্ধতায় মগ্ন। ১৭৯৪ সনের পয়লা জানুয়ারি তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তিনি সংস্কৃত শেখাতে ইচ্ছুক—"I am fully intended to devote my eldest son to the study of Shanskrit." [৩২]

১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে লেখা একটি চিঠিতে কেরী মহাভারতের প্রশংসা করেছেন; সেই সময় তিনি মহাভারত পাঠে নিরত ছিলেন। তিনি লিখেছেন—"I have read considerable part of the Mahabharata, an epic poem written in most beautiful language and much on a par with Homer. And were it, like Homer's 'Iliad' only considered as a great work of human genius, I should think it one of the finest production in the world" [৩৩] মহাভারত কেরীকে এমনভাবে মুগ্ধ করে যে তিনি মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেন। এ সম্পর্কে ব্যাপটিস্ট মিশনের পিরিয়ডিক্যাল একাউন্টস থেকে জানা যায়—"Mr. Carey having suggested in a former letter, that in reading the famous Hindoo poem called, the Mahabharata, written in Shanskrit, he had met with a passage which rendered it probable that Joodistheer of the Hindoo's was contemporary of Saul, king of Israel"[৩৪] কেরী এ বিষয়ে দীর্ঘ যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

কেরীর জীবনীকার S.P. Carey অপূর্ব ভাষায় কেরীর সংস্কৃতপ্রীতির উল্লেখ করেছেন। রামরাম বসু যে ভাষাকে দেবভাষা বলেছেন সেই ভাষা সম্পর্কে বলেছেন—"It was India's hallmark of culture, the franchise of her real aristrocracy, the tongue wherein her scriptures and classics were all enshrined; the speech which unlocked her very soul, the mother and queen of her many vernaculars. To conquer this was to lay open a dozen derivatives, to take this stronghold was to win a multifold domain."[৩৫]

বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা ঃ

বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকাতেও কেরী সংস্কৃত ভাষার প্রশস্তি করেছেন। যদিও এই গ্রন্থগুলি তাঁর সংস্কৃতশিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর রচিত, তবু তাঁর সংস্কৃতপ্রীতির নিদর্শন রূপে বিভিন্ন গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তিগুলি এখানে একত্রিত করা হয়েছে।

কেরীর A Grammar of Sungskrit Language গ্রন্থের ভূমিকা সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের প্রশস্তিতে মুখর। কেরী বারংবার বলেছেন সংস্কৃত বহু আধুনিক ভারতীয় ভাষার উৎস।

হিন্দুদের প্রাচীন পবিত্রশাস্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত এবং এই গ্রন্থগুলি সম্পর্কে ভারতীয়রা অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন। কেরী মনে করতেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চবর্ণের মানুষ সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করতেন এবং এইভাষার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।[৩৬] এই প্রাচীন জাতির ধর্ম এবং দর্শন, আচার-ব্যবহার অথবা উৎসবাদি সমস্তই সংস্কৃতভাষানির্ভর। সুতরাং কোন ব্যক্তি, তা তিনি দার্শনিক অথবা লোকহিতৈষী যাই হোন না কেন প্রাচীন ভারতবর্ষকে জানার জন্য সংস্কৃতজ্ঞান একান্ত অপেক্ষিত।[৩৭] সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকার একটিমাত্র অনুচ্ছেদে কেরী সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের পরিচয় দিয়েছেন।

সংস্কৃতভাষার আরেকটি বিশেষগুণও কেরী লক্ষ্য করেছিলেন। এই ভাষায় পদগুলিকে সহজেই সমাসবদ্ধ করা যায়[৩৮] এবং দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ অনেক সময়েই ভাষাকে সংহত এবং শ্রুতিমধুর করে।

কেরী আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে সংস্কৃতভাষা এতই ঐশ্বর্যপূর্ণ ও প্রকাশক্ষম এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক এত নিবিড় যে, যে কোন ভাষাতত্ত্ববিৎ সহজেই সংস্কৃতভাষার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।[৩৯]

বাংলা-ইংরেজি অভিধানের ভূমিকাতেও কেরী সংস্কৃতভাষার প্রশস্তি করেছেন এবং জানিয়েছেন সংস্কৃত এক সময়ে হয়তো সমগ্র উত্তরভারতের কথ্যভাষা ছিল— "It is probable that the Sungskrit language was formerly the current medium of conversation among the Hindoos, especially in the north of India, and that it was gradually corrupted by a manner of local causes."[৪০]

উত্তরভারতীয় ভাষাগুলি যে সংস্কৃতভাষা থেকেই উদ্ভূত এ সম্বন্ধে কেরী নিঃসন্দেহ ছিলেন এবং বারংবার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। অভিধানের ভূমিকাতেও তিনি বলেছেন—"It is certain that the present languages of India, especially those of northern provinces are almost wholly derived from Sungskrita, that dialect of Hindoosthanee excepted which is spoken by the higher Musalmans"[৪১]

নির্দেশিকা পুস্তিকা ঃ

কেবলমাত্র তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থেই কেরী সংস্কৃতের প্রশস্তি করেননি, শ্রীরামপুর কলেজ সম্পর্কিত নির্দেশিকা পুস্তিকাতেও তিনি সংস্কৃতভাষার প্রশংসা করেছেন এবং

দেশীয় খ্রিস্টান ছাত্রদের সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের বিষয়ে চিন্তা করেছেন।

কেরী মনে করতেন সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান ছাত্রদের মনন শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবে, ফলে য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা তাদের সহজসাধ্য হবে।[৪২]

কেরী বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারংবার বলেছেন—সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে, পুরাণে, মিথলজিতে প্রাচীনভারতের ইতিহাস ও ভৌগলিক সংস্থান বিধৃত হয়েছে, সেগুলি সযত্নে রক্ষা করা কর্তব্য।[৪৩]

এইসব দিনপঞ্জীতে চিঠিপত্রে, বিভিন্ন সময়ে লেখা গ্রন্থের ভূমিকায় কেরীর সংস্কৃতপ্রীতি স্বতোৎসারিত। গ্রন্থের ভূমিকাগুলি যদিও পরে লিখিত তবু তাঁর মনে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কি গভীর ভালবাসা সঞ্চিত ছিল ভূমিকাগুলি থেকে তা প্রতীয়মান হয়। সংস্কৃতশিক্ষা থেকে তাঁর সংস্কৃতপ্রীতির উদ্ভব, আবার সংস্কৃতপ্রীতিই তাঁকে গভীরভাবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করেছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যক্ষরূপে তিনি বহু সংস্কৃত পণ্ডিতের সাহচর্যে আসেন এবং তাঁর সংস্কৃতপ্রীতি আরও গভীর হয়। এইভাবে তাঁর সংস্কৃতপ্রীতি ও সংস্কৃতশিক্ষা হাত ধরাধরি করে পরস্পরের সহযোগী হয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

২। তদেব, পৃঃ ১২।

৩। Periodical Accounts, প্রাগুক্ত p. 53.

৪। তদেব, p. 189.

৫। তদেব, p. 223.

৬। সজনীকান্ত দাসের প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৮৭।

৭। Periodical Accounts, Vol. I. p. 129.

৮। তদেব, p. 129.

৯। সজনীকান্তদাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।
কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় নামে কোন শিক্ষকের নাম কেরী উল্লেখ করেননি। তবে কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক যুবক কেরীর কাছে নানা তত্ত্বালোচনার জন্য আসতেন, পরে তিনি জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র গমন করেন।
Periodical Accounts (Vol. I) p. 226 and 299.

১০। তদেব, p. 303.

১০ক। জন ফাউন্টেন একজন উৎসাহী খ্রিস্টান ধর্মযাজক।
উইলিয়ম কেরীকে ধর্মপ্রচারণার কাজে সাহায্য করার জন্য ব্যাপটিস্ট মিশন তাঁকে ভারতে

পাঠান। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেন এবং কেরীকে বাইবেলের বাংলা অনুবাদের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে আমাশা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

Periodical Accounts (Vol. I) pp. 84-85.

১১। তদেব, p. 311.

১২। ১৭৯৮ সনের জানুয়ারি মাসে কেরী তাঁর বাবাকে লিখেছেন—"A Brammhin to teach me the language" Periodical Accounts : p. 407.
ঐ বছরই ২৪শে সেপ্টেম্বর কেরী তাঁর জার্নালে লিখেছেন—".....spent the afternoon in reading one of the Shastra with my Pundit and learning Shanscrit." Periodical Accounts : p. 472. চিঠি বা জার্নাল কোনোটিতে পণ্ডিতের নাম উল্লিখিত হয়নি।

১৩। তদেব, p. 335.

১৫। মিঃ সাটক্লিফকে লেখা চিঠি, প্রাগুক্ত, p. 338.

১৬। লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনকে লেখা চিঠি, তদেব- p. 348.

১৭। কেরী জুলাই মাসে ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে এই পত্র লেখেন। Periodical Accounts, p. 377.

১৮। তদেব, p. 399.

১৯। Questions and Answers : Periodical Accounts : pp. 409-410.

২০। তদেব, p. 472-73.

২১। Smith George : Life of William Carey, London. (dt ?) p. 74.

২২। Periodical Accounts, p. 403.

২৩। Smith George, প্রাগুক্ত, p. 165.

২৪। তদেব, pp. 59-60.

২৫। Primitiae Orientales; Vol. II, Calcutta -1804, p. 101.

২৬। Smith George, প্রাগুক্ত p. 166.

২৭। "Sir, It being a rule of our Public Disputation that the moderator should express before the assembly, his opinion of the proficiency of the student in the language in which he has spoken...." কেরীর ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ। Primitiae Orientales, প্রাগুক্ত, p. 112.

২৮। "Last in order because first in difficulty appears the parent of all these dialects, the primitive Shanskrit, as if to acknowledge her legitimate offsprings confirm their affinity and relation to each other, and thereby complete our system of Oriental Study." তদেব, p. 113.

২৯। "Considered as the source of the colloquial tongues the utility of the Shanskrit Language is evident, but as containing numerous treaties on the religious, jurisprudence, arts and sciences of the Hindoos, its importance is yet greater...." তদেব, p. 113.

৩০। "Sanscrit Learning, say the Brahmanas, is like an extensive forest abounding

with a great variety of beautiful foliage, splendid blossoms, and delicious fruits but surrounded by a strong and thorny fence, which prevents those who are desirous of plucking its fruits and flowers, from entering in.
The learned Jones, Wilkins and others broke down this opposing fence in several places, but by the College of Fort William, a highway has been made into the midst of the wood." তদেব, p. 114.
উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেরীর ইংরেজি ভাষণটি সর্বাংশে সংস্কৃত ভাষণের অনুবাদ নয়, অনেকস্থলেই ভাবানুবাদ।

৩১। Smith George, প্রাগুক্ত, p. 166.

৩২। Periodical Accounts, প্রাগুক্ত, p. 68.

৩৩। তদেব, p. 336.

৩৪। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বরের রিপোর্টে বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। Periodical Accounts, প্রাগুক্ত, p. 523.

৩৫। Carey, S.P, William Carey, (8th ed) London 1934, p. 177.

৩৬। Carey, William, A Grammar of Sungskrita Language, Serampore, 1806. Preface III.

৩৭। তদেব, Preface I.

৩৮। তদেব, Preface II.

৩৯। তদেব, Preface IV.

৪০। Carey, William, A Dictionary of Bengalee Language, (Reprint) Delhi-1981. Preface III.

৪১। তদেব, Preface III.

৪২। ".......such a youth has enlarged his mind by digesting everything translated into his vernacular tongue, and invigorated his mental powers by study of Sungskrit."
College for the Instruction of Asiatic Christian and other youth in Eastern Literature and European Science, Serampore 1818, p. 2.

৪৩। তদেব, p. 5.

চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কৃতের সহায়কগ্রন্থ

(ক) কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ।

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই উইলিয়ম কেরী সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণ রচনার ব্যাপারে চিন্তা করেছিলেন। বস্তুত পক্ষে তিনি ১৭৯৭ সনের মাঝামাঝি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান রচনায় ব্রতী হন। কেরী তাঁর নিজের প্রয়োজনেই ব্যাকরণ রচনা ও অভিধান সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। তখনও তিনি উত্তরবঙ্গের মদনাবাটিতেই অবস্থান করছেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতবিভাগের শিক্ষকরূপে কর্মভার গ্রহণ করেননি। যাইহোক, ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।[১] তখন তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক[২] সুতরাং ছাত্রদের প্রয়োজনের বিষয়টিও তাঁকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছিল।[৩]

উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণগ্রন্থ A Grammar of Sungskrit Language-এর ভূমিকা থেকেই জানা যায় যে ছাত্রদের প্রয়োজনের ব্যাপারটি তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারা অনুসরণ করে কেরী তাঁর ব্যাকরণেও প্রথমে নিয়ম লিপিবদ্ধ করেছেন পরে উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় বিষয়টি আয়ত্ত করা হয়তো কিছুটা কঠিন হবে এবং ছাত্ররা কিছুটা অসুবিধা বোধ করবে, কিন্তু একবার পদ্ধতিটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলে ছাত্রদের শব্দভাণ্ডার পরিপুষ্ট হবে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাশিক্ষার ব্যাপারেও এই শব্দজ্ঞান ছাত্রদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে।—"Although this may be at first sight appear a disadvantage, the student who makes himself thoroughly acquainted with the different rules for forming derivative words, will be and amply compensated by a rich store of etymological knowledge, useful not only in the Sunguskrit but in all colloquial languages of India.[8]

পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তা ঃ

বস্তুতপক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিভিলিয়ন ছাত্রদের প্রয়োজনেই সংস্কৃত ব্যাকরণটি ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়। ভূমিকায় ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে কেরী আরও বলেছেন যে গ্রন্থটিতে বিভিন্ন নিয়মের বিশেষত ধাতুরূপের প্রচুর দৃষ্টান্ত সংযোজিত হয়েছে, এবং ছাত্রদের অসুবিধার কোন কারণ নেই।[৫]

'প্রত্যাহার' ও 'ইৎ' এই দুই পরিভাষা প্রসঙ্গে কেরী বলেছেন, যদিও প্রত্যাহার বিষয়টি জটিল এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, তবু পরিশ্রমী ছাত্র যদি একবার বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারে তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠ অনেক সহজ হয়।[৬] ভূমিকার এই সমস্ত উক্তি থেকে জানা যায় যে কেরী নিজের প্রয়োজনে ব্যাকরণটি রচনা শুরু করলেও পরবর্তী কালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিদেশী সিভিলিয়ন ছাত্রদের প্রয়োজনই প্রাধান্য পেয়েছে। কেরী নিজেই বলেছেন গ্রন্থটি এমন ভাবে রচিত হয়েছে যে ছাত্ররা গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।[৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে হিন্দু ষড়্‌দর্শন, অলঙ্‌কার ইত্যাদি শাস্ত্রের মতো ব্যাকরণ বিদ্যাও গুরুমুখী।

বিভিন্ন ব্যাকরণের সাহায্য ঃ

ব্যাকরণটির আখ্যাপত্রেই স্বীকৃত হয়েছে যে গ্রন্থটি রচনায় বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ব্যাকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।[৮] ভূমিকায় কেরী সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রস্থানের নামও উল্লেখ করেছেন "The writer of the following work has endeavoured to avail himself of all the helps he could procure, he is chiefly indebted to the writings of Vopa-deva, Kumudeshwara, Panini, Vikrama-dikshit, Doorgadas, Goee-chundra, whose works on Sunguskrita grammar are highly esteemed."[৯]

মূলগ্রন্থের মধ্যেও স্থানে স্থানে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় বোপদেবের মুগ্ধবোধ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাকরণের সাহায্য নিয়েছেন তার উল্লেখ করেছেন।

পরিভাষা ঃ

গ্রন্থের প্রথমেই অক্ষরের আলোচনা প্রসঙ্গে মুগ্ধবোধ ও কলাপ ব্যাকরণের উল্লেখ আছে—"a letter is called অক্ষর, a vowel অচ্ and a consonant হল্। In Mugduboodha a consonant is called হস্ and in Kalapa and a few other grammars ব্যঞ্জন"।[১০] কেরী 'বর্ণ' শব্দটি 'letter'-এর প্রতিরূপে ব্যবহার এখানে করেননি। ব্যাকরণের বিভিন্ন পরিভাষা বিভিন্ন প্রস্থানে বিভিন্নরূপে উপস্থাপিত

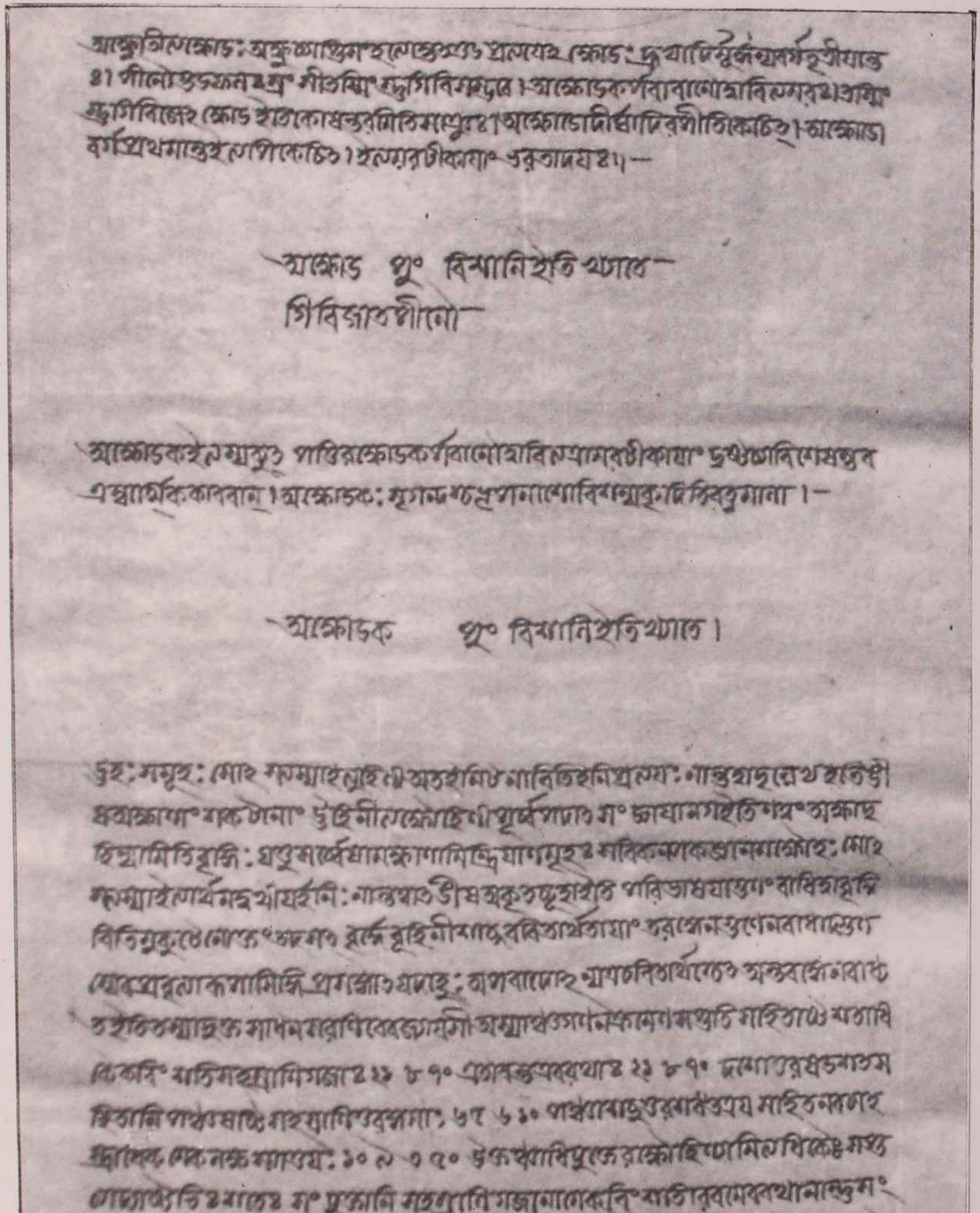

কেরীর অপ্রকাশিত সংস্কৃত অভিধানের পাড়ুলিপির একটি পৃষ্ঠা

হয়েছে। উইলিয়ম কেরী প্রসঙ্গক্রমে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষার উল্লেখ করেছেন, যেমন বোপদেব পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনের বিভক্তিকে, 'ঘি' এই পরিভাষায় উল্লেখ করেছেন। কুমুদেশ্বর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'সুট্' । কেরী বোপদেবের সংজ্ঞাই গ্রহণ করেছেন। শব্দের অন্ত্য স্বরবর্ণ অথবা অন্ত্যস্বরবর্ণের পরবর্তী ব্যঞ্জনকে বোপদেব 'টি' আখ্যা দিয়েছেন। 'উপধা' বা শব্দের অন্ত্যবর্ণের পূর্ববর্ণকে মুগ্ধবোধে 'উঙ্' আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং কুমুদেশ্বর বলেছেন 'উপান্ত'।[১১] অন্যত্র কেরী 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' ও 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের উল্লেখ করেছেন। ধাতুর বিভিন্ন কাল ও ভাব সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণে লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত হয়েছে; এই প্রসঙ্গে কেরী বলেছেন—"In the Siddhantu Kaumudi, the Sungkshiptasar and some other grammars they are called লট্, লোট্, লঙ্, লুঙ্, লিট্, লুট্, আশির্লিঙ্,* লৃট্, লৃঙ্"[১২] কেরী অবশ্য মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রদত্ত সংজ্ঞাকেই গ্রহণ করেছেন।[১৩]

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রভাব ঃ

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রতি কেরীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি পাণিনির 'প্রত্যাহার' সংজ্ঞার পরিবর্তে মুগ্ধবোধের 'সমাহার' সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন। সমাসের আলোচনায় কেরী মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকে অনুসরণ করে দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষাদি সমাসের ছয়প্রকার ভেদ দেখিয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের চতুষ্পাঠীগুলিতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পঠনপাঠনই প্রচলিত ছিল।[১৪] টোলের এই পঠনপাঠনের প্রভাব স্বভাবতই কেরীর ব্যাকরণে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতবিভাগের প্রধান-পণ্ডিত বহুশাস্ত্রবিদ্ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাহায্য পেয়েছিলেন।[১৫] মৃতুঞ্জয় তাঁর প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থে ব্যাকরণাংশের আলোচনায় সর্বাংশে পাণিনীয় ব্যাকরণকে অনুসরণ করেননি, অনেক স্থলেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উল্লেখ করেছেন।[১৬]

পুস্তকের পরিকল্পনা ঃ

আমরা আগেই বলেছি যে উইলিয়ম কেরী সংস্কৃত ব্যাকরণটি বিদেশী ছাত্রদের প্রয়োজনে রচনা করেছিলেন, সুতরাং গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটির রচনায় কেরী এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন যে গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকেই ছাত্ররা বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারে। গ্রন্থটিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রচুর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কেরী গ্রন্থটি ইংরেজি ব্যাকরণের ধাঁচে

* আশীর্লিঙ শব্দটি হয়তো মুদ্রণ প্রমাদে 'আশির্লিঙ্-এ পর্যবসিত হয়েছে।

রচনা করতে চেয়েছেন, যাতে ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীতই পুস্তকটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণের কিছু কিছু পরিভাষা তাঁকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হয়েছে। কারণ না করলে ব্যবস্থাটি মূলোচ্ছেদকারিণী হত, গ্রন্থটি আদৌ রচনা করা যেতনা। তবে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যাকরণশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত দর্শনের আলোচনা বর্জন করেছেন[১৭] কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাথমিক পাঠ দেওয়ার জন্য যে গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেখানে ব্যাকরণ-দর্শনের আলোচনা একান্ত নিষ্প্রয়োজন।

গ্রন্থটি রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কেরী জানিয়েছেন তিনি য়ুরোপীয় ও ভারতীয় পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, কোন কোন স্থলে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি—"The Hindoos include substantives, adjectives, pronouns, participles and indeclinable words under the general form Shubda. In their grammatical work the rules for declension of all these words are thrown together in one chapter. In this work the declension of substantives, adjectives (including participle) and pronouns are treated of separately, but rules of the Hindoo Grammarians retained. Instead of considering nouns at different declensions they distinguish them by final letters, and may hence be said to have as many declensions as there are letters in the alphabet. In the following work they are separated into six declentions, all those ending in a consonant being included in the sixth declenssion."[১৮]

সন্ধি ঃ

ভূমিকায় ধাতু সম্পর্কে কেরী বলেছেন যে সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি শব্দের মূল উৎস ধাতু। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করার পর তবেই সেগুলি বাক্যে ব্যবহার যোগ্য হয়।[১৯] ভূমিকায় সংস্কৃত ব্যাকরণে ইৎ, প্রত্যাহার,[২০] সন্ধি ও সমাসের বিশেষ স্থান সম্পর্কে আলেচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য সন্ধির জ্ঞান একান্ত আবশ্যক, সন্ধি সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃত গ্রন্থপাঠ দুঃসাধ্য—"The rules for Sundhi are placed before those for inflecsion of nouns, because they are indispensably necessary in the inflection of nouns and verbs. The application of the rules of Sundhi when words are joined may often dispensed with, yet they are so frequently

used by Hindoo writers that no one can read the language without being acquainted with them"[২১]

সমাস ঃ

কেরী অনুধাবন করেছেন, সমাস ব্যবহার সংস্কৃত ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি শব্দ একসঙ্গে মিলিত হয়ে একটি শব্দে পরিণত হয় অথচ প্রতিটি শব্দের অর্থই একক শব্দটিতে বিদ্যমান থাকে—"In writing this language these words are usually so connected that several of them united have appearance of being but one word. This arises of Juxtaposition merely without any change in the word themselves."[২২]

অধ্যায়বিন্যাস ঃ

ভূমিকায় কেরী বিষয়বস্তুর বিন্যাসপদ্ধতি সম্বন্ধেও জানিয়েছেন। গ্রন্থটি পাঁচটি 'Book' এ এবং Book গুলি chapterএ বিভক্ত। প্রথম Book বা প্রথম খণ্ডে অক্ষর, শব্দ ও সন্ধির আলোচনা। দ্বিতীয় খণ্ড তিনটি অধ্যায়ে (chapter) বিভক্ত। অধ্যায় তিনটিতে যথাক্রমে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম শব্দের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ছয়টি অধ্যায়, প্রথম অধ্যায়ে ধাতুরূপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ণিজন্ত ক্রিয়ার বিবরণ, তৃতীয় অধ্যায়ে সনন্ত ক্রিয়া, চতুর্থ অধ্যায়ে যঙন্ত ক্রিয়া, পঞ্চম অধ্যায়ে নামধাতু এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাধারণভাবে ধাতুর আলোচনা আছে। চতুর্থ খণ্ডে চারটি অধ্যায়ে যথাক্রমে কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিতপ্রত্যয়, সমাস ও লিঙ্গের আলোচনা। পঞ্চম খণ্ডের বিষয় বাক্যের গঠন। পরিশিষ্টে সংস্কৃত ধাতুর একটি দীর্ঘ তালিকা আছে এবং ছাত্রদের অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অনুচ্ছেদ উৎকলিত হয়েছে।

পুস্তকের যথার্থ আলোচনা শুরুর পূর্বেই কেরী দেবনাগরী লিপির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয় দিয়ে 'ক Ku' 'কৃ Kri' ইত্যাদি ক্রমে বর্ণ ও অক্ষরের উচ্চারণ এবং সেগুলির দেবনাগরী লেখ্যরূপ উপস্থাপিত হয়েছে, যেমন— ক (ku) থেকে ক্স (ksu) পর্যন্ত। তারপর খ (khu) থেকে খ্স (khsu), এই ভাবে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণগুলির উচ্চারণ ও তাদের দেবনাগরী লিপির পরিচয়।

প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উপস্থাপনা। 'ক্ষ' কে ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত করা হয়েছে। অবশ্য কেরী বলেছেন 'ক্ষ' স্বতন্ত্র বর্ণ নয়, ক কার এবং ষ কারের সংযোগ—"ক্ষ though in common alphabets occupying the place of true letter does not belong to alphabet but is a compound letter"[২৩] অনুস্বর ও বিসর্গ, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত হয়েছে। 'u' এই চিহ্নটি

হ্রস্ব অকারের প্রতিলিপি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কেরী নিজেই বলেছেন—"The u designed to express this letter and the short vowel inherent in the consonant, must always be pronounced short."[২৪]

প্রথম অধ্যায়ে ক প্রভৃতি ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরবর্ণের যোগ কি ভাবে হয় তা দেখান হয়েছে, যেমন—কা, কি, কী ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে বিভিন্নবর্ণের উচ্চারণ, লিপি, অন্যবর্ণের সংযোগে উচ্চারণের পার্থক্য ও তার বিশেষ লিপি ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। কেরী লক্ষ্য করেছেন সংস্কৃত ব্যাকরণে বর্ণগুলির বিন্যাস একটু বিচিত্র ধরণের, ঠিক অ. আ অথবা ক, খ ইত্যাদি ক্রমে নয়—

"The Hindoo Grammarians have adopted an artificial way of arranging the alphabet, for the purpose of expressing rules of grammar in a brief intelligible manner. It is as follows—

অ ই উ ঋ ৯	ক্ এ ঙ্ ঐ ঔ চ্
হ য ব র ল	ঞ ণ ন ঙ ম
ঝ ঢ ধ ঘ ড	জ ভ দ গ ব
খ ফ ছ ঠ থ	চ ট ত ক প্ শ ষ স"

বলাবাহুল্য এই বর্ণবিন্যাসের ক্রম মুগ্ধবোধ ব্যাকরণানুসারী।[২৫] পাণিনীয় ব্যাকরণে মাহেশ্বরসূত্রের বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে এই বর্ণবিন্যাসের কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেরী বলেছেন—"This arrangement is called সমাহার or collection. It is used thus : when any rule affects or is affected by a certain number of letters or instead of repeating them all only the first and last are mentioned, the intermediate ones are included in this series between those two letters. ইচ্ means all the vowels except অ" বস্তুত পাণিনীয় ব্যাকরণে যা প্রত্যাহার সংজ্ঞায় অভিহিত, এখানে তা সমাহার সংজ্ঞায় উল্লিখিত হয়েছে। মাহেশ্বর সূত্রের বর্ণবিন্যাস অর্থাৎ অ ই উ ণ্, ঋ ৯ ক্, এ ও ঙ্, ঐ ঔ চ্, হ য ব র ট্, ল ণ্ ইত্যাদিকে অনুসরণ করলে প্রত্যাহার রচনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়, কিন্তু কেরীর সমসাময়িক কালে মুগ্ধবোধব্যাকরণের পঠন পাঠনই সমধিক প্রচলিত ছিল।

প্রথম খণ্ডে র দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধাতু, প্রকৃতি, উপসর্গ, আগম, আদেশ প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ অর্থবহ শব্দগুলির বা পরিভাষার আলোচনা করা হয়ছে, পরে কেরী 'ইৎ' এর ব্যবহার ও তার প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোন অক্ষর ইৎ হওয়ার কী ফল তা উদাহরণ সহকারে দেখানো হয়েছে, যেমন—"When ক is rejected the vowel which would otherwise be changed by goon does not suffer that change, exp. ভূ with যক্ affixed be-

comes ভূয়।"[২৬] পরে লোপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিষয় সন্ধি—"Of Sundhi or permutation of letters occasioned by the junction of syllables." পরিচ্ছেদের প্রথম অংশে স্বরসন্ধি এবং পরবর্তী অংশে ব্যঞ্জনসন্ধি স্থান পেয়েছে। বিসর্গ সন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় সন্ধির একটি নিয়ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বহু উদাহারণ দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে সংস্কৃত ভাষায় যা সূত্রাকারে আছে তাকে ইংরেজি ভাষায় বোধগম্য করে তুলেছেন।

দ্বিতীয়খণ্ডে র প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয় শব্দরূপ। কিন্তু শব্দরূপের আলোচনায় কেরী সংস্কৃত ব্যাকরণকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করেননি। এ সম্পর্কে কেরী বলেছেন—"The Hindoo Grammarians treat Substantives, Adjectives, and Pronouns promicuously, but as it is more agreeable to the habits of Europeans to separate them, it may be proper to treat them distinctly"[২৭]

কারক, বিভক্তি, বচন ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদের অবগত করার পর শব্দরূপ উপস্থিত করা হয়েছে। 'ঘি', 'ফ', 'উঙ্', 'টি' ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ থেকে গৃহীত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণত শব্দকে 'অজন্ত পুংলিঙ্গ', 'অজন্ত স্ত্রীলিঙ্গ, 'অজন্ত ক্লীবলিঙ্গ' এবং 'হলন্ত (মুগ্ধবোধ মতে হসন্ত) পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপে শ্রেণীভেদ করা হয় এবং সেই ভাবেই শব্দরূপের নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়।

কেরী প্রথমে কতকগুলি সাধারণনিয়ম লিপিবদ্ধ করেছেন,[২৮] পরে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনানুসারে শব্দরূপ উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিতীয়খণ্ডে র প্রথম পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় পর্বে (Sect) 'রাম' শব্দ ও 'আজ্যপা' শব্দের রূপ, স্ত্রীলিঙ্গ 'উমা' এবং ক্লীবলিঙ্গ 'জ্ঞান' শব্দের রূপ দেওয়া হয়েছে। এই সব শব্দরূপের সাধারণ নিয়মগুলিও একই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণেও পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপের বিভিন্ন নিয়ম যথাক্রমে 'রাম', 'উমা' ও 'জ্ঞান' শব্দের দৃষ্টান্তের সাহায্যে উপস্থিত করা হয়েছে। পাণিনীয় ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের দৃষ্টান্ত 'রমা।'

তৃতীয় পর্বে (Sect III) আছে 'হরি', সখি, শম্ভু, ক্রোষ্টু, মতি, ধেনু, বারি, দধি, মধু প্রভৃতি শব্দের রূপ। এখানে মতি, ধেনু প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এবং বারি, দধি প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ হরি, সখি প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দের সঙ্গে একইসঙ্গে স্থান পেয়েছে। শব্দরূপের উপস্থাপনার ব্যাপারে উইলিয়ম কেরী লিঙ্গানুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ করেননি। চতুর্থ পর্বে বাতপ্রমী, হুহু, স্বয়ম্ভূ, গৌরি, স্ত্রী, বধূ প্রভৃতি শব্দের রূপ। কেরীর শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এগুলি তৃতীয় প্রকার ভেদ—"Third Declension— the declension ends in ই, উ।"[২৯] এই ব্যাকরণে 'গৌরি' শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ 'গৌরী'।

মনে হয় 'গৌরি' শব্দটি মুদ্রণ প্রমাদ, কারণ 'গৌরি' শব্দের প্রথমার একবচনে 'গৌরিঃ এবং 'গৌরী' শব্দের প্রথমার একবচনে 'গৌরী' হয়। তৃতীয় পর্বে ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ 'মতি' শব্দ এবং উকারান্ত 'ধেনু' শব্দের রূপ আছে, সুতরাং 'গৌরি' শব্দ এখানেই সন্নিবেশিত হওয়া উচিত ছিল। পঞ্চম পর্বে ঋকারান্ত 'পিতৃ', 'ধাতৃ' ইত্যাদি শব্দ এবং ষষ্ঠপর্বে একারান্ত, ঐকারান্ত, ওকারান্ত ও ঔকারান্ত শব্দের রূপ স্থান পেয়েছে— 'রৈ', 'গো', 'গ্লৌ' প্রভৃতি শব্দ এই পর্বের অন্তর্গত। সপ্তম পর্বটি ব্যঞ্জনান্ত শব্দের জন্য নিবেদিত 'পরিব্রাজ্' 'মরুৎ', 'ভাস্বৎ' ইত্যাদি শব্দ এই পর্বের অন্তর্গত। শেষ শব্দ 'তুরাসাহ্'। একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে স্ত্রীলিঙ্গ 'বাচ্', ক্লীবলিঙ্গ 'অসৃজ্', 'হবিস্' প্রভৃতি শব্দ।

দ্বিতীয় খণ্ডের (Book II) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (ChapII) প্রথমপর্বে (Sect I) বিশেষণ শব্দের রূপ। বিশেষণ সম্বন্ধে কেরী বলেছেন—"Adjectives are declined like substantives. Almost every adjective may be masculine, feminine and neuter"[৩০] পরে সর্বনাম শব্দ আলোচিত হয়েছে। পাণিনীয় ও মুগ্ধবোধ উভয় ব্যাকরণেই সর্বনাম শব্দ আলোচিত হয়েছে। পাণিনীয় ও মুগ্ধবোধ উভয় ব্যাকরণেই সর্বনাম শব্দগুলির রূপ সাধারণ শব্দের সঙ্গেই করা হয়েছে, যেমন পূর্ব, সর্ব, প্রভৃতি শব্দ অজন্ত পুংলিঙ্গ শব্দের এবং 'অস্মদ্' 'যুস্মদ্' প্রভৃতি শব্দ হলন্ত বা হসন্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অন্তর্গত হয়েছে। তুল্য ব্যতীত অন্য অর্থে 'সম' শব্দের, দিকদেশকাল অর্থে 'পূর্বাদি' শব্দের বহিঃসংযোগ ও উপাদান অর্থে 'অন্তর' শব্দের এবং জ্ঞাতি ও ধন ভিন্ন অর্থে 'স্ব' শব্দের সর্বনাম সংজ্ঞা হয়। এই প্রসঙ্গে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। কেরী তাঁর ব্যাকরণে সর্বনাম শব্দের রূপ প্রসঙ্গে শ্লোকগুলি উৎকলিত করেছেন, সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদও দেওয়া হয়েছে। এখানে শ্লোকগুলি এবং একটি শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত হল

"নমঃ সমস্মাৎ পূর্ব্বস্মা অন্তরাস্মা অমেধসাম্।
সুমেধসামন্তরস্মৈ স্বতাং স্বস্মৈ স্বয়ম্ভূবে।।
সমায়ৈষু পরায়ৈষাং মুক্তয়েঽর্থন্তরায়চ।
যদুস্বায় নমঃ স্বায়মল্লৈর্জুষ্টায় শার্ঙ্গিণে।।
অতিসর্ব্বায় সর্ব্বায় সাধ্বন্যানাং সখিদ্বিষে।
কালাবরায় কালেন পূর্ব্বায় জগতো নমঃ।।"

"Salutation to Swumbhu the existent before all, who is without (far from) the foolish, the clothing of the men of quick understanding, the own (friend) of the good."[৩১] ইত্যাদি।

দ্বিতীয়খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কতকগুলি প্রত্যয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রত্যয়গুলি বিশেষণের অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ-অপকর্ষ অর্থাৎ তারতম্য প্রকাশ করার

জন্য ব্যবহৃত হয়। এই অংশে 'তরপ্' 'তমপ্', 'ঈয়সূন্, 'ইষ্ঠন্ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দের একটি তালিকা আছে। তালিকার প্রথম শব্দ 'লঘু' এবং শেষ শব্দ 'প্রশস্য'। পরে স্ত্রীপ্রত্যয়ের আলোচনা, 'আপ্', 'ঈপ্' প্রভৃতি যে সব প্রত্যয়যোগে সাধারণত পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে রূপান্তরিত হয় প্রথমে সেগুলি আলোচিত হয়েছে। পরে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দাদির একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে।[৩২] 'যবানা', 'অরণ্যানী' ইত্যাদি শব্দ এই তালিকার অন্তর্ভূক্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'ইদম্', 'অদস্', 'কিম্', 'যুস্মদ্', 'অস্মদ্' প্রভৃতি শব্দের রূপ।

তৃতীয় খণ্ডে ক্রিয়ার আলোচনা। ধাতু সম্পর্কিত 'গণ', 'অনুবন্ধ' প্রভৃতি বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা এখানে সংযোজিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে কেরী বলেছেন—"The simple dhatoos are said to be one thousand seven hundred and be known to what conjugation it belongs. This is supplied by certain letters called অনুবন্ধ which are either prefixed or affixed to the dhatoo."[৩৩] ধাতুরূপের বিভিন্ন কাল ও ভাবের নামকরণ সম্পর্কে কেরী বলেছেন—

"The tenses of the verbs have different names in the several grammatical writing of the Hindoos. Those of Mugdhubhoodh being the shortest and easiest to remember are used in the work, viz. কী, খী, গী, ঘী, টী, ঠী, ডো, ঢো, তো (ফ)"[৩৪] কেরী সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যবহৃত নামকরণ সম্পর্কে আরও বলেছেন "In Siddhantukaumudi, the Sungsikshptusar and some other grammars they are called লট্, বিধিলিঙ্, লোট্, লুঙ্, লিট্, লুট্, অশির্লিঙ্, লৃট, লৃঙ্।"[৩৫]

পরে পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ধাতুবিভক্তির আকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে। ক্ত্বাচ্, ক্ত, ক্তবতু, স্যতৃ, স্যমান্, ক্বসু, ক্বানচ্, তব্য, অনীয়, য, কেলিমর প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে অসমপিকা ক্রিয়া গঠনে সাহায্য করে অথবা যেগুলি ক্রিয়াবাচক শব্দগঠনে সাহায্য করে সেগুলি উদাহরণ সহকারে আলোচিত হয়েছে।

ধাতুরূপের উপস্থাপনায় কেরী মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিভাষাগুলি গ্রহণ করেছেন কিন্তু অন্য ব্যাকরণে ব্যবহৃত লট্, লোট্ ইত্যাদি পরিভাষাকেও অবহেলা করেননি।[৩৬] প্রথমেই ভ্বাদিগণীয় ভূ ধাতুর রূপ। ধাতুরূপ উপস্থাপনার আগে ধাতুরূপে কোথায় গুণ, বৃদ্ধি, ণত্ব, ষত্ব ইত্যাদি প্রযুক্ত হবে সেই নিয়মগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। 'Of Participle' এই শিরোনামে কেরী বলেছেন—"There are eight participles, viz. the post adverbial, the repeated present, the passive, the past indefinite, the future indefinite, the past, the present and the future"[৩৭]

ধাতুরূপের সঙ্গে এই কৃদন্তপদগুলিরও (participle) পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যেমন 'দা' ধাতুর ক্ষেত্রে—

দা ধাতু

Infinitive Mode

দাতুম্

Participles

Adverbial-দত্ত্বা, প্রদায়।

Repeated—দত্ত্বা দত্ত্বা, দায়ন্ দায়ন্

Passive—দত্ত	Past indefinite দত্তবৎ
Future indefinite—দাতব্য	
দানীয়, দেয়, দেলিম	
Parashmaipudu	Passive Voice
Past দদিবস্	দদান
Present যচ্ছৎ	দীয়মান
Future দাস্যৎ	দাস্যমান[৩৮]

তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ণিজন্ত ধাতুর রূপ উদাহৃত হয়েছে-"কৃ-do. the Casual ধাতু is কারি"।[৩৯] তৃতীয় খণ্ডে র তৃতীয় পরিচ্ছেদে সনন্ত ধাতুর আলোচনা, প্রথমে নিয়মগুলি উদ্ধৃত করে পরে উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে—"Optative dhatoos are formed from simple ones by doubling the first syllable and affixing সন্। The ন্ is rejected. The vowel remains in স"।[৪০] সনন্ত ধাতুর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন-'কৃ-চিকীর্ষতি' ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ডে র চতুর্থ পরিচ্ছেদে যঙন্ত ও যঙলুগন্ত ধাতু সন্নিবিষ্ট হয়েছে, আর পঞ্চম পরিচ্ছেদটি ব্যয়িত হয়েছে নামধাতুর আলোচনায়। নামধাতুকে কেরী লিধু সংজ্ঞা দিয়েছেন—"These dhatoos are called লিধুঃ, viz. crude sounds. [N.B.] লি or লিঙ্গ means a crude sound and ধু a dhatoo." বলা বাহুল্য সংজ্ঞাটি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ থেকে গৃহীত। তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রথম পর্বে পরস্মৈপদবিধান এবং দ্বিতীয় পর্বে আত্মনেপদবিধান স্থান পেয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে তৃতীয় খণ্ড দীর্ঘতম। তৃতীয় খণ্ডের বিস্তার ১৩০ পৃষ্ঠা থেকে ৫৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এখানে ধাতুরূপ, ধাতুরূপের সাধারণ নিয়মাবলী, সনন্ত প্রভৃতি বিশেষ ধরণের ধাতুর আলোচনা স্থান পেয়েছে। ধাতুর প্রতি উইলিয়ম কেরীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তাই এমন কি বাংলা-ইংরেজি অভিধানের প্রারম্ভে সংস্কৃতধাতুর এক দীর্ঘ তালিকা সন্নিবেশ করেছেন।

চতুর্থখণ্ডে শব্দের গঠন—প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পর্বে কৃদন্ত পদ সম্পর্কে আলোচনা। কৃদন্ত শব্দগুলি যে কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, করণবাচ্য, সম্প্রদানবাচ্য, অপাদান বাচ্য, অধিকরণ বাচ্য ও ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়, সে সম্বন্ধে প্রথমেই অবহিত করেছেন—"Of কৃদন্ত words, or such formed immediately from the dhatoos by the formative কৃৎ . These are by Hindoo Grammarians distributed in seven kinds—কর্তৃবাচ্য—ভাস্কর, কর্ম্মণিবাচ্য—কার্য্য, করণবাচ্য—বক্ত্র, সম্প্রদানবাচ্য—দাস, অপাদানবাচ্য—উপাদেয়, অধিকরণবাচ্য—প্রাসাদ। Nouns signify the single idea expressed by the dhatoo are called ভাববাচ্য।"[৪১]

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পর্বে বিশেষণ শব্দের গঠন স্থান পেয়েছে এবং তৃতীয় পর্বের আলোচ্য বিষয় দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রে কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে পরিণত হয়। তৃতীয় পর্বের বিষয় ণত্ব বিধান—'রামায়ণ,' 'পারায়ণ', 'নারায়ণ' ইত্যাদি নকারের ণকারে পরিবর্তনের উদাহরণ। 'সর্বনাম', 'নরবাহন' ইত্যাদি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমপর্বের আলোচ্য বিষয় তদ্ধিত প্রত্যয়। এই পর্বে অব্যয় শব্দের একটি তালিকাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই তালিকায় 'স্বর', 'সাকম্', 'সার্দ্ধম্' ইত্যাদি অব্যয়ের সঙ্গে প্রশ্নবোধক বিভিন্ন অব্যয়, উপসর্গ ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে।

ঐ খণ্ডেরই তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাসের আলোচনা। দ্বন্দ্ব, দ্বিগু ইত্যাদি ক্রমে সমাসগুলি আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় কেরী মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকে বহুলভাবে অনুসরণ করলেও সমাসের ক্ষেত্রে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 'চ' (দ্বন্দ্ব), 'হ' (বহুব্রীহি) ইত্যাদি সাংকেতিক সংজ্ঞা গ্রহণ করেননি।

চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিঙ্গানুশাসন—"Of the gender of the nouns"

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় বাক্যের গঠন। কেরীর ভাষায় —"The arrangement of the nominative case with verb."

ঐ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয়পর্বের বিষয়ও বাক্যের গঠন। বাক্যের মধ্যে বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় প্রভৃতি পদ কিভাবে বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রদর্শিত হয়েছে—'ভদ্রঃ পুমান্', 'সুন্দরী স্ত্রী,' 'দূরং তীর্থং ব্রজতি', 'মান্যেন গুরুণা কর্ত্তব্যম্' ইত্যাদি।

চতুর্থ পর্বে বিশেষ্যগুলি কিভাবে অব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তারই উদাহরণ, যেমন—'ধিক্ লোকমীশ্বরাভক্তম্' অথবা 'সময়া সাধ্বং রমা'।

পঞ্চম পর্বের আলোচ্য বাক্যমধ্যে ক্রিয়ার স্থান—'রামঃ কপিভী রক্ষাংসি অখাটয়ন্', 'হরির্বেণুমশ্রাবয়ঞ্চ গাঃ' ইত্যাদি।

পঞ্চম খণ্ডে ছাত্রদের পাঠানুশীলনে সাহায্যের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে দীর্ঘ অনুচ্ছেদ

উৎকলিত হয়েছে, যেমন—"Exercises for parsing. The first section of Shree Bhagabuta—

"ওঁ নৈমিষ্যেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত।
তং একদা তু মুনয়ঃ প্রাতর্হুতহুতাগ্নয়ঃ
সংস্কৃতং সুতমাসীনং প্রপচ্ছবিদমাদরাৎ।।"

প্রথমে অনুচ্ছেদের ইংরেজি অনুবাদ, পরে পদগুলি কি ভাবে সাধন করতে হবে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পদসাধনের কিছু অংশ নমুনারূপে উৎকলিত হল।

"ওঁ is prefixed to all Hindoo writings, it is composed of the letters অ, ই and ম. These are united by the rules of Sundhi for above word expressive of the trinity of the Hindoos. নৈমিষে Naimisha a substantive proper, seventh-case singular. অনিমিষক্ষেত্রে the holy place of him who never closes his eyes, viz. Vishnoo a compound objective of fourth class, seventh-case singular agreeing with the substantive নৈমিষে। The initial অ is lost by rule 22 of page 21".

পরবর্তী অংশে সংস্কৃত বাইবেল উদ্ধৃত হয়েছে—"মঙ্গলসমাচারো মাতিউরচিতঃ প্রথম পর্ব্ব

The first three chapters of the Gospel by St. Mathew

মঙ্গলসমাচারো মাতিউরচিতঃ

প্রথম পর্ব্ব

আব্রাহামো যিসবকং জনয়ামাস যিসবকশ্চ যআকুবং জনয়ামাস যআকুবশ্চ যউদাং তদ্ধাতটংশ্চ জনয়ামাস যউদা তু ফরসং জরখঞ্চ তমরায়া গর্ব্ভে জনয়ামাস ফরস্‌শ্চ খসরোণং জনয়ামাস খসরোণশ্চ রামং জনয়ামাস রামশ্চ আমিনদবংজনয়ামাস আমিনদবস্তু নাখশোনং জনয়ামাস" ইত্যাদি। উল্লিখিত অংশের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়নি কারণ তার প্রয়োজন ছিল না। পদপরিচয়ের এই অনুশীলনীতে কোন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়নি, কারণ তা পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে। তৃতীয় অনুশীলনীটি ঈশোপনিষৎ থেকে গৃহীত। শিরোনামে বলা হয়েছে—"Vajusuneya/or/The Oopanishat EESAVASYU/Belonging to /The Yajoos Vedu/ ইতীশোপনিষত্" ঈশোপনিষদের আঠারোটি শ্লোকই উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে প্রথম শ্লোকটি অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হল—

"ঈশাবাস্যমিদং সবর্বং যৎ কিঞ্চ জগতাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।"

অনুবাদ—"By God is filled all this whole, whatever is in the world, therefore relinquishing (earthly attachments) preserve (devotedness to Him). Desire none's wealth''. তৃতীয় অনুশীলনীতেও পদপরিচয়ের দৃষ্টান্ত নেই, সেগুলি ছাত্রদেরই কর্তব্য। কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিশিষ্ট অংশে সংস্কৃত ধাতুর একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে—"An Appendix/Containing/A list of Dhatoos or roots of Sungskritu Language/Observation on Unoobundhas'' অনুবন্ধের সংজ্ঞা নির্ণয়ের পর অ, আ ইত্যাদিক্রমে অনুবন্ধের বিভিন্ন কাজ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন—"The Unoobandha অ is put for the sake of easy pronounciation. This letter being inherent in the preceding is not expressed by its proper sign অ"। পরিশিষ্টের ধাতুর তালিকাটি বৃহৎ, প্রায় একশ পৃষ্ঠাব্যাপী। এই তালিকায় ধাতু, অনুবন্ধ ও অর্থকে পৃথক ভাবে দেখানো হয়েছে, যেমন—

"Dhatoo	Unoobundha	meaning
অঙ্ক্	ত্ ক	পদেলক্ষণি, page mark
অংশ্	ত্ ক	বিভাজনে, shareout.''

উইলিয়ম কেরী এই ব্যাকরণে বিষয়সূচী এবং শুদ্ধিপত্র যোজনা করেছেন। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০৬। পরিশিষ্টে ১০৮ পৃষ্ঠার ধাতু ও অনুবন্ধের তালিকা, শুদ্ধি পত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯।

উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্য কোন সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৭৯৭ সনে নিজ প্রয়োজনে যে ব্যাকরণ রচনায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন ১৮০৬ সনে তা প্রকাশিত হয়।[৪২] ভূমিকা অংশে তিনি বারংবার বলেছেন এই ব্যাকরণ ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার সহায়ক হবে এবং সে উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। ছাত্রদের পাঠাভ্যাসের জন্য ঈশোপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবত থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় দেশে বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থের পাশাপাশি বেদান্তের পঠনপাঠনও প্রচলিত ছিল। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর বাগবাজারের চতুষ্পাঠীতে বেদান্তের অধ্যাপনা করতেন। সজনীকান্তদাস উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণকে বিদেশীর লেখা প্রথম সম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলেছেন,[৪৩] কারণ কোলব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণের একটিমাত্র খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। কেরীর বাংলা ব্যাকরণের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়,[৪৪] কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের একাধিক সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলাভাষা শিক্ষার্থী সিভিলিয়ানের তুলনায় সংস্কৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা

অনেক কম ছিল, সেই কারণেই বোধহয় সংস্কৃত ব্যাকরণ পুনরায় মুদ্রণের প্রয়োজন হয়নি। যাইহোক উইলিয়ম কেরী ও তাঁর সহায়ক পণ্ডিতদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম গ্রন্থটির প্রতিটি ছত্রে প্রকাশিত।

কোলব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণ ঃ

উইলিয়ম কেরীর সমসাময়িক যুগে আরও কয়েকটি সংস্কৃত ব্যাকরণ ইংরেজিতে রচিত হয়। এই ব্যাকরণগুলির মধ্যে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ এইচ. টি. কোলব্রুক এবং চার্লস উইলকিন্সের ব্যাকরণ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কোলব্রুক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার প্রথমকালাবধি সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে উইলিয়ম কেরী সংস্কৃত বিভাগেরও দায়িত্ব লাভ করেন। কোলব্রুক মৌখিকভাবে কোন পাঠদানের পক্ষপাতী ছিলেন না, আর সেই কারণেই ছাত্রদের পাঠদানের জন্য ইংরেজি ভাষায় একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৪৫] ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন—"I felt it incumbent on me to furnish through the press, the means of studying a language which it was my duty to make-known, but on which I had no intention of delivering oral instruction". (preface).

অধ্যাপক কোলব্রুকের অভিলাষ ছিল ব্যাকরণ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্তভাবেই রচনা করবেন, কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় যে বক্তব্যবিষয়ের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে, তখন অধ্যাপক কোলব্রুক স্থির করেন যে গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে সমাপ্ত করবেন। আলোচ্য গ্রন্থটি ব্যাকরণের প্রথম খণ্ড। সূত্র, বার্তিক, ভাষ্য, টীকাদি পরম্পরায় পাণিনীয় প্রস্থানের যে ঐতিহ্য, সেই ধারাকে অনুসরণ করেই অধ্যাপক কোলব্রুক তাঁর গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য প্রয়োজন মতো অন্যান্য প্রস্থানের সাহায্য গ্রহণ করতেও তিনি পরাঙ্মুখ হননি। কোলব্রুক জানিয়েছেন যে ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি তিনি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করবেন। প্রয়োজন অনুসারে তিনি নিজস্ব পরিভাষাও গঠন করেছেন।[৪৬] তিনি আভাস দিয়েছেন যে পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি বাক্যের গঠন ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করবেন। কোলব্রুকের ব্যাকরণের ভূমিকায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণদের দীর্ঘ তালিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

অধ্যাপক কোলব্রুকের A Grammar of The Sanskrit Language গ্রন্থে তেইশটি অধ্যায় (Chapter) আছে। অধ্যায়গুলি আবার পর্বে (Section) বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পর্বের বিষয় বর্ণ, অক্ষর। দেবনাগরী লিপিতে বর্ণ ও অক্ষরের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পৃষ্ঠার একপাশে বর্ণগুলির পরিচয় এবং অপর পার্শ্বে ইংরেজি শব্দের সাহায্যে বর্ণগুলির উচ্চারণের একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—

"Vowels	Powers
অ অকার	a-Ore
	as e in her
	i in fir" ইত্যাদি"

দ্বিতীয়পর্বে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে আকারাদি স্বরবর্ণের যোগে যে অক্ষরের উদ্ভব হয়, তারই লিপি উদাহৃত হয়েছে, যেমন—"ক, কা, কি, কী ইত্যাদি। তৃতীয়পর্বে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, উষ্মবর্ণ, ককারাদি বর্গ প্রভৃতি ব্যাকরণের কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের পরিচয় দিয়েছেন। চতুর্থ পর্বের বিষয় 'শিবসূত্র', 'প্রত্যাহার' ইত্যাদি। পঞ্চমপর্বে বর্ণের উচ্চারণ-স্থান, প্রযত্ন ইত্যাদির পরিচয়। টেবলের (table) সাহায্যে বিবরণকে সহজবোধ্য করা হয়েছে। ষষ্ঠপর্বের বিষয় স্বরবর্ণের হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব ইত্যাদি। টেবলের সাহায্যে হ্রস্ব, দীর্ঘ প্লুত এবং উদাত্ত, অনুদাত্তাদি 'স্বর' প্রদর্শিত হয়েছে। সপ্তমপর্বে গুণ, বৃদ্ধি প্রভৃতি সংজ্ঞার ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন পদের (Parts of Speech) ব্যবহার ও সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম। প্রথম পর্বে ধাতু, নিপাত, প্রাতিপদিক, সর্বনাম, কৃৎ, তদ্ধিত ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের আলোচনা। দ্বিতীয় পর্বের বিষয় শব্দ, প্রত্যয়। তৃতীয় পর্বে সবর্ণ, অন্তরতম, স্থানিবৎ, সম্প্রসারণ, উপধা, টি ইত্যাদি পরিভাষার ব্যাখ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় সন্ধি। প্রথম পর্বে সন্ধির সাধারণ আলোচনা, দ্বিতীয় পর্বে স্বরসন্ধি, তৃতীয়পর্বে ব্যঞ্জন সন্ধি এবং চতুর্থ পর্বে সন্ধির আরও কতকগুলি নিয়ম আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় শব্দরূপ—প্রথম পর্বে 'সু', 'ঔ', 'জস্' ক্রমে বিভক্তিগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন কারকের বিভিন্ন বিভক্তির আলোচনা। তৃতীয়পর্বে বিভক্তি ব্যবহারের পর যে সব স্থলে সন্ধি ঘটে, সেই সব ক্ষেত্রে সন্ধির নিয়মাদি বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। 'সু' প্রভৃতি বিভক্তির প্রযুক্তিগত রূপও দেখানো হয়েছে—"স deducted from সু (1st singular) is convertivle as in other influcnce into র etc. আ deducted from টা or অঙ্।"

ধাতুর অন্ত্যবর্ণের সঙ্গে বিভক্তির আদ্যবর্ণের সন্ধি চতুর্থ পর্বে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্বে বিভিন্ন ধাতুবিভক্তি এবং ধাতুর সঙ্গে বিভক্তির সন্ধির আলোচনা। সপ্তম পর্বের শেষদিকে চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সামগ্রিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা। লেখক উল্লেখ করেছেন চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা মূলত পাণিনির অষ্টম অধ্যায়ের শেষ তিনটি পর্বনির্ভর।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্বে অকারান্ত এবং আকারান্ত পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গের শব্দগুলির রূপ করা হয়েছে, এই

প্রসঙ্গে ব্যাকরণের নিয়মগুলিও উল্লিখিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাতটি পর্ব। প্রথম পাঁচটি পর্বে ইকারান্ত, উকারান্ত, ঋকারান্ত, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং নপুংসকলিঙ্গের শব্দরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্বে সংখ্যাবাচক শব্দের রূপ।

সপ্তম অধ্যায়ের তিনটি পর্বের বিষয় ঈকারান্ত ও ঊকারান্ত পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ।

অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ অধ্যায়ের বিভিন্ন পর্বে স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত বিভিন্ন শব্দের রূপ স্থান পেয়েছে। তিনটি লিঙ্গের শব্দের রূপই একত্র স্থান পেয়েছে। বস্তুত কোলব্রুক সন্ধি ও শব্দরূপের অত্যন্ত বিশদ ও পুঙ্খানুপঙ্খ আলোচনা করেছেন, ফলে তাঁর গ্রন্থের বিস্তৃতিও তাঁর অনুমানের সীমাকে অতিক্রম করেছে, ফলে তিনি গ্রন্থটি একটি খণ্ডে সমাপ্ত করতে পারেননি, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য অপেক্ষিত ছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশেষ্যপদের লিঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লেখক জানিয়েছেন যে প্রাচীন বৈয়াকরণরা মনে করতেন ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমেই লিঙ্গ বিষয়ক জ্ঞান জন্মায়। পরবর্তী বৈয়াকরণরা লিঙ্গ সম্পর্কিত কিছু কিছু নিয়ম লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোকব্যবহারে সেগুলিরও নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং বহু শব্দের লিঙ্গকে নিপাতনে সিদ্ধ রূপে স্বীকার করা হয়। এই প্রসঙ্গে লেখক আরও জানিয়েছেন যে অব্যয় পদের এবং 'অস্মদ্', 'যুষ্মদাদি' সর্বনাম শব্দের লিঙ্গান্তর হয়না।

চতুর্দশ অধ্যায়ের বিষয় স্ত্রীপ্রত্যয়। প্রথম পর্বে 'ঈ', 'ঙীপ্', 'ঙীষ্', 'টাপ্' ইত্যাদি স্ত্রীপ্রত্যয় উদাহরণ সহকারে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বেও প্রথম পর্বের অনুবৃত্তি।

পঞ্চদশ অধ্যায়টি অব্যয়ের আলোচনায় নিবেদিত। অব্যয় শব্দের কোন রূপ করা যায়না, লিঙ্গান্তর ও হয়না। লেখক বলেছেন বেশ কিছু কিছু বিশেষ্য পদ (স্বর ইত্যাদি), নিপাত, অব্যয়ীভাব সমাস ইত্যাদি অব্যয়ের অন্তর্গত।

ষোড়শ অধ্যায়টিতে স্থান পেয়েছে ধাতুরূপ। প্রথম পর্বে ধাতুর লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে লকার, সকর্মক, অকর্মক ক্রিয়ার আলোচনা। তৃতীয়পর্বে পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ক্রিয়াবিভক্তিগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পঞ্চমপর্বে ধাতুরূপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং টেবলের মাধ্যমে তি, তস্, অন্তি ইত্যাদি বিভক্তির তালিকা।

সপ্তদশ অধ্যায়ের বিষয় 'বৃদ্ধি।' প্রথম পর্বে 'ইট্' এবং দ্বিতীয় পর্বে ইট্ ও অট্ আগমের ক্ষেত্র বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'সার্বধাতুক' বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় পর্বের বিষয় ক্রিয়ার সঙ্গে উপসর্গের যোগ। চতুর্থ পর্বে ধাতুর উপধায় কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যে বৃদ্ধি ঘটে, সেই সম্পর্কে আলোচনা।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিষয় ধাতুর সঙ্গে বিভক্তির বর্ণগত সন্ধির প্রক্রিয়া। প্রথম পর্বে 'আর্ধধাতুক' ক্রিয়ার মূল ধাতুর সঙ্গে কি ভাবে বিভক্তির সন্ধিসংঘঠিত হয় তাই প্রদর্শিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে ণত্ব ও ষত্ববিধান। তৃতীয়পর্বে বিশুদ্ধ বানান ও সন্ধির প্রক্রিয়া। চতুর্থ পর্বে দ্বিত্ব, পঞ্চমপর্বে অন্তঃস্থ বর্ণের ক্ষেত্রে সংহিতা এবং ষষ্ঠপর্বে যৌগিকবর্ণের সন্ধি আলোচিত হয়েছে। কোলব্রুক বলেছ্নে এই নিয়মগুলির আলোচনায় তিনি পাণিনির ব্যাকরণের অষ্টম অধ্যায়কে অনুসরণ করেছ্নে।[৪৭]

ঊনবিংশ অধ্যায়ে ক্রিয়ার আলোচনা। প্রথম পর্বে বিভক্তি-প্রত্যয়যোগে ক্রিয়ার পরিবর্তন, সন্ধির প্রয়োগ। দ্বিতীয় পর্বে ধাতুর অন্ত্যবর্ণের সঙ্গে এবং আর্ধধাতুক ক্ষেত্রে বিভক্তির সন্ধি প্রক্রিয়া। সপ্তম পর্বের বিষয় আগম।

বিংশ অধ্যায়ে ভূ প্রভৃতি ধাতু সম্পর্কিত আলোচনা। প্রথম পর্বে ভূধাতুর কর্তৃবাচ্যের রূপ। দ্বিতীয় পর্বে ভূ ধাতুর কর্মবাচ্যের এবং তৃতীয় পর্বে ভূধাতুর কর্মবাচ্যের ণিজন্তরূপের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। চতুর্থ পর্বে ভূ ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয়ের যোগ। এখানে ভূ ধাতুর যাবতীয় রূপ আলোচিত হয়েছে। পঞ্চমপর্বে ভূধাতুর প্রথম পুরুষের একবচনের রূপগুলি আহৃত হয়েছে। ষষ্ঠ পর্বে ভূধাতুর ভাববাচ্যের এবং ণিজন্ত ভাববাচ্যের রূপ। সপ্তম পর্বে অন্যান্য পরিপূরক ভাববাচ্যের আলোচনা।

একবিংশ অধ্যায়ে প্রথমবর্গের ক্রিয়ার আলোচনা। প্রথম পর্বে যে সব ধাতুর অন্ত্যবর্ণটি দন্ত্যবর্ণ সেই সব ধাতুর আলোচনা। দ্বিতীয় পর্বের বিষয় উদাত্ত ও স্বরিৎস্বর যুক্ত ক্রিয়া। তৃতীয় পর্বে কণ্ঠ্যবর্ণ অন্তে আছে এমন সব ধাতুর রূপ। চতুর্থ পর্বে স্বরিৎস্বর যুক্ত ক্রিয়ার আলোচনা। পঞ্চম পর্বে তালব্যবর্ণান্ত উদাত্তস্বরযুক্ত ধাতুর রূপ, এইভাবে ষোড়শ পর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের ধাতুর আলোচনা।

দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায় দুটিও ধাতুরূপেরই বিভিন্ন আলোচনায় নিয়োজিত।

অধ্যাপক কোলব্রুকের মতে সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতুর গুরুত্ব অপরিসীম। সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর সংখ্যা তিনসহস্রের অধিকএবং উপসর্গাদি যোগে তাদের নানা পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ধাতুর সঠিক আলোচনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই ধাতু প্রসঙ্গে কোলব্রুক লিখেছ্নে—"The themes (dhatoo) or roots of verb are of such primary importance in Sanskrit language and there is so much disagreement among ancient and as well as modern grammarians, in regard to some of them that it has been judged neccssary to make careful collation of many different works, and after ascertaining the most correct readings, to notice in this and the following chapters, the discordant opinions recorded by the numerous authorities which have been consulted, omitting however differences,

that may be imputed to the inaccuracy of the transcribers, but preserving other various readings, which though erroneous, have been countenanced by high authority."[৪৮] আর এই সব সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনার জন্যই ধাতুর আলোচনা এত দীর্ঘ হয়েছে এবং গ্রন্থ বৃহদাকার ধারণ করেছে।

কোলব্রুকের A Grammar of The Sanskrita Language-এর প্রথম খণ্ড ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অপরদিকে উইলিয়ম কেরীর A Grammar of The Sungskrit Language ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কেরী গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন তাঁর রচিত পুস্তকটিই ইংরেজিতে লেখা প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ, যদিও স্পষ্টতই কেরীর ব্যাকরণ এক বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। তবে কেরীর ব্যাকরণটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং কোলব্রুকের ব্যাকরণটি অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ রচনার প্রথমভাগ (vol-I) মাত্র। তাছাড়া অধ্যাপক উইলসন ও বলেছেন—যদিও কোলব্রুকের গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়, তবুও এটিকে ইংরেজিতে লেখা প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ বলা যায় না। কেরীর ব্যাকরণের প্রথম তিনটি অধ্যায় ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৯] কেরী ও কোলব্রুকের গ্রন্থের পরিকল্পনায়, বস্তু বিন্যাসে এবং রচনার মানসিকতায় বিশেষ বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। কেরী অধ্যাপনার কাজে সুবিধার জন্য ছাত্রদের সাহায্যার্থে গ্রন্থটি রচনা করেন। কোলব্রুকও যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন ছাত্রদের পাঠদানের জন্যই ব্যাকরণটি রচনা করেন, কারণ মৌখিকভাবে পাঠদান তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু কোলব্রুকের গ্রন্থের ভূমিকায় ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারটি স্থানই পায়নি।

অন্যান্য সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য গ্রহণ করলেও কেরী মূলত বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উপর নির্ভর করেছেন। কোলব্রুক পাণিনীয় প্রস্থানকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন। কোলব্রুক ভূমিকায় সূত্র, বার্তিক, ভাষ্য থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ব্যাকরণগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের এমন কি টীকার টীকাকারের একটি বিস্তৃত তালিকা রচনা করেছেন।[৫০] অপরপক্ষে কেরী গ্রন্থের পরিশিষ্টে ধাতু ও অনুবন্ধের একটি দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন। আর উভয় গ্রন্থে বিঁষয় বস্তুর বিন্যাসের মধ্যেও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কেরী বহু উদাহরণের সাহায্যে বিষয়বস্তুকে ছাত্রদের কাছে সহজগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছেন। কোলব্রুকও বিষয়কে বিস্তৃত ভাবে উপস্থাপনায় ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু সে প্রয়াস অনেক সময়েই জটিল হয়েছে।[৫১] তবে একটি বিষয়ে উভয় গ্রন্থকারের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়—উভয়েই মনে করেন ধাতু তথা ক্রিয়াপদের ব্যবহার সংস্কৃত ব্যাকরণের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাই উভয় গ্রন্থেই ধাতুরূপের জন্য অনেকগুলি পৃষ্ঠা ব্যয়িত হয়েছে।[৫২]

উইলিয়ম কেরীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তার রচনার মূল্যায়ন

প্রসঙ্গে হোরেস হেমান উইলসন কেরী ও কোলব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন—"The first and only volume of Mr. Colebrooke's Grammar was printed in 1805 and would therefore be entitled to the merit of priority, but in point of fact it was preceded by a more than equal portion of Dr Carey's work, a part which containing the first three books was published in 1804, although the whole did not appear until a later date. The contemporaneous appearance of the two works is evident that they were compiled separately and independently, and that the later could not in any way have been indebted to the earlier of the two. This is also manifest from the difference that prevails in the plan of them and their resting upon authorities of various schools."[৫৩]

চালর্স উইলকিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ ঃ

উইলিয়ম কেরী ও কোলব্রুকের প্রায় সমসাময়িক কালে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ চার্লস উইলকিন্স ইংরেজি ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন।[৫৪] উইলকিন্সের ব্যাকরণটি ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। উইলকিন্স গ্রন্থটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকগণকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উৎসর্গ করেছেন।[৫৫] উৎসর্গপত্রে উইলকিন্স জানান যে সিনিয়র সার্ভিসের সিভিলিয়ান ছাত্রদের প্রয়োজনেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। ভারতবর্ষে কর্মরত ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্টদের স্থানীয় ভাষায় জ্ঞান থাকা ছিল আবশ্যিক[৫৬]। আর সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে উত্তরভারতীয় ভাষাগুলির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ভারতীয়ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান প্রায় অপরিহার্য, বিশেষত বিদেশীদের পক্ষে।[৫৭]

গ্রন্থের ভূমিকায় উইলকিন্স পূর্বসূরীদের নামোল্লেখ করেছেন। হ্যালহেড তাঁর A Grammar of Bengal Language-এর ভূমিকায় সংস্কৃতভাষার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন উইলকিন্সের সংস্কৃতব্যাকরণের ভূমিকায় সেই প্রশংসাবাণীই অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে উচ্চারিত হয়েছে।[৫৮]

উইলকিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকায় এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ স্যার উইলিয়ম জোন্সের উক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎকলিত হয়েছে—"The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than Greek, more copious than Latin and most excellently refined than either."

ঐ ভূমিকায় উইলকিন্স বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক কোলব্রুকের অসমাপ্ত ব্যাকরণের এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বহুবিধ ক্ষেত্রে অধ্যাপক কোলব্রুকের স্বচ্ছন্দ পদচারণার উল্লেখও করেছেন।[৫৯]

নিজের প্রয়োজনে দীর্ঘকাল যাবৎ বহুপরিশ্রমে সংস্কৃত ভাষার যে ব্যাকরণ উইলকিন্স রচনা করেছিলেন এবং নিজের প্রস্তুত ছেনি কাটা হরফে যে পুস্তকের মুদ্রণেরও ব্যবস্থা হয়েছিল, অগ্নিকান্ডে তা ভস্মীভূত হয়। তাঁর মন হতাশায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। পরে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা ও আচার ব্যবহারে শিক্ষিত করার জন্য লন্ডনের কাছে একটি কলেজ স্থাপন করেন।[৬০] ঐ কলেজের প্রয়োজনে উলিকিন্সের A Grammar of the Sanskrit Language মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

পুস্তকের বিবরণ ঃ

চালর্স উইলকিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি 'সংস্কৃত' শব্দটির অর্থ নির্ধারণ করেছেন—"The term Sanskrita seems to have been given to the language which is the object of this grammar, by way of prominence and distinguish it from vulgar dialects called prakrita''. এখানে অবশ্য vulgar শব্দটি নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়নি, 'প্রচলিত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণমালার পাঠ; বর্ণগুলির সঙ্গে 'কার' এই শব্দাংশ যুক্তকরে তবেই উচ্চারণ সমাধা হয়, যেমন 'অকার', 'আকার' ইত্যাদি। পরে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের সংযোগ প্রদর্শিত হয়েছে। স্বরবর্ণের হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। 'ক্ষকার'কে বর্ণমালার মধ্যে গ্রহণ করলেও এটি যে সংযুক্ত বর্ণ এ বিষয়ে উইলকিন্সের সন্দেহ ছিলনা। তিনি নিজেই বলেছেন—".... as to क्ष ksha it is indisputably a compound formed by the qualition of क ka and ष sha, and so it is considered by the learned professors of this language.''[৬১]

ছাত্রদের দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত করার জন্য এবং পাঠে অভ্যস্ত করার জন্য হিতোপদেশ গ্রন্থের কিছু আখ্যান উৎকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় orthography বা বিশুদ্ধ বানান সম্পর্কিত। সারণীর (টেবল) সাহায্যে স্বরসন্ধিকে সহজবোধ্য করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সাধারণত অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বিষয়বস্তু ঘোষণা করা হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সমস্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে গ্রন্থকার জানিয়েছেন এই অধ্যায়ের বিষয় সন্ধি—"The term used by the Grammarians for the subject of this chapter is संधि।''[৬২]

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় শব্দরূপ। প্রথমে 'সি,' 'ঔ', 'জস্' ক্রমে 'সুপ্' বিভক্তিগুলির

পরিচয়, পরে ঐ বিভক্তিগুলি কিভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'ভ্যাম্', 'ভিঃ', ইত্যাদিতে পরিবর্তিত হয় তা প্রদর্শিত হয়েছে।

পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ক্রমে শব্দগুলির রূপ নিরূপিত হয়েছে, যেমন প্রথমে 'শিব' শব্দের পুংলিঙ্গের রূপ, পরে ঐ শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের রূপ প্রদর্শিত হয়েছে। 'হরি', 'সখি', 'মতি' প্রভৃতি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ নিরূপিত হয়েছে, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ নিরূপণের জন্য পৃথক অধ্যায় বা পর্ব নির্দ্দিষ্ট হয়নি। শেষ শব্দ 'উপানহ্'। চতুর্থ অধ্যায়টি সর্বনাম ও সর্বনামবাচক 'সর্ব', 'বিশ্ব' ইত্যাদি শব্দের রূপ নির্ণয়ে নিয়োজিত।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয় ধাতুরূপ। গ্রন্থকার পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ধাতুর আলোচনা করেছেন। দশটি গণের একটি তালিকা এবং ধাতু গুলির প্রথম পুরুষ একবচনের রূপও সন্নিবেশিত হয়েছে। পরে পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ধাতুর বিভিন্ন লকারের বিভক্তি সংযোজিত হয়েছে। এক একটি গণের এক একটি ধাতুর লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙের রূপ প্রদর্শনের পর, সেইগণের অন্যান্য ধাতুর তালিকা সংস্থাপিত হয়েছে। পরবর্তী অংশে লিট্, লুট্, লৃট্ ও আশীর্লিঙের রূপ। এই ব্যাকরণের বেশকিছু পৃষ্ঠা ধাতুরূপ ও ণিজন্ত ধাতুর রূপে ব্যয়িত হয়েছে। এই অধ্যায়ে যঙন্ত, সনন্ত, নামধাতু এবং ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্যের আলোচনা আছে। যষ্ঠ অধ্যায়ে কৃৎ প্রত্যয়ের আলোচনা ও উদাহরণ। সপ্তম অধ্যায়টি তদ্ধিত প্রত্যয়ের জন্য ব্যয়িত। অষ্টম অধ্যায়ে অব্যয় শব্দের তালিকা। নবম অধ্যায়ে অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, বহুব্রীহি ও কর্মধারয় সমাস সম্পর্কিত নিয়ম ও উদাহরণ স্থান পেয়েছে। দশম অধ্যায়ের বিষয় লিঙ্গনির্ণয় ও স্ত্রীপ্রত্যয়। একাদশ অধ্যায়ে বাক্যের গঠন বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রথমে বাক্যে বিশেষ্য বিশেষণের সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে—'ধার্মিকো রাজা', 'সুন্দরী নারী', 'পুণ্যং কুলং।' বাক্যে অন্যান্য পদের সঙ্গে কারকের সম্পর্কও নির্দেশিত হয়েছে। বাক্যের গঠন বা syntax সম্পর্কিত দৃষ্টান্তগুলি অধিকাংশই পদ্যে রচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, রামায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ উদাহরণগুলির উৎস।[৬৩]

গ্রন্থকার বলেছেন বাক্যের গঠনের ক্ষেত্রে শব্দগুলির প্রয়োগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় কখনই খুব কঠোর নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা হয় না।[৬৪] বইটিতে দেবনাগরী অক্ষরের তিনটি সুন্দর লিপিচিত্র (plate) সংযোজিত হয়েছে—প্রথমটিতে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ, দ্বিতীয়টিতে আকার, ইকার ইত্যাদির যোগ, যেমন—'আ-কা', 'ই-কি' ইত্যাদি এবং তৃতীয়টিতে সংযুক্ত বর্ণ প্রদর্শিত হয়েছে। গ্রন্থকার স্বয়ং ধাতুনির্ম্মিত অক্ষরগুলি খোদাই করেন, এগুলি তারই প্রতিকৃতি।[৬৫]

গ্রন্থের শেষে লেখক চার্লস উইলকিন্স অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন—

"It now becomes necessary to draw this work to conclusion,

though there still remains ample room for further discussion. But in the language of an eminent grammarian—

"ইন্দ্রাদয়োঽপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়াং তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথং।।"

অধ্যাপক উইলিয়ম কেরী, অধ্যাপক কোলব্রুক, অধ্যাপক উইলকিন্স তিন জনেই ইংরেজিভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনজনেই স্বীকার করেছেন যে ছাত্রদের প্রয়োজনেই তাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন। অবশ্য উইলকিন্স ভূমিকায় লিখেছেন নিজের ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন।[৬৬] কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পৃথক, ফলে গ্রন্থের পরিকাঠামো রচনায় যে পরিকল্পনা তাঁরা করেছিলেন তা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। অধ্যাপক কোলব্রুকের গ্রন্থ অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি তাঁর অধীতবিদ্যাকে রচিত গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর সংস্কৃত অধ্যয়নের ব্যাপ্তি ও গভীরতার পরিচয় ভূমিকাংশেই পরিস্ফুট।[৬৭] পাণ্ডিত্যের অতিরিক্ত প্রকাশে তাঁর গ্রন্থ ছাত্রদের পক্ষে কিছুটা জটিল মনে হতে পারে।

চালর্স উইলকিন্সের গ্রন্থের পরিকল্পনা সাধারণভাবে জটিলতাবিহীন এবং ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য। তবে বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে উদাহরণগুলি তিনি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি মহাকাব্য থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং পদের শীর্ষে I, 2, 3, ইত্যাদি সংখ্যা সংস্থাপনের দ্বারা পদগুলির পরস্পরের অন্বয় নির্ণয় করেছেন। পদ্ধতিটি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছুটা জটিল।

কোলব্রুক বা উইলকিন্সের ব্যাকরণের তুলনায় কেরীর ব্যাকরণের উপযোগিতা বেশি, কারণ তাঁর ব্যাকরণের পরিকল্পনা কিছু পরিমাণে ইংরেজি ব্যাকরণের কাঠামোকে অনুসরণ করেছে, ফলে এই ব্যাকরণ ছাত্রদের প্রাথমিক অপরিচিতির ভীতি দূর করে। কেরী মূল সূত্রগুলি উপস্থাপিত করে প্রচুর উদাহরণ দিয়েছেন।

কোলব্রুক যেমন সর্বভারতীয় বৈয়াকরণের উল্লেখ করেছেন, কেরী তা করেননি। কয়েকটি ক্ষেত্রে ভট্টজদীক্ষিত, ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি ব্যাকরণকারের উল্লেখ করলেও মূলত বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই অনুসরণ করেছেন।

ব্যাকরণ রচনার কয়েকটি ক্ষেত্রে এই তিন বিখ্যাত গ্রন্থকারের মানসিকতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই ধাতুবিভক্তি ও ক্রিয়াপদের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাঁদের গ্রন্থের অনেকগুলি পৃষ্ঠা উক্ত ব্যাপারের আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছে। শব্দরূপের আলোচনাতেও এই মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। তিনটি গ্রন্থেই শব্দরূপের আলোচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণকে যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি। সংস্কৃত ব্যাকরণে শব্দগুলি পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, নপুংসকলিঙ্গ ইত্যাদি ক্রমে শ্রেণীভূক্ত করে অজন্তাদি ক্রমানুসারে তাদের রূপ করা হয়। কিন্তু আলোচ্য তিনটি ব্যাকরণেই শব্দের লিঙ্গভেদ

অনুসরণে শব্দরূপ করা হয়নি, একই অধ্যায়ে ইকারান্ত বা উকারান্ত পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ শব্দের রূপ প্রদর্শিত হয়েছে।

কেরী ও উইলকিন্স উভয়েই গ্রন্থের ভূমিকায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রশস্তি করেছেন, কেরীর প্রশস্তি অপেক্ষাকৃত বিশদ।

কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কে বিখ্যাত অধ্যাপক হোরেস হেমেন উইলসন মন্তব্য করেছেন—"To a mere English student the rules are somewhat unusual, and therefore unintelligible character; and to make a satisfactory use of this grammar a native grammar particularly Mugdhabodha of Vopadeva should be read at the sametime with it. All that is strange and perplexing will then disappear, and the work of the Englsih Grammar will be found a most serviceable illustration and interpreter of the brief and technical composition of the Indian philologist."[৬৭]

১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের Quarterly Review পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কেরী, উইলকিন্স ও কোলব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সমালোচনায় বলা হয়—"the first everywhere useful, laborious and practical. Mr Wilkins has also discussed these subjects, though not always so amply as the worthy and unwearied missionary. We have been much pleased with Dr. Carey's very sensible preface"[৬৮]

বস্তুত উইলিয়ম কেরী পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য ইংরেজিতে সংস্কৃতব্যাকরণ রচনা করতে চাননি, ছাত্রদের প্রয়োজনেই এই বিশাল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং তাঁর একনিষ্ঠ প্রয়াস যথাযথ সার্থকতা লাভ করেছিল।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃতব্যাকরণের কিছু অংশ ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২। উইলিয়ম কেরী ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষও ছিলেন। পরে তিনি সংস্কৃত বিভাগেরও অধ্যক্ষ হন। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে কেরী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন।
সজনীকান্ত দাস, সাহিত্য সাধকচরিত মালা—১৫; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
কলকাতা-১৩৮৩ বঙ্গাব্দ-(ষষ্ঠসং) পৃ-২৫

৩। উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হওয়ার আগে ইং ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে কোলব্রুকের

A Grammar of Sanskrit Language প্রকাশিত হয়। উইলকিন্সও অনেক আগে থেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কোলব্রুক ও উইলকিন্স দুজনেই বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁরা উভয়েই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে নিরলস কর্মী ছিলেন। ভারতীয়দের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে যে বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল সেই বিতর্কে তাঁরা ওরিয়েন্টালিস্ট দলভূক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোলব্রুক ও উইলকিন্স সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

৪। Carey William, A Grammar of Sungskrit Language, Serampore - 1806, Preface III

৫। তদেব , Preface III

৬। "This ingenious invention is peculiar to them, though often perplexing to the students, yet when understood is of the general utility the rejection of a letter being equal to a grammatical rule".
তদেব, Preface V

৭। তদেব, Preface V

৮। গ্রন্থের আখ্যাপত্রেই কেরী বিভিন্ন ব্যাকরণের সাহায্য গ্রহণ স্বীকার করেছেন।

৯। তদেব, Praface IV

১০। তদেব, p. 2

১১। তদেব, Book I, Chapter II pp, 36-37

১২। তদেব, p. 133

১৩। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ব্যাপারে উইলিয়ম কেরীর একটি বিশেষ মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যত্র তিনি বলেছেন—"Among these is Moogdhabodha of Vopadeva, which large as it may appear to some, is confessedly one of the most concise epitomes of Sunguskrita grammar to be found in India.......together with its intrinsic value, induced the committee to make it a standing elementary work for the college."

১৪। উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের চতুষ্পাঠীগুলিতে কলাপ ব্যাকরণ, সৌপদ্মব্যাকরণ প্রভৃতি ব্যাকরণের পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল।

১৫। প্রাগুক্ত, Preface. IV

১৬। "বোপদেবের মতে দীর্ঘ ৣ কারেরও প্রয়োগ হইতে পারে।"
প্রবোধচন্দ্রিকা, প্রথম তরঙ্গ, তৃতীয় কুসুম।
মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, রঞ্জন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৪৬ পৃ-২২৮
জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বর্ণের লিখন পদ্ধতিতেও মৃত্যুঞ্জয় বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অনুসরণ করেছেন।

১৭। ".....Disquisitions upon the philosophy of grammar have been studiously avoided."
Carey W, প্রাগুক্ত, Praface V

১৮। "The Hindoo system being compounded with the European one in the fol-

lowing work, it is necessary to point out some of the differences between them and to say something of the method which has been observed."
Carey W, প্রাগুক্ত, Preface VI

১৯। তদেব, Preface VI

২০। প্রত্যাহার—প্রত্যাহার অর্থ সংক্ষিপ্ত করণ। সংস্কৃত ব্যাকরণে মাহেশ্বর সূত্রে (১) 'অইউণ্', (২) 'ঋ৯ক্', (৩) 'এওঙ্', (৪) 'ঐঔচ্' ইত্যাদি চোদ্দটি সূত্র আছে। সূত্রের কোন একটি বর্ণ থেকে সেই বা অন্য সূত্রের হলন্ত (হসন্ত) বর্ণ পর্যন্ত গ্রহণ করলে একটি প্রত্যাহার হয়, যেমন—'অচ্ প্রত্যাহার—অ থেকে চ্ পর্যন্ত বর্ণগুলি। হসন্ত বর্ণগুলি ব্যতীত অন্য মধ্যস্থবর্ণগুলি প্রত্যাহারে গৃহীত হয়।
ইৎ—কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, কিন্তু কার্যকালে থাকে না, তাকে ইৎ বলে।

২১। Carey W, প্রাগুক্ত , Preface V

২২। তদেব, Preface V
এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত কারিকা "সংহিতৈক পদে নিত্যা" ইত্যাদি স্মরণ করা যেতে পারে।

২৩। বাংলা ব্যাকরণে যদিও 'ক্ষ'কে পৃথক বর্ণরূপে গ্রহণ করা হত, কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালায় 'ক্ষ' কখনই পৃথক বর্ণ নয়। কেরী নিজেও তা জানতেন, তবু যে বর্ণমালায় 'ক্ষ' স্থান পেয়েছে তার কারণ বোধহয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রভাব। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থে ব্যাকরণের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন সেখানে বর্ণমালায় 'ক্ষ' কে স্থান দেওয়া হয়েছে।
এই প্রসঙ্গে মৎপ্রণীত 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও বাংলা বর্ণমালা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, 'শৈলী', বর্ষ-৩, সংখ্যা-১, ফেব্রুয়ারি-১৯৯৭, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২৪। Carey W, প্রাগুক্ত, p-4.
এই নিয়ম অবশ্য সব সময় রক্ষিত হয়নি। কেরী নিজে যদিও প্রায়শই সংস্কৃত শব্দটির লিপ্যন্তর করেছেন Sunugskrita তবু Sanskrita, Sanskrit ইত্যাদি বানানও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায়। ডঃ মার্শম্যান এবং রেভারেন্ড জন ওয়ার্ড সবসময় সংস্কৃত শব্দটির লিপ্যন্তরে কেরী প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেননি। এমন কি কেরীর নিজের গ্রন্থাদিতে ও চিঠিপত্রে সব সময় Sungskrita বানানের সমতা রক্ষিত হয়নি। অবশ্য এটি পরবর্তীকালের হস্তক্ষেপ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন চিঠিতে Sunguskrita শব্দটির বিভিন্ন বানান দ্রষ্টব্য।

২৫। নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী, মুগ্ধবোধ, কলকাতা, পৃ-১

২৬। Carey W, প্রাগুক্ত, p-35

২৭। তদেব , p-35

২৮। তদেব , pp-38-40

২৯। তদেব , p-52

৩০। তদেব , p-78

৩১। তদেব , p-79

৩২। তদেব , p-119
এই তালিকার আরও কিছু শব্দ 'যব-যবানী', হিম-হিমানী', মনু-মনায়ী ইত্যাদি। কেরী বলেছেন— "the following form of feminines in ঈপ্ but are irregular".

৩৩। তদেব , p-114

৩৪। তদেব , p-133

৩৫। তদেব , p-135

৩৬। ভূ to be
Purashmai Pudu
The first tense-কী or লট্
The second tense খী or বিধিলিঙ্
the third tense গী or লোট্
Carey W , প্রাগুক্ত, p-179

৩৭। তদেব , p-155

৩৮। তদেব , p-227

৩৯। তদেব , p-465

৪০। তদেব , p-489

৪১। তদেব , pp-569-570

৪২। কেরীর ব্যাকরণের প্রথম তিনটি খণ্ড শ্রীরামপুর মির্নভা প্রেস থেকে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
সজনীকান্তদাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫

৪৩। তদেব, পৃ-১১৫

৪৪। উইলিয়ম কেরীর বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে এবং পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে।

৪৫। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ—
A/GRAMMAR/OF THE/SANSKRIT LANGUAGE/BY/H.T.COLEBROOKE ESQ/VOL I/CALCUTTA/PRINTED AT THE HONARABLE COMPANY'S PRESS/1805.

৪৬। Colebrooke. H.T., A Grammar of the Sanskrit Language
vol I, Calcutta, 1805, p-37

৪৭। তদেব , p-161

৪৮। তদেব , p-200

৪৯। Carey Eustace, প্রাগুক্ত, p-591

৫০। Colebrooke H.T, Miscellaneous Essays. Vol-II, London, 1837,
pp, 40-49
কোলব্রুকের ব্যাকরণের ভূমিকাটি উক্ত গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়। মূল গ্রন্থে ভূমিকাংশ খণ্ডিত।

৫১। ধাতুরূপের প্রসঙ্গে কোলব্রুক দন্ত্যবর্ণান্ত ধাতু, তালব্যবর্ণান্ত ধাতু, উদাত্ত স্বরযুক্ত, স্বরিৎ

স্বরযুক্ত এই ভাবে ধাতুর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করে বিষয়টি জটিল করে তুলেছেন। বিশেষত mute vowels শব্দটি বিভ্রান্তিকর। mute সাধারণত অঘোষ ব্যঞ্জনবর্ণকে বুঝায়।

৫২। কোলব্রুকের গ্রন্থে ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত ধাতু ও ক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা। উইলকিন্সের গ্রন্থে পঞ্চম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত, পৃষ্ঠা সংখ্যা 108 থেকে 611 পর্যন্ত।

কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণে সমগ্র তৃতীয় খণ্ড ব্যাপী ধাতু ও ক্রিয়ার আলোচনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-131 থেকে 556 পর্যন্ত।

৫৩। ইউসটেস কেরীর প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। p-591

৫৪। চালর্স উইলকিন্সের ব্যাকরণ গ্রন্থের আখ্যাপত্র—A/ GRAMMAR OF THE/ SANSKRITA LANGUAGE/BY CHARLES WILKINS L.L.D, F.R.S./LONDON/1808.

আখ্যাপত্রটি দীর্ঘ হওয়ায় কেবল প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হল।

উইলকিন্স একটি সংস্কৃতশ্লোকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিজের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন—

"অযুক্তং যদি হ প্রোক্তং প্রমাদেন ভ্রমেণ বা।
বাচা ময়া দয়াবন্তঃ সন্তঃ সংশোধয়ন্তু তৎ।।"

৫৬। দেশীয় ভাষা না জানার জন্য কটকের রেসিডেন্ট মি. ব্রিস্টো পদচ্যুত হন।

সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০

৫৭। "......it may contain that in the existing literature of BHARATVARSHA they will find ample reward for the labour for its acquisition. The lover of science the antiquiery the historian, the moralists, the poet and man of taste, will obtain in Sanskrit books an inexhaustible fund of information and amusement." এই প্রসঙ্গে উইলকিন্স বেদ ছাড়াও জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত, বিভিন্ন দর্শন, নীতিশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, অলঙ্কারশাস্ত্র, সঙ্গীত শাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।

Wilkins C, প্রাগুক্ত, Praface X

৫৮। তদেব , preface X

৫৯। তদেব , preface IX

৬০। বড়লাট্ লর্ড ওয়েলেসলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের সঙ্গে কোন পরামর্শ ব্যতিরেকেই নিজের দায়িত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর থেকেই কোম্পানির ডিরেক্টরদের সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলির এব্যাপারে মতান্তর ও মনান্তর দেখা দেয়। অবশেষে কোম্পানি লন্ডন সহরের উপকণ্ঠে হর্টফোর্ডে কোম্পানির সিভিলিয়ানদের ট্রেনিং-এর জন্য হেলিবেরি কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজের ছাত্রদের প্রয়োজনেই উইলকিন্স তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন।

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে (পঞ্চম খণ্ড) এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

রোবাক এর Annals of Fort William College গ্রন্থেও এ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

৬১। Wilkins. C , প্রাগুক্ত, p-I

৬২। তদেব , p-35

৬৩। তদেব , p-625

৬৪। তদেব , p-612

৬৫। চার্লস উইলকিন্স প্রথম মুদ্রণের উপযোগী বাংলা হরফ প্রস্তুত করেন। হ্যালহেডের গ্রন্থের বাংলা হরফগুলি প্রস্তুতের কাজে তিনি সাহায্য করেন।

৬৬। Wilkins C , প্রাগুক্ত, preface-XI

৬৭। ৫১ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬৮। Smith George , Life of William Carey.
উক্ত গ্রন্থের ১৫৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা থেকে উদ্ধৃত।

(খ) অপ্রকাশিত সংস্কৃত অভিধান।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগস্টমাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৮০১ সালের ১লা এপ্রিল উইলিয়ম কেরী বাংলাবিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। দুমাস পরে তিনি সংস্কৃতশিক্ষকের পদেও নিযুক্ত হন[১]। পরে বাংলা ও সংস্কৃত উভয় বিভাগের দায়িত্বই কেরীর উপর ন্যস্ত হয়েছিল। তিনি মারাঠি ভাষারও শিক্ষক ছিলেন।

কেরী যখন উত্তবঙ্গের মদনাবাটিতে নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক তখনই তিনি বাংলা ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতভাষাও শিখতে আরম্ভ করেন। ১৭৯৭ সনেই তিনি নিজের প্রয়োজনে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় ও অভিধান সংকলনে ব্রতী হন।[২] কেরী অনুভব করেছিলেন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় সহায়তার জন্য একটি অভিধান সংকলন বিশেষ প্রয়োজন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের পর তাঁর এই ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাত্রদের প্রয়োজন রূপেও দেখা দেয়।

পুঁথির বিবরণ ঃ

কেরীর সংকলিত সংস্কৃত অভিধান প্রকাশনার সুযোগ লাভ করেনি। তবে শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরিতে সংস্কৃত অভিধানের যে পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত আছে, অনুমান করা হয় সেটি কেরীর সংকলিত অভিধান। এই অভিধানটি ছয়টি খণ্ডে সংকলিত। পুঁথির মাপ দৈর্ঘ্যে আঠারো ইঞ্চি , প্রস্থে দশ ইঞ্চি । প্রতিটি খণ্ডের গভীরতার মাপ পৃথক পৃথক। প্রথম খণ্ডটির গভীরতা দেড় ইঞ্চি , অন্যান্য খণ্ড গুলির গভীরতার মাপ তিন ইঞ্চি থেকে পাঁচ ইঞ্চির মধ্যে। শ্রীরামপুর মিশনে প্রস্তুত কাগজে পুঁথিগুলি রচিত। কাগজের রঙ হলদেটে, এটি পুরানো কাগজের হলদেটে ভাব নয়, এটিই কাগজের আসল রঙ। পাণ্ডুলিপিগুলি সংস্কৃত ভাষায় বাংলা অক্ষরে লেখা এবং লিপিকর কোন এক ব্যক্তি নন, অক্ষরের ধাঁচ একাধিক লিপিকরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কালির রঙও বিভিন্ন। পুঁথির বাঁধাই বই-এর মতো, পরবর্তী কালে আলগা পাতাগুলি পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়েছে।[২ক]

পাণ্ডুলিপির প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা দুশ'উনিশ। পৃষ্ঠার দুপিঠ গণনা করা হয়নি, অর্থাৎ পৃষ্ঠার দুপিঠ একত্রে একটি পাতা। প্রথম খণ্ডটিতে সংকলিত শব্দের তালিকা। দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা দুশ'তেরো। দ্বিতীয় খণ্ডে অকার আদিতে আছে যে সব শব্দের সেই সব শব্দই সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম শব্দ 'অংশ' এবং শেষ শব্দ 'অহ্নায়'। তৃতীয় খণ্ডের শুরু আকার থেকে, প্রথম শব্দ 'আগ্রহায়ণ', শেষ শব্দ 'খিঙ্খির'। খণ্ডটির পৃষ্ঠা সংখ্যা চারশ'ছিয়াশি। চতুর্থ খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা পাঁচশ' একাত্তর; প্রথম শব্দ 'গঙ্গা' এবং শেষ শব্দ 'ন্যঞ্চিত'। পঞ্চম খণ্ডের আরম্ভ 'পক্ষাণু' শব্দে এবং শেষ 'রৌহিষ' শব্দে। খণ্ডটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয়শ'ছেচল্লিশ। ষষ্ঠ বা প্রাপ্ত শেষ খণ্ডটির প্রথম শব্দ 'লক্ষ্মী' এবং শেষ শব্দ 'হ্লীকু', পৃষ্ঠা সংখ্যা সাতশ'বাহান্ন। পাণ্ডুলিপিটির ছয়টি খণ্ডে কোথাও সংকলক, লিপিকর ইত্যাদির নাম, তারিখ ইত্যাদি কিছুই নেই। প্রথম খণ্ডের তালিকাও সর্বাংশে অনুসৃত হয়নি, যেমন—তালিকার প্রথম শব্দ 'অ' কিন্তু অভিধানটির যথার্থ প্রারম্ভ হয়েছে 'অংশ' শব্দে। তেমনই তালিকায় শেষ শব্দ 'হৃদ্য', কিন্তু খণ্ডের যথার্থ শেষ শব্দ 'হ্লীকু'। সাধারণ পুঁথির মতো এই পুঁথিতে কোন পুষ্পিকা নেই।

ডঃ সুশীল দে তাঁর উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থে এই অপ্রকাশিত সংস্কৃত অভিধানটির কোন উল্লেখ করেননি। তাঁর গ্রন্থটি যদিও সম্পূর্ণভাবেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তবু ডঃ দে প্রসঙ্গক্রমে কেরীর সংস্কৃত জ্ঞান ও সংস্কৃত প্রীতির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সংস্কৃত অভিধানটির উল্লেখ করেননি। সজনীকান্ত দাস কিন্তু কেরীর সংস্কৃত অভিধানের উল্লেখ করেছেন।[৩]

গ্রন্থকর্তৃত্ব ঃ

১৮০১ সনের ১৮ই জুন কেরী ডঃ রাইল্যান্ডকে একটি পত্রে লিখেছেন— "I am appointed teacher of Sungskrit Language, and though no students have yet entered in that class, yet I must prepare for it. I am therefore, writing a grammar of that language which I must also print, if I should be able to get through it, and perhaps a dictionary which I began some years ago."[৪] কেরীর বিভিন্ন জীবনীকারের মতে 'some years ago' এখানে ১৭৯৭-১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দকেই নির্দেশ করে।

১৮০২ সনের ১৭ই মার্চ কেরী মিঃ সাটক্লিফকে একটি চিঠিতে লেখেন "An idea....has induced me among other things, to write a Sungskrit grammar and begin a dictionary of that language.[৫]

যদিও ১৮০২ সনে কেরী লিখেছেন একটি সংস্কৃত অভিধান সংকলনের কাজ তিনি আরম্ভ করবেন, কিন্তু ১৮০১ সনে ডঃ রাইল্যান্ডকে লিখিত চিঠি থেকে জানা

যায় যে কয়েকবছর আগে থেকেই অভিধান সংকলনের কাজ তিনি আরম্ভ করেছেন। অবশ্য মদনাবাটিতে নিজের প্রয়োজনে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা ও অভিধান সংকলনের যে সূচনা হয়, পরবর্তী কালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায়, সেই কাজ সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়, কারণ ১৮১২ খিস্টাব্দে মিঃ সাটক্লিফকে লিখিত চিঠি থেকে জানা যায় অধ্যাপক কোলব্রুক যে সংস্কৃত অভিধান সম্পাদনা করেছেন[৬] তার প্রুফ সংশোধন করেছেন কেরী স্বয়ং। সংস্কৃত অভিধান সংকলনের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও ব্যুৎপত্তি না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই কোলব্রুকের গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব নিতেন না। শ্রীরামপুরমিশনের পরিচালকবর্গের অন্যতম জোশুয়া মার্শম্যান যদিও বাল্মীকির রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদে কেরীকে সাহায্য করেছিলেন, তবু সংস্কৃত অপেক্ষা চিনা ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বেশি।[৭] উইলিয়ম ওয়ার্ড যদিও হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দুদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে চার খণ্ডে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তথাপি তাঁর সংস্কৃতজ্ঞান উল্লেখযোগ্য ছিল না। বস্তুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাহায্যেই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন।[৮] শ্রীরামপুর মিশনের অপর বিদ্যোৎসাহী ফেলিক্স কেরী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় তাঁর প্রবণতা ছিল বেশি, সংস্কৃত অভিধান সংকলনে নয়, যদিও সংস্কৃতভাষায় তিনি পণ্ডিত ছিলেন।[৯] এদিক থেকে মনে করা যেতে পারে যে উইলিয়ম কেরীই ঐ অপ্রকাশিত অভিধানের সংকলক।

উইলিয়ম কেরীর গ্রন্থকর্তৃত্বের স্বপক্ষে কিছু পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায়। সকলেই জানেন কেরী উদ্ভিদ্ বিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন, বরং বলা যায় এ ব্যাপারে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল।[১০] কেরীর এই উদ্ভিদ্ প্রীতি আলোচ্য অভিধানেও সুপরিস্ফুট। অভিধানটিতে বহু বৃক্ষ-লতা-কুসুমের নাম সংকলিত হয়েছে। নিম্নে এই সব বৃক্ষলতাদির নামের কিছু পরিচয় প্রদত্ত হল— (১) অঙ্কোট পুং নিকোচ বৃক্ষে (২) গ্রাহিণ্ পুং কপিত্থ বৃক্ষে;(৩) গজচিভন্টা স্ত্রী গোরক নাড়ু ইতি খ্যাত বৃক্ষে; (৪) গণেরু পুং কন্তির্কার বৃক্ষে; (৫) গণ্ডকারী স্ত্রী খইরী ইতি বৃক্ষে; (৬) চিতা স্ত্রী এরন্ড ইতি বৃক্ষে; (৭) চিঞ্চা স্ত্রী তিন্তিড়ী বৃক্ষে; (৮) চিত্রপত্রিকা স্ত্রী কপিত্থাকীতিখ্যাত বৃক্ষে; (৯) চিহ্নধারিণী স্ত্রী শ্যামালতায়াং; (১০) চুচূ পুং সুসুনীতিখ্যাত শাকভেদে; (১১) পঙ্কার পুং শৈবালে; (১২) পঙ্কোরুহং নপুং তামরসং; (১৩) বদর নপুং শেয়াকুল ইতিখ্যাতে; (১৪) বরাহকান্তা স্ত্রী বারাহী বৃক্ষে; (১৫) বরাহকানী পুং সূর্যমনীতিখ্যাতে বৃক্ষে; (১৬) বরাহক্রান্তী স্ত্রী নাগান্ধ ইতিখ্যাত বৃক্ষে; (১৭) বহুগ্রন্থি পুং ঝাউ ইতি খ্যাতে; (১৮) বহুত্বকক পুং ভূর্জে; (১৯) বহুদুগ্ধিকা স্ত্রী সুহী বৃক্ষে; (২০) বহুপত্র পুং ছাতিনা বৃক্ষে; (২১) বহুপত্রী পুং শতমূল্যাং; (২২) বহুফণ পুং নীপে; (২৩) বহুমন পুং নশীশাক ইতি খ্যাতবৃক্ষে; (২৪) মধুমন্তী স্ত্রী মালত্যাং; (২৫) মধু পুং অশোকে; (২৬) মণিকা স্ত্রী শেফালিকায়াং; (২৭)

ম্লেচ্ছকন্দ পুং লশুনে; (২৮) যন্ত্রগানে পুং মটর ইতি শস্যে; (২৯) যুগ্মপত্র পুং রক্তকাঞ্চনে; (৩০) যুগ্ম পত্রিকা স্ত্রী শিংশপা বৃক্ষে; (৩১) যোজনপর্ণী স্ত্রী মঞ্জিষ্ঠায়াং (৩২) রক্তঘ্নী স্ত্রী গাঁঠিয়া দুর্ব্বা ইতি খ্যাতে, (৩৩) রক্তপদী স্ত্রী খইরীতিখ্যাত বৃক্ষে; (৩৪) রক্তপুষ্প পুং করবীরে; (৩৫) রক্তপুষ্পকে রোহিনীতিখ্যাত বৃক্ষে পলাশে; (৩৬) রক্তপুষ্পা স্ত্রী শাল্মল্যাং, (৩৭) রক্তপুষ্পা স্ত্রী পাটলিবৃক্ষে; (৩৮) রক্তফল পুং বট বৃক্ষে; (৩৯) রোহিত পুং রৌহিতক বৃক্ষে; (৪০) বন্দ্যা স্ত্রী পরগাছা ইতি খ্যাতে , (৪১) বর্ণিনী স্ত্রী হরিদ্রায়াং (৪২) শাক নপুং বৃক্ষ ভেদে; (৪৩) ষট্পদাতিথি পুং-আম্রে ইত্যাদি। এই অভিধানে আরও অনেক বৃক্ষলতাদির নাম পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই তালিকা উদ্ভিদ্ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য প্রস্তুত হয়নি; গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ থেকে ইতস্তত সংকলিত হয়েছে। অমরকোষ প্রভৃতি কোষ গ্রন্থে 'বনৌষধিবর্গে' উদ্ভিদ্ জগতের বহুশব্দ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু এই অভিধানে সংকলক আমাদের একান্ত পরিচিত আঁকোর, শেয়াকুল, নাটে শাক, হাতি শুঁড়, পরগাছা, ঘাস, জবাফুল, কাঞ্চন ফুল ইত্যাদির নাম উল্লেখ করেছেন এবং সবই সংস্কৃত শব্দের অর্থের প্রসঙ্গে। এই সমস্ত দেশী গাছ গাছড়ার নামের প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর নাম স্বতই আমাদের মনে আসে। উদ্ভিদ্তত্ত্ববিদ্ প্রকৃতি প্রেমিক কেরীই যে এই অভিধান সংকলনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এই তালিকার সাহায্যে আমরা শুধু সেই কথাই স্মরণ করতে চাই।

উইলিয়ম কেরীর অন্যতম পরিচয় ছিল, তিনি বহুভাষাবিদ্। তিনি যে সব ভাষা জানতেন তার মধ্যে আবার সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ প্রীতি ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন বাংলা ভাষা তাঁর প্রায় মাতৃভাষা সদৃশ। বাংলা চলিত ভাষার প্রতি তাঁর একধরনের প্রীতি ছিল। কথোপকথন বা Dialouge এর সংকলনের মধ্যেই তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।[১১]

বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি এই প্রীতি আলোচ্য অভিধানেও বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে, বহু দেশীশব্দ সংস্কৃত শব্দের অর্থরূপে সংকলিত হয়েছে। সেই শব্দাবলীর মধ্যে যেমন আছে গাছপালার দেশীনাম, তেমনই আছে নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্রের নাম। দেশজ গাছপালা এবং চলিত ভাষার প্রতি এই প্রীতি থেকে অনুমান করা যায় যে উইলিয়ম কেরীই এই সংস্কৃত অভিধান সংকলনের প্রধান উদ্যোগী পুরুষ।

এই অভিধানে শব্দরত্নাবলী নামে একটি কোষগ্রন্থ প্রায়ই উদ্ধৃত হয়েছে। কোষগ্রন্থটির সংকলক জনৈক মথুরেশ এবং যে পুঁথিটি অবলম্বনে গ্রন্থটি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়[১২] তার লিপিকাল ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ। পুঁথিটি উত্তর বঙ্গে পাওয়া যায় এবং সেটি বহুল প্রচলিত ছিল।[১৩] উত্তরবঙ্গে বাসকালেই কেরী গ্রন্থটির সংস্পর্শে এসেছিলেন মনে হয়। ঐ সময়েই তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা ও অভিধান সংকলনের প্রস্তুতি পর্ব।

সাধারণত সংস্কৃতগ্রন্থের প্রারম্ভে নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি কামনায় মঙ্গলাচরণ করা হয়। আলোচ্য অভিধানটিতে কোন মঙ্গলশ্লোক নেই। সবদিক থেকে বিবেচনা করে মনে হয় সংস্কৃত অভিধানটির সংকলনে উইলিয়ম কেরীই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

ভারতবর্ষে অভিধান বা কোষগ্রন্থ সংকলনের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। পণ্ডিতেরা মনে করেন যাস্কের নিরুক্তেই প্রাচীন ভারতের কোষগ্রন্থের সূচনা, যদিও পরবর্তীকালে কোষগ্রন্থগুলির চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতের যুগে কোষগ্রন্থগুলিতে পূর্বতন কোষ গ্রন্থগুলির তুলনায় নানাক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং সেটিই স্বাভাবিক।[১৪] কোষগ্রন্থগুলির বিন্যাস সাধারণত বিষয়ানুযায়ী; একটি শব্দের নানা প্রতিশব্দ এখানে সংগৃহীত হয়েছে। অবশ্য বিখ্যাত কোষগ্রন্থগুলিতে একই শব্দের নানা অর্থও সংগৃহীত হত। ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে কোষগ্রন্থগুলি প্রায়ই আর্যা বা শ্লোকছন্দে রচিত।[১৫]

অভিধানটির বৈশিষ্ট্য

আলোচ্য অভিধানটি কিন্তু বিষয়ানুক্রমিক নয়, বর্ণানুক্রমিক এবং এটি গদ্যে রচিত। অভিধানটির প্রথম খণ্ডে আলোচিতব্য শব্দের একটি তালিকা আছে। প্রতিটি পৃষ্ঠায় দুটি স্তম্ভ এবং প্রতিটি স্তম্ভে গড়ে আঠাশটি শব্দ। তালিকার প্রথম শব্দ 'অ', পরে 'অংশ' 'অংশক', 'অংশুক' ইত্যাদি ক্রমে তালিকা রচিত হয়েছে। 'অবসেমিক' 'উদ্ধরপিশাচ' ইত্যাদি শব্দও এই তালিকায় স্থান পেয়েছে, যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষাতেও ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়। এই তালিকার শেষ শব্দ 'হৃদ্য', কিন্তু প্রাপ্ত শেষ খণ্ডের শেষ শব্দ 'হ্লীকু'। অবশ্য পুঁথিতে অতিরিক্তি কয়েকটি পৃষ্ঠা গ্রথিত আছে, মনে হয় পরবর্তী শব্দগুলি সংযোজনের জন্য এই পৃষ্ঠাগুলি সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু কোন কারণে শব্দ সংযোজন সম্ভব হয়নি।

যদিও প্রথম খণ্ডের তালিকায় প্রথম শব্দ 'অ' কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভিক শব্দটি 'অংশ'। এই অভিধানে প্রথমে শব্দটির প্রকৃতিপ্রত্যয় ও লিঙ্গ নির্ণীত হয়েছে। বিভিন্ন কোষ গ্রন্থ থেকে শব্দটি সম্পর্কিত তথ্যাদি আহরণ ও উৎকলিত হয়েছে। এই ভাবে প্রথমে শব্দটির আলোচনা পরে অর্থ নিরূপিত হয়েছে। নিম্নলিখিত উদাহরণেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে—"অংশয়তি বিভাজয়তি পচাদিত্বাচ্ অংশাংসত করিভোজনে ইতি বোপদেবীয় কবিকল্পদ্রুমে দ্বিধাদর্শনাৎ তালব্যবানদন্ত্যবানপি স্কন্ধ পর্য্যায়ে তালব্যান্তস্যপ্যংশ-শব্দস্যামরটীকায়াং বিদ্যাবিনোদিতি লিখিতত্বাত। বিভাগঃ ভাগবন্টকাঃ। ভক্তিরংশ ইতি ভাগপর্য্যায়ে জটাধরঃ। সমাংশহারিণীমাতা পুত্রাংশাস্যান্মৃতে পতৌ বিভজেয়ুর্যথাংশতঃ সত্রাবাংশস্তু সর্ব্বেষামিত্যাদি স্মৃতয়ঃ

অংশ পুং ভাগে
ক্বচিৎ স্কন্ধে চ”

এখানে কবিকল্পদ্রুম, অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থের ও জটাধর নামে অভিধানকারের উল্লেখ করা হয়েছে। বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত হয়েছে স্মৃতির বিধান। আরও বলা হয়েছে। দন্ত্য সকার যুক্ত 'অংস' শব্দের অর্থ স্কন্ধ, তথাপি কখন কখনও 'স্কন্ধ' অর্থে 'অংশ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'হস্' (্) চিহ্ন যথাযথ স্থানে প্রযুক্ত হয়নি।

এই অভিধানে শব্দের অর্থনির্ধারণে বিভিন্ন কোষ গ্রন্থের সঙ্গে কখনও কখনও কালিদাস, মাঘ প্রভৃতি কবির কাব্যাংশ উদ্ধৃত হয়েছে, যেমন 'অংশুক' শব্দে—'অংশূন্ তন্তুন কায়ন্তীত্যংশুকং আদ্যান্তাত ডঃ। অংশুকং তালব্যশকারবৎ বস্ত্রমাচ্ছাদনং বাসাশ্চেনং বসনমংসুকমিত্যরঃ অংশুকং সূক্ষ্মবস্ত্রে বস্ত্রমাত্রোত্তরীয়য়োবিতিশ্চ মেদিন্যৌ রক্তাংসূকানবরবধুরিব ভাতি ভূমিরিতি কালিদাস ঃ

অংশুক নবস্ত্রে সূক্ষ্ম বস্ত্রে
উত্তরীয় বস্ত্রে চ”

এখানে মেদিনী ও অমরকোষ এই দুই কোষগ্রন্থের এবং কালিদাসের কাব্যাংশের উল্লেখ করা হয়েছে।

মাঘের কাব্যের অংশুমালী শব্দটির প্রয়োগ অভিধানটিতে যথাযথ স্থানে নির্দেশ করা হয়েছে—“অংশুনাং কিরণানাং মালা বিদ্যতে তস্য সহস্র-কিরণত্বাত অংশুমনী অংশুমানং পুমানীতি সূর্য্য পর্য্যায়ে ত্রিকাণ্ডশেষঃ। অংশুপদং তৎ পর্য্যায়কিরণা-দিপদানামুপলক্ষণং। খগপতঙ্গবিয়ন্মনি ভানবো হবি ভগেমিদব্যক্রবাদয়ঃ। কিরণমালি বিরোচনহেনয়োদিনমণি প্রণীতিরিতি হারাবলী। ব্রজতি বিষয়মক্ষ্ম্যাংশুমালীয় যাবত্তিমির-মখিলস্তং তারাদেবারুণেন পরপরিভাবি তেজস্তু এতাংশুকন্দর্ত্তুং প্রভবতি হরিপক্ষোচ্ছদমগ্রে সাহঽ পীতি একাদশসর্গে মাঘাঃ চরমাচলচূড়াবলম্বিনি ভগবতে মরীচি মালিনীতি হিতোপদেশঃ।

অংশুমালিন্ পুং সূর্য্যে।”

অংশটি লিপিকর প্রমাদে কন্টকিত। এতবেশি লিপিকর প্রমাদ সাধারণত দেখা যায় না।

অভিধানে 'অকালজলদোদয়' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদও স্থানলাভ করেছে, “অকালজলদোদয় ইতি অকালে হেমন্তাদৌ জলদানাং মেঘানমিব উদয়ো যত মধ্যস্থস্যেবশব্দস্য লোপঃ দিনাং শুকং রাত্রিজনং খবাষ্পকুহেলিকা কুহেডী কুজ্ঝটিকা-প্যকালজলদোদয় ইতি কুজ্ঝাটী পর্য্যায়ে শব্দমালা যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধু মদং ন সঃ যত্রহিমমৎতুহিনদুর্দ্দিনং কুজ্ঝাটির্ধূমমহিষীতান্দ্রী চ কুহেলি হি হিমজালং কুহেলিকা-মাঘটীকাধৃত কোষাদিতশ্চান্যোপিহজ্ঞ পর্য্যায় অবগন্তব্যাঃ জলদোদয়বৎ

অকালমেঘোদয়াপি শব্দা অপ্যত্রৈব হিমজালাদিশ্চ নীহারজালাদি শব্দা অপি পর্য্যায়ে ভবন্তি। নীহারজালমালিনা পুনরুক্তসান্দ্রাঃ কুর্ব্বন্ বধূজনাবলোকনপক্ষ্মমালা ইতি মাঘঃ

অকালজলদোদয় পুং কুজ্ঝটিকায়াং

অকালমেঘানামুদয়ঃ।”

এখানে প্রথমে সমাসটি বিভাগ করে অর্থবিন্যাস করা হয়েছে, তবে সমাসটির নাম উল্লেখ করা হয়নি, পর্যায় শব্দগুলি বলা হয়েছে, কালিদাসের রঘুবংশকাব্যের চতুর্থসর্গের শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হয়েছে—“যবনী মুখপদ্মানাং’, ইত্যাদি, কিন্তু শ্লোকের অন্তর্গত ‘অকালজলদোদয়ঃ’ শব্দটি বাদ গেছে, কালিদাসের নামও উল্লেখ করা হয়নি। মাঘকবির কাব্য থেকে উদ্ধৃতি আছে, ‘অকালমেঘোদয়ঃ’ ইত্যাদি সমপর্যায়ের শব্দের দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়েছে।

কেরী তাঁর বাংলা-ইংরেজি অভিধানে যেমন প্রচুর সমাসবদ্ধ পদ সংকলন করেছেন, সেই প্রবণতা এই অভিধানেও লক্ষ্য করা যায়। ‘বহু’ শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ পদ পাওয়া যায় আটত্রিশটি, ‘মধু’ শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ পদ পুরো নয়টি পৃষ্ঠা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ‘রক্ত’ শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যাও কম নয়।

অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ডে আদ্য অকার যুক্ত পদই সংকলিত হয়েছে। কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধানেও এই প্রবণতা দেখা যায়। বাংলা ইংরেজি অভিধানের প্রথম খণ্ডটিতে আদ্য স্বরবর্ণ যুক্ত শব্দই স্থান পেয়েছে। ১৮১১ সনে ডাঃ রাইল্যান্ডকে লিখিত একটি পত্রে কেরী জানান বাংলা ভাষায় আদ্য অকার যুক্ত শব্দ অনেক বেশি, সংস্কৃত অভিধানে যে সেই সংখ্যা অধিকতর হবে সেটাই স্বাভাবিক। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম শব্দ ‘আগ্রহায়ণ’। “আগ্রহায়ণ পুং মার্গশীর্ষে আগ্রহায়নীক পুং মার্গশীর্ষে”। ‘আগ্রহায়ণ’ শব্দটি যে নিপাতনে সিদ্ধ এবং ‘আগ্রহায়নীক’ শব্দে স্বার্থে ক প্রত্যয় হয়েছে, এই ব্যাকরণগত তথ্যও পরিবেষিত হয়েছে। বক্তব্যের সমর্থনে অমরকোষ ও কোষগ্রন্থ শব্দমালা উৎকলিত হয়েছে, অমরকোষের একটি টীকার উল্লেখও দেখা যায়।

তৃতীয় খণ্ডে বিভিন্ন স্বরবর্ণ এবং আদি ক কারযুক্ত শব্দ যোজিত হয়েছে। আদি খকার যুক্ত শব্দে খণ্ডটির পরিসমাপ্তি। শেষ শব্দ ‘খিঙ্খির’—“খিঙ্খি ইতি রায়তে খিঙ্খির। রৈশব্দোঽস্মাদান্তা ডঃ। খিঙ্খি বস্ত্র শিবাভেদে খট্টাঙ্গে বারিবারকে ইতি মেদিনী।

“খিঙ্খির পুং শিবাভেদে খট্টাঙ্গে বারিবারকে চ”

এই খণ্ডে প্রতিটি পৃষ্ঠায় গড়ে পাঁচটি শব্দ আছে।

চতুর্থ খণ্ডের আরম্ভ ‘গঙ্গা’ শব্দে—“প্রজা পালনায় গাং পৃথ্বিং গতাগঙ্গাগমাদিত্বাত্ ডঃ পৃষোদরাদিত্বাত্ হ্রস্বঃ। গঙ্গা বিষ্ণুপদী জহ্নুতনয়া সুরনিম্নগা ইতি অমরঃ।

“গঙ্গা স্ত্রী স্বনামখ্যাত নদ্যাং”।

এই খণ্ডের শেষ শব্দ ‘ন্যঞ্চিত’—“নচ্ নীচে অঞ্চিতং ক্ষিপ্তং ন্যঞ্চিতং

ন্যচশব্দোপদেশাত্ অন্যগতি পূজনীয়োরিত্যস্মাত্ ক্ত প্রত্যয়ঃ। ন্যঞ্চিতং স্যাদধঃক্ষিপ্তমিতি জটাধরঃ।

ন্যঞ্চিত বাচ্যলিঙ্গ অধঃক্ষিপ্তে।"

পঞ্চম খণ্ডের প্রারম্ভিক শব্দ 'পক্ষাণু'—"যথেষ্ঠচারংথাভূমি পক্ষাণু পক্ষবাহন ইতি শব্দচন্দ্রিকা

পক্ষাণু পুং পক্ষিণি"

'রৌহিষ' শব্দে খণ্ডের সমাপ্তি—"রৌহিষং তৃণমত্তীতি রৌহিষঃ ইতি ভরতঃ। রোহতি ইতি রৌহিষং। রুহৌ জল্যামিত্যস্মাৎ সততং স্বার্থে ষ্ণঃ রৌহিষংক তৃণে ক্লীবং পুংসি স্যাৎ হরিণান্তরে ইতি মেদিনী রৌহিষ লোহিততৃণে মৃগমতস্যবিষয়ো বিশেষয়োরিত্য জয়পালঃ

রৌহিষ ন গন্ধতৃণে। পুং হরিণভেদে মৎস্যবিশেষে চ।"

ষষ্ঠ বা প্রাপ্ত শেষখণ্ডে র প্রারম্ভিক শব্দ 'লক্ষ্মী'। "লক্ষয়তি নীতিশালিনং লক্ষতে অনয়া ইতি বা লক্ষ্মীঃ। লক্ষাং দর্শনে ইত্যস্মাত্ নাম্নীতিমীঃ অজিবন্তত্বাৎ নসিলোপঃ। লক্ষ্মী পদ্মালয়া পদ্মা কমলা, শ্রী হরিপ্রিয়া ইত্যমরঃ। সম্পত্তিঃ শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ ইত্যমরজটাধরৌ। লক্ষ্মী সম্পত্তিঃ শোভয়োরিতি। ঋদ্ধৌ বুধে চ বৃদ্ধানামৌষধেঽপি চ ফণিন্যাং স্ত্রী মেদিনী।

লক্ষ্মী স্ত্রী শ্রিয়াং সম্পত্তৌ শোভায়াং
ঋদ্ধৌষধে বৃদ্ধানাম্ ঔষধে বীরভার্য্যায়াং ফণিন্যাঞ্চ।"

'হ্লীকু' শব্দে খণ্ডে র সমাপ্তি। "হ্রীণ লজ্জে ইত্যস্মাৎ উণাদিক কু প্রত্যয়ে রেফস্য বানত্বে হ্লীকুঃ হ্রীকু হ্রীকুঃ সলজ্জেস্যাৎ জত্তকত্রপুণোবপীতি উণাদিকোষঃ।

"হ্লীকু বাচ্যলিঙ্গ লজ্জিতে জত্তনি ত্রপুণি চ।"

অভিধানটিতে একদিকে যেমন শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয়ের দ্বারা অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে ও বহুগ্রন্থাদির সাহায্যে বক্তব্যকে সমর্থন করা হয়েছে তেমনি খুব সংক্ষেপেও শব্দার্থ বিন্যস্ত হয়েছে, যেমন 'লিক্ষা' শব্দ, "লিক্কালিকক্ষা চ লীক্ষা চ লীক্কা চ নিক্ষিত্যেপীতি পদরত্নাবলী—

লিক্ষা স্ত্রী কীটভেদে"

এখানে শব্দটির কয়েকটি মাত্র প্রতিশব্দ উপস্থাপিত হয়েছে। 'জলযন্ত্রগৃহ' শব্দটির প্রত্যক্ষভাবে কোন অর্থ উপস্থাপিত করা হয়নি, বরং বর্ণনা করা হয়েছে, "জলযন্ত্রগৃহং ধীরৈঃ সমুদ্রগৃহমুচ্যতে ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।" অভিধানের প্রতিটি শব্দ উল্লেখ করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই।

এই সংস্কৃত অভিধানের পাণ্ডুলিপির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে Six Laws for Palmleaf Manuscript নামক প্রবন্ধে

পাণ্ডুলিপির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে।[১৬] আমাদের আলোচ্য পাণ্ডু লিপিটি যদিও তালপাতায় লিখিত নয়, তবু ঐ সব বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু এই পাণ্ডু লিপিতেও বর্তমান। প্রথমত এই পাণ্ডু লিপিতে প্রচুর লিপিকর প্রমাদ লক্ষ্য করা যায়। প্রায়ই নকার ও লকারের এবং বকার ও র কারের স্থান পরিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ নকার স্থলে লকার এবং লকার স্থলে নকার লিখিত হয়েছে। একইভাবে রকারের স্থানে বকার এবং বকারের স্থানে রকার লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গ অনুসরণ করে সঠিক বর্ণটি নির্ণয় করতে হয়। এটি ঠিক লিপিকর প্রমাদ নাও হতে পারে, হয়তো পুঁথি যাঁরা প্রতিলিপি করতেন তাঁরা এইভাবেই লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। হস্ (্) চিহ্ন প্রায়ই লুপ্ত[১৭] ; কিন্তু সবচেয়ে পীড়াদায়ক অনুস্বরের যথেচ্ছ ব্যবহার। বাক্যের শেষ অক্ষর রূপে অনুস্বর ব্যবহৃত হয়েছে যদিও সেখানে 'ম্' ই প্রত্যাশিত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই লিপিকর প্রমাদ যে কত ব্যাপক তার পরিচয় পাওয়া যাবে, যেমন অংশুক শব্দটির ক্ষেত্রে। অংশুক শব্দের অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে—"অংশূন তন্তুন কায়ন্তীত্যংশুকং আদান্তাতডঃ অংশুকং তালব্যশকারবৎ বস্ত্রমাচ্ছাদনং বাসাশ্চেনং বসনমংসুকমিত্যরঃ"। উল্লিখিত অংশে হস্ চিহ্ন যথাযথ স্থানে ব্যবহৃত হয়নি, যেমন—'অংশূন' 'তন্তুন' ইত্যাদি ক্ষেত্রে অকারান্ত পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু অকারহীন হসন্তযুক্ত পাঠই শুদ্ধ। 'আদান্তাত' পদের ত কারে হসন্ত নেই এবং "আদান্তাত' শব্দের আকারের পূর্ববর্তী অংশুকম্ পদের মকার স্বচ্ছন্দে অনুস্বরে পরিণত হয়েছে। সন্ধির নিয়মে অংশুকমাদন্তাত্ ইত্যাদি শুদ্ধ রূপ। অমরকোষের উল্লেখে 'অমর' শব্দটির 'র' বর্ণটি উধাও হয়েছে। এই রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। 'অংশুমালী' শব্দের প্রসঙ্গে মাঘকবির শিশুপাল বধ কাব্যের একাদশ সর্গ থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত হয়েছে—

"ব্রজতিবিষয়মক্ষ্মাংশুমালী ন যাবত্তিমিরমখিলমস্তস্তাবদেবারুণেন
পরপরিভবি তেজস্তম্বতামাশু কর্ত্তুং প্রভবতি হি বিপক্ষোচ্ছেদমগ্রেসরোঽপি।"

পুঁথির লিপিকর প্রমাদে শুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। 'অংশুমালী' প্রসঙ্গে হারাবলী নামে অভিধান থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে—

'খপতঙ্গবিয়ন্মণিভানবো হরিভগেননিদাঘকরাদ্রয়ঃ।
কিরণমালি বিরোচন হেলয়ো দিনমণিস্তরণি চ দিনপ্রণীঃ"।।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে শ্লোকটির পাঠ প্রায় অপাঠ্য।

লিপিকর অনেক সময় যুক্তবর্ণের নির্দ্দিষ্ট লেখ্যরূপকে বিপরীত ক্রমে লিখেছেন, যেমন 'চচ' > চব অন্যান্য ক্ষেত্রেও লিপির এই বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়।[১৮]

মনে হয় অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরা পুঁথিটি নকল করেছিলেন তাই ভুলের সংখ্যাও এত বেশি। মিশন প্রেসের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মূল পাণ্ডু লিপিটি নষ্ট হয়ে যায়, এখন একটি মাত্র পুঁথি অবশিষ্ট থাকায় সঠিক কোন মন্তব্য করা যায়না।

যদিও পাণ্ডু লিপিতে নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির কামনায় দেবতাদির উদ্দেশ্যে কোন মঙ্গলাচরণ নেই, কিন্তু আদ্য ইকার যুক্ত শব্দগুলির সংকলনের প্রারম্ভে সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম জানানো হয়েছে—"শ্রী গণেশায় নমঃ।" আবার আদ্য গকার যুক্ত শব্দাবলীর ক্ষেত্রে প্রথমেই 'গঙ্গা' শব্দ লিপিবদ্ধ হয়েছে—গঙ্গা স্মরণ করলে হরীশপাদপদ্মলাভ করা হয়।"...হরীশাঙ্ঘ্রিপ্রাপ্তা গঙ্গেতি স্মরণাৎ।" গঙ্গা শব্দের পর 'গগন' শব্দ স্থান পেয়েছে। পণ্ডিতেরা নিজেদের ভক্তিভাবে বিশেষ বিশেষ শব্দাবলীর সংকলনের প্রারম্ভে দেবতাস্মরণ করে মঙ্গলাচরণ করেছেন। পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রিত হয়নি; মুদ্রিত হলে শেষ প্রুফ দেখার সময় কেরী প্রমুখ খ্রিস্টধর্মযাজকগণ এই সাকার দেবতা স্মরণ কি অবিকল রাখতেন? পুঁথিটির অন্য কোন প্রতিলিপি নেই, সুতরাং বিভিন্ন পুঁথির পাঠের তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ নেই।

দেশীশব্দ প্রয়োগ ও চলিত ভাষার প্রতি উইলিয়ম কেরীর একধরণের পক্ষপাত ছিল, কথোপকথন গ্রন্থে এই পরিচয় পাওয়া যায়। ডঃ সুশীল কুমার দে কেরীর এই প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১৯] ডঃ দে আরও বলেছেন বাংলা-ইংরেজি অভিধান সংকলনে কেরী একদিকে যেমন সংস্কৃত ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, অন্যদিকে দেশী শব্দের যথার্থ প্রয়োগেও তাঁর অভিধান সমৃদ্ধতর হয়েছে। ডঃ দে বলেছেন—"Local terms are rendered with that correctness which Carey's knowledge of the manners of the people and his long domestication amongst them enabled him to attain and his scientific acquirements and familarity with the subjects of natural history qualified him to employ, and unfrequently to devise, characteristic denominations for the products of animal and vegitable world peculiar to East."[২০]

কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধান সম্পর্কে যে মন্তব্য ডঃ দে করেছেন সেই মন্তব্য তাঁর সংস্কৃত অভিধান সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। বাংলাভাষা এবং শ্রীরামপুর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান তাঁর সংস্কৃত অভিধানেও প্রতিফলিত হয়েছে; যে সমস্ত দেশী শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, সেগুলির মাধ্যমেই আমরা তার পরিচয় পাই।

এই দেশী শব্দগুলির মাধ্যমে আমরা ঐ অঞ্চলের একটি সামাজিক চিত্র মোটামুটি প্রতিফলিত হতে দেখি। প্রথমেই কোন কোন শব্দে স্থানীয় অধিবাসীদের জাতিগত উল্লেখ, যেমন কৈবর্ত ও নাপিত, (১) 'ছোট পুং কৈবর্ত্তে;' (২) 'নখপট্ট পুং নাপিতে।' দুটি শব্দই চতুর্থখণ্ডের অন্তর্গত। আমাদের পারিবারিক সম্পর্কও দেশী মাধ্যমে উল্লিখিত হয়েছে "চট্টনী স্ত্রী জ্যেঠী ইতিখ্যাতে (৪।২১৮)।"

শাক ও মাছপ্রিয় বাঙালির খাদ্যের পরিপাটি উল্লেখ আছে—নটেশাক, সুসনীশাক,

খাড়া, ডুমুর, কাঁকরোল, গোঁড়ানেবু, জাম, নারকেল, গুড়, খয়রা মাছ, রুইমাছ, বাঁশপাতামাছ, শামুক এসবেরই উল্লেখ করেছেন উইলিয়াম কেরী তাঁর সংস্কৃত অভিধানে, যেমন— "তন্ডুলীক পুং নটিয়াশাক ইতিখ্যাতে; (৪।২২৬); "তমালক সুসুনীশাক ইতিখ্যাতে" (৪।২৩৮); "চুচূ পুং সুসুনী ইতি শাকভেদে" (৪।১৩৪) খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে আরও উদাহরণ পাই—"ছত্রক পুং খাড়া ইতিখ্যাত বৃক্ষে" (৪।১৪৪); "জঘনফলা স্ত্রী কাটডুমুরি ইতিখ্যাতে" (৪।১৫৬); "জন্তুফল পুং উদুম্বরে ডুমুরি ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ" (৪।১৬৪); "গন্ধপুষ্পে পুং কাঁকরোল ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ" (৪।১৬৪); "জম্ভৃক পুং গোঁড়ানেবু ইতিখ্যাতে" (৪।১৬৩); "জম্ভিন্ স্ত্রী গোঁড়ানেবু ইতিখ্যাতে" (৪।১৬৬); "সপান ন মরিচে" (৫।২৭১); "জম্বু স্ত্রী জম্বাফলে" (৪।১৬৭); "নারিকের পুং নারকোল" (৪।৪৯৭); "গুড় বাচ্যলিঙ্গ বর্ত্তুনে পুং হস্তিসজ্জায়াং ইক্ষুপাকে চ" (৩।৪০); "যন্ত্রযানে পুং মটর ইতিখ্যাত শষ্যে" (৫।৫৪৯)।

'ওদন' প্রসঙ্গে বাঙালির অতিপ্রিয় শ্লোকটির কিছু অংশ উদ্ধার করেছেন—'নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধিনী।'

উল্লিখিত শব্দগুলি মোটামুটি শাক ও শস্যের নাম। আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রথমেই উল্লেখযোগ্য রসুন বা লশুন—"ম্লেচ্ছকন্দ পুং লশুনে" (৫।৫৩৮); "ঘর্ঘট পুং ট্যাংরা ইতিখ্যাত মৎস্যে" (৪।৪৮) 'বংশপত্র পুং বাঁশপাতা ইতিখ্যাত মৎস্যে (৫।৪২); "জলব্যধ পুং মৎস্যভেদে কাঁকচি খয়রা ইতিখ্যাতে" (৪।১৮০); "চপত পূর্ত্তিমা স্ত্রী মৎস্য ভেদে চাঁদা ইতিখ্যাতে";"গঙ্গাটেপ পুং মৎস্যভেদে চিঙ্গড়ি ইতি প্রসিদ্ধিঃ" 'জলতাল পুং ইল্লীকা মৎস্যে,"; 'জলবৃশ্চিকা পুং চিঙ্গড়ি মৎস্যে"; এবং পরিশেষে মাছের রাজা রুই মাছের উল্লেখ করেছেন, "রোহিত পুং মৎস্য ভেদে" (৫।৬৪২)।

অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণীর খাদ্যের উল্লেখও পাই 'জলশুক্তি স্ত্রী শামুক ইতি খ্যাতে।" শেষপাতে আছে মিষ্টান্নের ব্যবস্থা "পেড়া স্ত্রী পিঠা ইতিখ্যাতে।"

উপরে উল্লিখিত 'নেবু', 'নারকোল' ইত্যাদি শব্দ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চলিত ভাষারই সন্ধান দেয়। খাদ্যাদির সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভেষজেরও উল্লেখ করা হয়েছে "চিরতিক্ত পুং চিরতা ইতিখ্যাতে" (৪।২২৯)।

বাসনার সেরা রস রসনাতেই, সেইজন্য আমরা প্রথমেই খাদ্যদ্রব্যাদির উল্লেখ করলাম। বাড়িঘর, তৈজসপত্রাদি সম্পর্কেও এই অভিধানে বহু তদ্ভব ও দেশজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—"জাল পুং গবাক্ষে জালীতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ "(৪।১৯৬)। ঘর গৃহস্থালির কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও লৌকিক শব্দে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যেমন—ছুরি, পিঁড়া, পাখা ইত্যাদি—"গৃহাবগ্রহণী স্ত্রী পিঁড়া ইতিখ্যাতায়াং" (৩।৫৩)। মনে হয় শব্দটি সিঁড়ি বা পৈঠা অর্থে ব্যবহৃত। "ছুরী স্ত্রী ছুরিকায়াং"; এখানে আবার অর্থটিই সাধুশব্দ, মূলশব্দটি বহুল প্রচলিত। 'গুড়' শব্দটির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ্য

করা যায়। পাখার দুটি সাধু শব্দ পাই-(১) "তালবৃন্ত পুং পাখা ইতিখ্যাতে" (৪।২৬৪) এবং (২) "তালবৃন্তক ন পাখা ইতি খ্যাতে" (৪।২৬৪)।

তৈজসপত্র ছাড়াও চড়বার জন্যে আছে গাড়ি, গীতবাদ্য করার জন্য ঢোল ও ডমরু এবং এয়োতির মঙ্গলচিহ্ন সিন্দুর—"শকট পুং নপুং গাড়ি ইতি খ্যাতে"(৬।২৭৬); "ঢোল পুং বাদ্যভেদে" (৪।২২১); "ডমরু পুং বাদ্যভেদে" (৪।২১৯)। এখানেও মূল শব্দদুটিই চলিত ভাষায় প্রচলিত। আর 'সিন্দুর' শব্দের মূল সংস্কৃত শব্দটি 'চিনাপিষ্ট', "চিনাপিষ্ট ন সিন্দুরে।" শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংকলক জানিয়েছেন চিনদেশে পেষণ করা হয়, তাই এর নাম চিনাপিষ্ট—"চীন দেশভেদস্তত্র পেষণত্বাৎ চিনাপিষ্ট"। চীনাংশুকের মতো চিনপিষ্টও হয়তো চিনদেশ থেকে আমদানি হত।

গৃহনির্মাণে জানালা বা জালির বিশেষ স্থান ছিল। কাঁসা, সীসা, কাঁকর ইত্যাদি শব্দের উল্লেখও দেখা যায়—"যোগেষ্ট ন সীসকে" (৫।৫৭০); "লোহলপ্তন ন কাংস্যে" (৬।৩৮); "চূর্ণখন্ড ন কাঁকর ইতিখ্যাতে" (৪।১৩৭)। কাঁকরের আরেকটি প্রতিশব্দ রয়েছে 'ব্যোমমুদগর' "ব্যোমমুদগর পুং কাঁকর ইতিখ্যাতে" (৬।১২৫)।

আমাদের চারপাশের পরিবেশে যে সব পরিচিত গাছ, লতা, ফুল দেখি তাদেরও দেশীনামের উল্লেখ করা হয়েছে। আঁকড় গাছ, ছাতিম গাছ, আম গাছ, অশোক, বট, কদম, ঝাউ এই সব বড় বড় গাছের নাম পাওয়া যায়। তিন্তিড়ী ও কপিত্থ যদিও সাধু শব্দ তবু এই নামগুলির সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত এবং অম্ল খাদ্যরূপে এগুলি খুবই মুখরোচক।

জবা, রক্তকাঞ্চন, শেফালিকা এইসব ফুলের নামের সঙ্গে, শেয়াকুল, হাতিশুঁড়, এরন্ড ইত্যাদি অখ্যাত আগাছা এবং দূর্বা, ঘাস ইত্যাদি নামের উল্লেখ আছে। পরগাছারও উল্লেখ পাই।

এই অভিধানে অনেক পরিচিত পশুপক্ষী ও পতঙ্গের দেশী নামও আছে। খেঁকশেয়ালীর নাম খিঙ্কিনিকা, "খিঙ্কিনিকা খেঁকশেয়ালী ইতিখ্যাতে" (৩।৪৮৬), "শীঘ্রচেতনা পুং কুক্কুরে" (৬।৩৬১); "ফেরব পুং শৃগালে" (৫।১৮২), "গঙ্গাচিল্লী গাংচিল ইতিখ্যাতে" (৪।১); "জলবঙ্গ পুংবকে" (৪।১৭৮); "ছত্রকু পুং মৎস্যরঙ্গ পক্ষিণী" (৪।১৪৪); "নগরীবক পুং কাকে" (৪।৪৬৩); "তন্তুক পুং খঞ্জনে" (৪।২২৫); "বর্চবা স্ত্রী বাবুই ইতিখ্যাতে" (৬।৮৪) ইত্যাদি। 'মৎস্যরঙ্গিনী' শব্দে মনে হয় মাছরাঙাকে সংস্কৃতায়ন করার চেষ্টা হয়েছে। সরীসৃপ জাতীয় দেশজ শব্দও পাওয়া যায় "জলনটক পুং ঘড়িয়াল ইতিখ্যাতে" (৪।১৮২); "গৌধেয় পুং গোসাপ ইতিখ্যাতে" (৪।৭১); অন্যান্য ছোটখাট প্রাণী এবং কীট পতঙ্গেরও উল্লেখ আছে—"গৃহমোচিকা স্ত্রী চামচিকা ইতিখ্যাতে" (৪।৫২), "গন্ডুপদ পুং কেঁছয়া ইতিখ্যাতে" (৪।১০)। এখানে

কেঁচো শব্দটির সংস্কৃতায়ন হয়েছে। "গন্ধনকুল পুং ছঁচা ইতিখ্যাতে" (৪।৫২); শব্দটি সম্ভবত ছুঁচা, লিপিকর প্রমাদে হ্রস্ব উকার লুপ্ত হয়েছে। "রণরণ পুং মশকে" (৫।৫৮৭)। অভিধানে জানানো হয়েছে 'রণরণ' শব্দ করে বলে মশকের নাম "রণরণ"। ফেরব শব্দটি দেশজ না হলেও আমরা এখানে উল্লেখ করছি। শৃগালের মতো অত্যন্ত চতুর অর্থে 'ফেরেববাজ' শব্দটি বাংলাভাষায় খুবই পরিচিত। তৎসম শব্দের সঙ্গে এখানে বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ হয়েছে। "টেরক বাচ্যলিঙ্গ টেরা ইতিখ্যাতে" (৪।২২৯)। এখানে 'টেরা' শব্দটি অনেকেরই একই সঙ্গে করুণা ও স্মিতহাস্যের উদ্রেক করবে।

আমরা ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে এই শব্দগুলি সংগ্রহ করেছি; এখানে আলোচ্য অভিধানে দেশজ শব্দ ব্যবহারের দিক্ দর্শন করা হয়েছে মাত্র।

হেমচন্দ্র 'দেশীনামমালা'[২১] নামে একটি কোষগ্রন্থ সংকলন করেন, কিন্তু সেই গ্রন্থের সবশব্দই তদ্ভব, কোন তৎসম শব্দ সংকলিত হয়নি। সুতরাং এই অভিধানের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে।

এই অপ্রকাশিত সংস্কৃত অভিধানটিতে অনেকগুলি কোষগ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বিখ্যাত কোষগ্রন্থ অমরকোষ ছাড়াও নিম্নলিখিত কোষগ্রন্থগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়—মেদিনী, হারাবলী, রত্নমালা, শব্দচন্দ্রিকা, শব্দরত্নাবলী, উণাদিকোষ, বিশ্ব, ত্রিকাণ্ডশেষ, শব্দমালা, একাক্ষরকোষ ইত্যাদি। কোষকারদের মধ্যে অমরসিংহ, পুরুষোত্তম, জটাধর, বোপদেব, হেমচন্দ্র, ভরত ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। এই ভরত সম্ভবত অমরকোষের টীকাকার ভরতমল্লিক[২২]।

এই অপ্রকাশিত সংস্কৃত অভিধানটিতে বিভিন্ন কোষ গ্রন্থের উদ্ধৃতি থাকায় কোন বিশেষ শব্দের বিশেষ অর্থের যাথার্থ্য সম্পর্কে পাঠকের মনে কোন সংশয় জাগে না। এতগুলি কোষগ্রন্থের উদ্ধৃতি একত্রে একটি মাত্র গ্রন্থের মধ্যে পাওয়ায় ছাত্ররাও অত্যন্ত উপকৃত হতে পারে। অভিধানটি ছাত্রদের কাছে ব্যাকরণের পরিপূরকও বটে। কালিদাস, মাঘ প্রভৃতি মহাকবিদের কাব্য থেকে উদ্ধৃতি থাকায় অনভিজ্ঞ পাঠকের তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগা খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পাঠককে ঐ গ্রন্থগুলি সম্পর্কে কৌতূহলী করে। বস্তুত অভিধানটি 'আকাদেমিক' দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই মূল্যবান।

১৮১২ সনের মার্চ মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাতে উইলিয়ম কেরীর বহু অভিলষিত কোষগ্রন্থের অন্য পাণ্ডুলিপিগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কেরী অত্যন্ত মানসিক আঘাত পান, তাঁর মন একেবারে ভেঙে পড়ে। মনে হয় এই কারণেই সংস্কৃত অভিধানের পাণ্ডুলিপিটি প্রায় অখণ্ড আকারে থাকলেও এটিকে প্রকাশ করতে কেরী আর উৎসাহিত হননি।

বহুভাষা-কোষগ্রন্থ ঃ

উইলিয়ম কেরীর জীবনীকাররা প্রায় সকলেই বলেছেন কেরীর জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্তি তাঁর বহুভাষা-কোষগ্রন্থটি বা Polyglot vocabulary. ডঃ সুশীলকুমার দের উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এই বহুভাষিক-অভিধানের কোন উল্লেখ নেই, তা প্রাসঙ্গিকও ছিল না। সজনীকান্ত দাস তাঁর বাংলাগদ্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এই অভিধানটির কথঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কেরী অমানুষিক পরিশ্রমে এই Universal Dictionary খানি প্রস্তুত করেছিলেন।[২৩] বঙ্গদেশে পদার্পণের কিছুদিনের মধ্যেই কেরী যখন মদনাবাটিতে নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক, তখনই তিনি Universal Dictionary রচনার স্বপ্ন দেখতেন। সংস্কৃত ভাষার মূলশব্দটি অবলম্বন করে একটি বহুভাষার কোষগ্রন্থ রচনা কেরীর বহু অভিলষিত ছিল। ধর্মপ্রচার, বাইবেলের বাংলা-অনুবাদের মুদ্রণের চেষ্টা, বিদ্যালয় পরিচালনা এবং পারিবারিক অশান্ত জীবনের মধ্যেও ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার জন্য তিনি উন্মুখ ছিলেন আর এই রচনার প্রস্তুতিপর্বও দীর্ঘকালব্যাপী। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তিনি ডঃ রাইল্যান্ডকে একটি চিঠিতে লেখেন— "I am contemplating and indeed however long-collecting materials for a universal dictionary of oriental languages, derived from the Sanskrit, of which that language is to be the ground work, and to give the corresponding Greek and Hebrew words. I wish much to do this for the sake of assisting bibelical students to correct the translation of the Bible in the oriental languages"[২৪] বহুভাষা-অভিধান প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি মন্তব্য ও উল্লেখ করা যেতে পারে—"I mean to take Sanskrit, of course as the groundwork and to give different acceptance of every word with examples of their applications in the manner of Johnson and then to give synonyms with different languages from Sanskrit with the Hebrew and Greek terms."[২৫]

কেরীর পত্রাদি থেকে মনে হয় সংস্কৃতভাষাকে ভিত্তি করে একটি বহুভাষা-কোষগ্রন্থ রচনার জন্য ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের বহুপূর্ব থেকেই তিনি শব্দ সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন তিনি সংস্কৃত অভিধান রচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এই প্রস্তুতি সেই সময়েই শুরু হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বহুভাষাকোষগ্রন্থ কখনই প্রকাশিত হয়নি। মিশনপ্রেসের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে এই কোষগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বহুভাষা-কোষগ্রন্থের একটি খণ্ডিত পুঁথি শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরিতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

পুঁথির বিবরণ ঃ

এই অভিধানটিতে সংস্কৃত ভাষাকে ভিত্তিকরে শব্দচয়ন করা হয়েছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ভাষায় সেই শব্দের প্রতিরূপ পরিবেষিত হয়েছে। তবে এই খণ্ডিত পুঁথিতে গ্রিক বা হিব্রু শব্দ অনুপস্থিত, মনে হয় কেরী পরে গ্রিক ও হিব্রু প্রতিশব্দ দেওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

এই বহুভাষা-কোষগ্রন্থটির পাণ্ডু লিপি আনুমানিক ১৮ ইঞ্চি লম্বা ও সাত ইঞ্চি চওড়া। পুঁথির কাগজ বিভিন্ন রঙের এবং কাগজ শ্রীরামপুরে প্রস্তুত। প্রতিটি পাতায় লাল ও কাল কালির সরলরেখার সাহায্যে আনুমানিক দেড় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের আয়তক্ষেত্র সুন্দরভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এক একটি চৌখুপিতে এক একটি শব্দ লেখা হয়েছে। লিপির ধাঁছ বিভিন্ন, মনে হয় একাধিক লিপিকরের লেখা। পাণ্ডুলিপি বাংলা অক্ষরে লেখা, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা 309, মনে হয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পাঠকের সুবিধার জন্য পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে (Capital letter) পরিচয় পত্র সংযোজনা করেছেন—"Vocabulary of the following Languages" ইত্যাদি।[২৬]

অভিধানের বৈশিষ্ট্য ঃ

সংস্কৃত শব্দটিকে প্রারম্ভে স্থান দিয়ে পরে নিম্নলিখিত লৌকিক ভাষার শব্দগুলি ক্রমানুসারে লিখিত হয়েছে—"সংস্কৃত ভাষা /কাশ্মীর ভাষা/ পঞ্জাবান্তর্গত জালন্ধর ভাষা/মধ্যদেশ ভাষা/পর্ব্বতী ভাষা/মিথিলা ভাষা/বাঙ্গালা ভাষা/উৎকলভাষা/মহারাষ্ট্র ভাষা/ গুর্জরভাষা/কর্ণাটভাষা/তৈলঙ্গভাষা/দ্রাবিড়ভাষা। সংস্কৃত সমেত মোট তেরটি ভাষায় কোষগ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেক পাতায় সাতটি শব্দ আছে, শব্দের বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক নয়, বরং বিষয়ানুক্রমিক। বিষয়ের শ্রেণীভেদও সব সময় দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা হয়নি। গ্রন্থের প্রথমে দেবতা ও তাঁদের অনুষঙ্গবাচক শব্দ, তবে প্রথম শব্দটি 'অসুর,' গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের প্রয়াস নেই। প্রথম পাতায় 'অসুর', 'নাস্তিক্যবোধ', 'গৌতম', 'ব্রহ্মা', 'বিষ্ণু', 'বসুদেব', 'বলভদ্র' এই সাতটি শব্দ স্থান পেয়েছে, দ্বিতীয় পৃষ্ঠার সাতটি শব্দ 'মদন মার অনঙ্গ স্মার', 'অনিরুদ্ধ', 'লক্ষ্মীঃ', 'পাঞ্চজন্য', 'সুদর্শন', 'কৌমদকী', 'লন্ধক' । 'লন্ধক' শব্দটি 'নন্দক' শব্দের পরিণতি। অন্য একটি পাতায় এইনামগুলি পাওয়া যায়—'অনিলাঃ', 'সাধ্যাঃ', 'রুদ্রাঃ', 'বিদ্যাধরাঃ', 'অপ্সরসঃ', 'জক্ষাঃ'। অন্য একটি পাতায় 'কৌস্তুভ', 'গরুড়', 'বিষ্ণু', 'শিব' 'কপর্দ', 'পিনাক' ও 'প্রমথগণ'। এখানে বিষ্ণুর কৌস্তুভ ও গরুড়ের সঙ্গে শিব এবং তাঁর প্রহরণ ও অনুচরণগণও যুক্ত হয়েছেন।

শব্দের বর্গ সবসময় রক্ষাকরা সম্ভব না হলেও চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন 'ঐশ্বর্য্য' প্রসঙ্গে 'অণিমা', 'লঘিমা' প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি বা দিক্ প্রসঙ্গে 'প্রাচী', 'অবাচী', 'প্রতীচী', উদীচী' ইত্যাদি।

নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্গত কিছু শব্দও একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছে— "অঙ্গহারঃ, আঙ্গিকঃ, সাত্ত্বিকঃ, শৃঙ্গারঃ, বীরঃ, করুণঃ, অদ্ভুতঃ, হাস্যঃ, ভয়ানকঃ, বীভৎসঃ, রৌদ্রঃ, শান্তিঃ (ত্রাসঃ, ভীতিঃ, ভয়ঃ) ভাবঃ, অনুভাবঃ" ইত্যাদি। 'আঙ্গিকঃ', 'সাত্ত্বিকঃ' ইত্যাদি প্রসঙ্গে 'আহার্যে'র (অভিনয়) এবং 'ভাবঃ', 'অনুভাবঃ' প্রসঙ্গে 'বিভাবে'র উল্লেখ নেই।

নদী, পর্বত প্রভৃতি বিভিন্নবর্গের শব্দ এই কোষগ্রন্থে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। কিছু বিশেষণ শব্দ একত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তবে সর্বত্র পদের ও লিঙ্গের সমতা রক্ষিত হয়নি, বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য পদ, পুংলিঙ্গ শব্দের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের একত্র সমাবেশ হয়েছে, যেমন—'বসিতা', 'বার্তা' ইত্যাদির সঙ্গে 'অমৃতং', 'দ্রুতং', 'হৃতং' ইত্যাদি অথবা 'মনুষ্যকঃ' শব্দের সঙ্গে 'গ্রামতা', 'জনতা,' 'ধূম্যা' ইত্যাদি শব্দ।

শেষের দিকে অব্যয় শব্দস্থান পেয়েছে, যেমন—আঃ, ধিক্, চ ইত্যাদি। অনেকস্থলেই অব্যয় শব্দটির প্রতিশব্দের পরিবর্তে বিভিন্ন ভাষায় সেই শব্দের অর্থটি উপস্থাপিত হয়েছে, যেমন—'ধিক্',— 'ধিক্কার, গালাগালি, নিন্দা'; গুর্জরভাষায় 'ধিক্কারবু দোষারোপ'; কর্ণাট ভাষায় 'উকিসানু, হনিবলু'; তৈলঙ্গভাষায় 'ধিক্কারটুট, দোষারোপম্'; দ্রাবিড়ভাষায়- 'ভিক্কার, দেযোরোপক'। এখানে 'নিন্দা, 'দোষারোপ', 'দোষারোপক' প্রভৃতি শব্দ ব্যাখ্যামূলক।

কিংবা 'আ' এই অব্যয় পদটি কাশ্মীর ভাষায় 'লূপপীড়া'; জালন্ধর ভাষায় 'কোপপীড়া'; মৈথিলী ভাষায় 'ক্রোধপীড়া'; মহারাষ্ট্র ভাষায় 'রাগপীড়া'; কর্ণাট ভাষায় 'কোপবু, ব্যথবু'; তৈলিঙ্গভাষায়—'কোপম্'; দ্রাবিড়ভাষায় 'কোক, পীড়ে' ইত্যাদি রূপে স্থান পেয়েছে। অব্যয় পর্যায়ের শেষ শব্দ 'অর্বাক'। অব্যয় শব্দগুলির উপস্থাপনায় অমরকোষকে অনুসরণ করা হয়েছে—"ইতিশ্রীঅমর তৃতীয় কাণ্ডে অব্যয়-বর্গাঃ।"

বাংলাভাষার কিছু কিছু কৌতুককর প্রতিশব্দ সংকলিত হয়েছে, যেমন—লুব্ধক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'লোভী'। উইলিয়ম কেরী আরেকটি প্রতিশব্দ দিয়েছেন, 'ছিঁশক,' এটি বোধহয় 'ছিঁচকে' শব্দের সাহেবি প্রতিরূপ।

পাণ্ডুলিপিটিতে কিছুকিছু কক্ষ শূন্য থেকে গেছে; সেখানে বাংলা ভাষার প্রতিরূপটি আছে এবং অন্য কোন কোন ভাষার প্রতিরূপ আছে। মনে হয় পরে প্রতিশব্দগুলি যথাস্থানে যোগকরা হবে এই ভরসায় স্থান শূন্য রাখা হয়েছিল; কিন্তু পরে আর সে সুযোগ পাওয়া যায়নি। এই কোষগ্রন্থটিতে ভারতের উত্তরদক্ষিণপূর্বপশ্চিম বিভিন্ন প্রান্তের ভাষার প্রতিশব্দ সংকলিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে কেরী যথেষ্ঠ অবহিত ছিলেন। আবার দক্ষিণভারতীয় ভাষাগুলির অর্ধেক শব্দই কেরীর মতে সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে গৃহীত।[২৭] সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ভারতীয় অন্যভাষাগুলির সম্পর্ক কত নিবিড় এই বহুভাষা-কোষগ্রন্থ থেকে একটিমাত্র

উদাহরণেই তা প্রকাশিত- "সংস্কৃত—গন্ধর্ব্বঃ/কাশ্মীরভাষা-গন্ধর্ব্ব/পঞ্জাবান্তর্গতজালন্ধর ভাষা-গন্ধর্ব্ব জাত/মধ্যদেশ ভাষা—গন্ধর্ব্ব/ উৎকলভাষা-গন্ধর্ব্ব/ মহারাষ্ট্র ভাষা-গন্ধর্ব্ব/গুর্জর ভাষা—গন্ধর্ব্ব /পার্ব্বতী ভাষা—গন্ধর্ব্ব / মিথিলা ভাষা—গন্ধর্ব্ব / বাংলা ভাষা—গন্ধর্ব্ব/কর্ণাটভাষা—গন্ধর্ব্বগলু / তৈলঙ্গভাষা-গন্ধর্ব্বলু / দ্রাবিড়ভাষা-গন্ধর্ব্বাল।" উল্লিখিত দৃষ্টান্তটি থেকে জানা যায় যে সংস্কৃত 'গন্ধর্ব্ব' শব্দটি উত্তরভারতীয় সমস্ত ভাষায় গন্ধর্ব্ব রূপেই পরিচিত, দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিতে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয় মাত্র। এই অপ্রকাশিত খণ্ডিত বহুভাষা-কোষগ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে জাতীয় সংহতি রক্ষায় উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত।

একথা অনস্বীকার্য এই সংস্কৃত অভিধান ও বহুভাষা-কোষগ্রন্থ রচনা কেরীর একক প্রচেষ্টার ফল নয়। একথাও সকলেই জানেন যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশনায় বহু সংখ্যক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্য করতেন। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা রামনাথ বাচস্পতির মত কৃতবিদ্য পণ্ডিতদের সহায়তা স্বীকৃত হলেও যে কোন কারণেই হোক অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

একথাও স্বীকার্য যে মূলত খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও বাইবেল অনুবাদে সহায়তার জন্যই কেরী অভিধান সংকলনাদির কাজ শুরু করেন, নানা চিঠিপত্রে তিনি তা স্বীকারও করেছেন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কোন দূর অতীতে বিলীন হয়ে গেছে, অবশিষ্ট রয়ে গেছে সেইসব প্রচেষ্টার মাহাত্ম্য।

উইলিয়ম কেরী তাঁর সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান ও বহুভাষা-কোষগ্রন্থের যে উত্তরাধিকার আমাদের জন্য রেখে গেছেন তারজন্য তিনি আমাদের চিরনমস্য। এই সুবৃহৎ গ্রন্থদুটি রচনার জন্য পরিকল্পনা ও পরিচালনার যে উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই প্রচেষ্টা দুর্লভ মননশীলতা ও মনস্বিতার পরিচায়ক।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। "Carey was appointed teacher of Bengali and Sanscrit in April 1801. In January 1,1807, he was raised to the status of professor"
De. Sushil. kr., History of Bengali Literature in the Nineteenth century. 1800-1828. 'Calcutta 1919. p-127.

২। Periodical Accounts, Vol I. p-277.

২ক। উইলিয়ম কেরী ও শ্রীরামপুরমিশন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ, শ্রীরামপুর কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক ও কেরী লাইব্রেরির প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে জানা যায় যে একটি তোরঙ্গের মধ্যে প্রাপ্ত পুঁথির আলগাপাতাগুলিকে পরে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ বাঁধাই করেন।

৩। সজনীকান্তদাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৩

৪। তদেব, পৃ-১১১

৫। তদেব, পৃ-১১৩

৬। Ward's Journal, I April-1804,
"Bro. C. has brought a commission for printing a Sanscrit Dictionary in quarto of about 500 pages for the college"
Periodical Accounts, Vol-II, p-373
ওয়ার্ডের জার্নাল থেকে এই অভিধান সম্বন্ধেআর কিছুই জানা যায় না। মনে হয় এই অভিধানটি কোলব্রুক সম্পাদিত 'অমরকোষ'। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কোলব্রুকের 'অমরকোষ' প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছিলেন।
The college of Fort William in Bengal, London, 1805. p-229

৭। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, বড় সাধ বড়সেবা, শেওড়াফুলি ১৯৮৯. পৃ-১০২। ঐ লেখকেরই 'বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেরী তাঁর পরিজন—কলিকাতা-১৯৭৪

৮। উইলিয়ম ওয়ার্ডের হিন্দু সমাজের আচার-আচরণ সম্পর্কে কৌতূহল ছিল। হিন্দু দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের গভীরে, তিনি ঢুকতে পারেন নি, তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানও খুব পরিপক্ক ছিলনা। হিন্দুদের আচার-আচরণ ও শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পুস্তকটি দুটি খণ্ডে ১৮০৬ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থগুলির অর্থ গ্রহণে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি অবশ্য বিদ্যালঙ্কারের নাম উল্লেখ করেননি।
"Yesterday at Calcutta I was writing with the head Sanscrit Pandit of the College. I am anxious to get from him an intelligible and genuine account of Hindoo philosophy."
Periodical Accounts vol-II, p-475

৯। ফেলিক্স কেরী ও তাঁর গ্রন্থাদি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করেছি। ফেলিক্স কেরী অবশ্য ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় একটি অভিধান সংকলন করেছিলেন, কিন্তু তা নিজের প্রয়োজনে, নতুন ভাষা শিক্ষার আগ্রহে।
Chatterjee. Sunil Kumar, Felix Carey (A Tiger Tamed) Calcutta-1991

১০। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বড় সাধ বড় সেবা, পৃ-১৫৯।

১১। কেরীর Dialogues বা Colloquies ১৮০১ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি পরবর্তী কালে 'কথোপকথন' নামে পরিচিত হয়।

১২। Chowduri Pandit Manindra Mohan, *Śabdaratnāvali*, Asiatic Society, Calcutta. 1970.

১৩। শব্দরত্নাবলী কোষগ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, যে প্রতিলিপিটি থেকে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে সেটি রাজশাহি জেলার সোনাপাতিল গ্রামে নকল করা আরম্ভ হয় এবং পাবনাজেলার গুনাইগাছা গ্রামে শেষ হয়। অভিধানকার মথুরেশের পৃষ্ঠপোষক মুসাখান উত্তরবঙ্গের একজন বিখ্যাত ভূম্যধিকারী ছিলেন। ভূমিকায় ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন—"Mathuresa's *Śabadaratnāvali* is the latest and perhaps the biggest of the traditional *śabadakaśos* compiled in Eastern India." -Foreword.

১৪। নিরুক্তে বৈদিকশব্দের অর্থ এবং ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু পরবর্তী কোষগ্রন্থ গুলিতে শব্দের প্রতিশব্দ পরিবেষিত হয়েছে।

১৫। Keith A.B. A History of Sanskrit Literature, Oxford, University press. Reprint 1956, p-412

১৬। Author—Sundarpanditani. S.
The Journal of Asiatic Society, Vol XXXV No 1993.

১৭। 'অংশূন তন্তুন কায়ন্তীত্যংশুক' ইত্যাদি স্থলে 'অংশূন' ও 'তন্তুন' পদে হসন্তের অভাব আছে।

১৮। যেমন বৃ লেখা হয়েছে চৃ এইভাবে।

১৯। De. S.K, প্রাগুক্ত, p-146

২০। তদেব, p-152

২১। হেমচন্দ্র, (সম্পাদক) পিশেল, দেশীনামমালা, ১৮৮০

২২। পরিশিষ্টে কোষগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩। সজনীকান্তদাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১২০

২৪। তদেব, পৃ-১২১

২৫। সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা।

২৬। বহুভাষাকোষগ্রন্থটির মলাটে যে পরিচয় পত্রটি আছে তার প্রতিলিপি—

Vocabulary of the following Languages.

SANSKRIT	KASMIRI	JALANDHAR
CENTRALINDIA	HILL TRIBES	MITHILA
	BANGLA	
UTKAL	MAHARASTRA	KARNATAKA
GURJJARA	TAILINGA	DRAVIDIAN

২৭। দক্ষিণ দেশের ভাষাগুলির উৎস সম্বন্ধে কেরীর সন্দেহ ছিল। তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালয়ালাম ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত নয় তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, অথচ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ঐ সব ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি সজাগ থাকলেও তাঁর মনে এক ধরণের দ্বিধা ছিল।

Carey W., A Dictionary of Bengalee Language.
Serampore., 1825, -Preface III

পঞ্চম অধ্যায়

(ক) বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ

সংস্কৃতমনস্ক উইলিয়ম কেরী সংস্কৃত চর্চায় সহায়তার জন্য সহায়কগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অনুবাদ ক্ষেত্রেও তাঁর সমান উৎসাহ দেখা যায়। একদিকে তিনি (১) অন্যভাষা থেকে সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করেন, অপরদিকে (২) সংস্কৃতভাষা থেকে ইংরেজিভাষায় অনুবাদ করেন। প্রথমটি বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত।[১]

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। পহ্লবরাজ Gondophernes খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। কথিত আছে তাঁর সময়ে যিশুখ্রিস্টের শিষ্য St. Thomas ধর্মপ্রচারের জন্য এদেশে আসেন এবং এদেশেই দেহরক্ষা করেন। ঐতিহাসিকরা বলেছেন Gondophernes প্রভৃতি রাজারা খ্রিস্টধর্মের প্রতি বেশ উদারতা দেখিয়েছেন।

অনেককাল পরে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মে তারিখে ভাস্কা-ডা-গামা কালিকটের উপকূলে পৌঁছান। কালিকটের রাজা তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি কি জন্য এসেছেন। তার উত্তরে ভাস্কো-ডা-গামা জানান "মশলাপাতি ও খ্রিস্টানের জন্য"। সুতরাং দেখা যায় যে য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অন্যতম প্রধান ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা।

পোর্তুগীজ পাদরি Manoel da Assumpcam-এর বাংলাভাষায় লেখা খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"[১ক] ই প্রমাণ করে যে পাদরিরা লৌকিক ভাষায় ধর্মপ্রচার করতে কতটা উৎসুক ছিলেন। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত ভূষণার রাজপুত্র দোম-আন্তনিও খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য "ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদ"[২] নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

পোর্তুগীজদের পর অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতিও ভারতে আসতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ বণিকগণ ভারতে আসা শুরু করে। প্রথমদিকে অবশ্য ব্রিটিস-ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির সাহেবরা পাদরিদের এদেশে আসা ভাল চোখে দেখতেন না।[৩] তাঁরা মনে করতেন জোর করে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ফলে এদেশের অভিজাত সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হবেন এবং ব্যবসাবাণিজ্যে বাধা দেবেন। যাই হোক অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে য়ুরোপীয় পাদরিরা বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচারে বেশ উদ্যোগী হয়ে উঠেন এবং

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের চেষ্টা চলতে থাকে।

যদিও ষোড়শ শতাব্দী থেকেই দক্ষিণভারতে স্থানীয়ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ আরম্ভ হয়, তবে এইসব অনুবাদের নমুনা বিশেষ পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেই এগুলি দুষ্প্রাপ্য হয়েগিয়েছিল। এ সম্পর্কে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"Translations of Christian literatures into oriental languages has started from the time of Fr. Xavier, if not earlier, but very few were found to be existing at the end of the 18th century. The only one copy of Christian Doctrina, printed in Tamil at Goa in 1578 is still existing. Translation of scriptures into Indian languages had not been encouraged even after Fr. Xavier.[8]

শ্রীরামপুর মিশন ও বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ ঃ

শ্রীরামপুর মিশনই বাইবেলের অনুবাদের, বিশেষত দেশীয়ভাষায় অনুবাদের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে এবং রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী তাঁর যাজক ভ্রাতাদের সহযোগিতায় বাইবেল অনুবাদের কাজ শুরু করেন। অবশ্য তার আগেই জাহাজের চিকিৎসক জন টমাস তাঁর মুনসি রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেলের বাংলা অনুবাদের কাজে ব্রতী হন।

অন্যান্য ভারতীয়ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাতেও বাইবেলের আক্ষরিক ও ভাবানুবাদের চেষ্টা চলতে থাকে। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বাইবেলের অনেকগুলি সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[৫] "এর কোনটি বা হিব্রু কোনটি বা গ্রিকভাষায় লিখিত বাইবেল থেকে অনুদিত হয়েছে। আবার কোন কোনটি দেশীয় শাস্ত্রগ্রন্থের ধরণে লেখা।[৬]

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলাভাষায় বাইবেল প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের এটিই প্রথম গ্রন্থ এবং বাংলাভাষায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থও এটিই। বহুভাষাবিদ্ উইলিয়ম কেরী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ আরম্ভ করেন। তিনি এবং তাঁর সহযোগী শ্রীরামপুরের যাজক ভ্রাতৃগণ মনে করতেন যে মাতৃভাষাতে বাইবেলের অনুবাদ ও প্রচার করাই খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতভাষাতেও বাইবেলের অনুবাদের উদ্যোগ আরম্ভ হয়।

শ্রীরামপুর মিশনের যাজকরা বাইবেল অনুবাদের আর্থিক সহায়তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের বিষয় চিন্তা করেছিলেন। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে Propos-

als for subscription for translating the Holy Scriptures নামে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞাপনে উইলিয়ম কেরী ছাড়াও জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, উইলিয়ম মুর, জোশুয়া রো এবং ফেলিক্স কেরী স্বাক্ষর করেন। স্থির হয় সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠি, গুজরাটি, ওড়িয়া, কর্ণাটকি, তেলিঙ্গা, ব্রহ্মদেশীয়ভাষা, অসমীয়া, ভুটিয়া, তিব্বতী, মালয়ী ও চিনাভাষায় এই অনুবাদগুলি রচিত হবে। মিশন কর্তৃপক্ষ মনে করতেন, এতগুলি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করার যোগ্যতা তাঁরা অর্জন করেছেন, কিন্তু অর্থের অভাবই প্রধান অন্তরায়।[৭] সুতরাং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বাইবেলের গ্রাহক সংগ্রহের সাহায্যে তাঁরা অর্থাভাবের সমস্যাটি সমাধান করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য বাংলাভাষায় বাইবেলের অনুবাদ অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং সংস্কৃতভাষায় বাইবেলের অনুবাদও আরম্ভ হয়েছিল ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দেই।[৮]

বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়মঃ

কেরী প্রমুখ শ্রীরামপুর মিশনের যাজকরা অনুবাদের ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম নির্ধারণের প্রস্তাব করেন।

প্রথমত ঃ যে ভাষায় বাইবেল অনূদিত হবে অনুবাদককে সেই ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং সেই ভাষার ব্যাকরণ, শব্দকোষ ইত্যাদি রচনাতেও কার্যকর সাহায্যের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

দ্বিতীয়ত ঃ অনুবাদের প্রথম পর্যায়ে দেশীয়-পণ্ডিতদের সহায়তা গ্রহণ হবে অপরিহার্য।

তৃতীয়ত ঃ গ্রন্থটি মুদ্রিত হওয়ার আগে যথেষ্ঠ সংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

চতুর্থত ঃ প্রতিটি অনুবাদের ভাষা পর্যালোচনা ও সংশোধন এবং অন্য ভাষার অনুবাদের সঙ্গে তুলনা, একটি একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

পঞ্চমত ঃ যথেষ্ঠ সংখ্যক গ্রাহক সংগৃহীত হলে তবেই গ্রন্থটি মুদ্রিত হবে।

ষষ্ঠত ঃ মুদ্রণের পক্ষে যথেষ্ঠ অর্থ সংগৃহীত হলেই তবে পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়া হবে।

সপ্তমত ঃ মুদ্রণ চলাকালীন পুস্তকটি সংশোধন ও পরিমার্জন চলতে থাকবে।

অষ্টমত ঃ মুদ্রিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতদের কাছ থেকে অনুবাদ সম্পর্কে শংসাপত্র সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক।[৯] উল্লিখিত নিয়মগুলির অন্তত কতকগুলি বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছিল। দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে কেরী নিজেই বলেছেন—"I constantly avail myself of the help of the learned natives and I shall think it criminal not to do so but I do not commit my judgement to any one".[১০] দেশীয় পণ্ডিতদের

সাহায্য ব্যতিরেকে যে লৌকিক ভাষায় যথাযথ অনুবাদ সম্ভব নয়, এ বিষয়ে কেরী

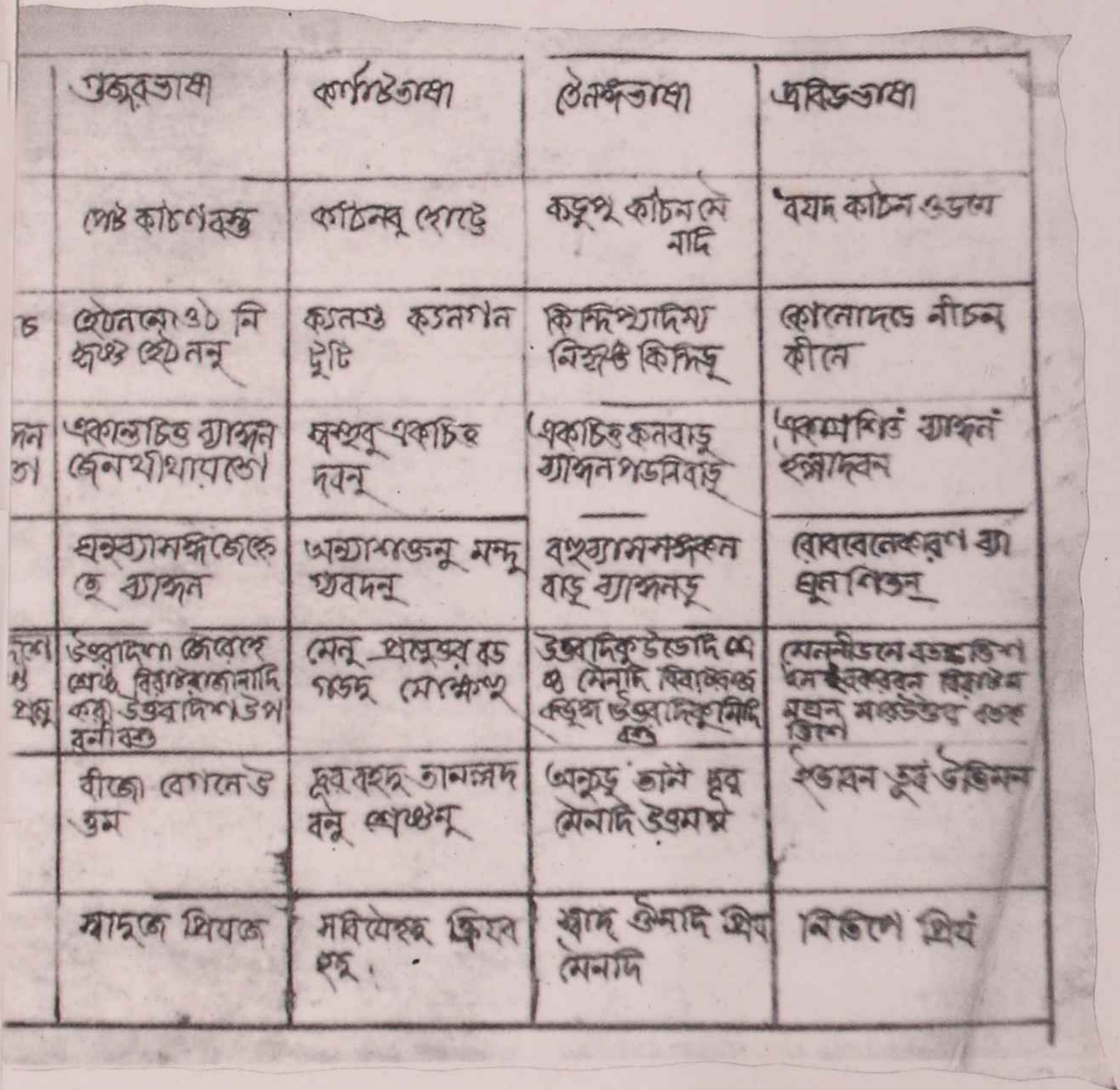

	গুজরভাষা	কর্ণাটভাষা	তৈলঙ্গভাষা	দ্রাবিড়ভাষা
	পেট কাচণবস্তু	কাচনবু দোড়ে	কডুপু কাচনসে নাদি	বয়দ কাচন ওডলে
চ	প্রেটনলো ওচ নি ক্ষুধ হেটনমূ	ক্যনগু কয়নগান টুটি	কিন্দিপ্যাদিম্য নিঃপ্র কিন্দিবু	কোলোদডে নীচন কীনে
দন তা	একান্তচিত্ত ব্যাঞ্জন জেনথীথাপতো	স্বপ্নবু একাচিত্ত দবনু	একাচিত্তকনবাডু ব্যাঞ্জন পডনিবাড়ু	একাগ্রশিতং ব্যাদ্দলং হল্লাদ্বল
	ঘরস্ব্যাসন্ধীজেকে ছে ব্যাঞ্জন	অন্যাশজনু মন্দু স্থবদনু	বহুব্যাসনঙ্গ্বুন বাডু ব্যাঞ্জনডু	বোবরেলেক্করণ ব্যা ক্ষুন নিত্তন
[illegible]	উত্তরাদিশা জেবেদে শ্রেষ্ঠ বিরাজমানাদি কর্তা উত্তরাদিশা উপ বুনীবস্তু	মেনু প্রভুত্ত্বর বড গডেহু সোক্ষেপু	উত্তরাদিকু উত্তোদি শে ঝু মেনাদি বিরাজিত্ত কর্তৃপ্র উত্তরাদেকু নাদি বস্তু	মেলনীডলে বড় [illegible] বল [illegible] মরড উত্তর [illegible]
	বীজো বোলে উত্তম	ক্ষুব বহহু তানলাদ বনু শ্রেষ্ঠনু	অনুচু তানে ক্ষুব মেনাদি উত্তমশ্রে	[illegible] উত্তিমন
	স্বাদুজে প্রিয়জে	মবিয়েহহ ক্রিয়র হুদু।	স্বাদ ঔমাদি প্রিয় মেনাদি	নিত্তিলে প্রিয়ং

বাইবেল সোসাইটি'র কাছে পাঠান। সংস্কৃত অনুবাদটির মূল গ্রিকভাষায় রচিত বাইবেল। রেভারেণ্ড ব্রাউন গ্রন্থটির আক্ষরিক অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। The Bible of

* বইটি শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরিতে সযত্নে রক্ষিত আছে এবং লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ অনুবাদকরূপে উইলিয়ম কেরীর নাম নির্দ্দিষ্ট করেছেন।

als for subscription for translating the Holy Scriptures নামে একটি

বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছিল। দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে কেরী নিজেই বলেছেন—"I constantly avail myself of the help of the learned natives and I shall think it criminal not to do so but I do not commit my judgement to any one".[১০] দেশীয় পণ্ডিতদের

সাহায্য ব্যতিরেকে যে লৌকিক ভাষায় যথাযথ অনুবাদ সম্ভব নয়, এ বিষয়ে কেরী খুবই সচেতন ছিলেন; তাই তিনি অনুবাদের কাজে দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্য না নেওয়াকে 'অপরাধ' বলেছেন। অন্যত্রও তিনি অনুবাদের কাজে বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাহায্যের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন।

সংস্কৃত নিউটেস্টামেন্ট ঃ

বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি নিউটেস্টামেন্ট বা 'নতুন নিয়মে'র অনুবাদ। গ্রিক ভাষায় রচিত বাইবেলকে অবলম্বন করে এটি রচিত হয় এবং অনুবাদ করেন উইলিয়ম কেরী। এই অনুবাদের কাজে কেরী দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়েছিলেন, সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত বহুশাস্ত্রবিদ্ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপত্র নেই। আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ—"ঈশ্বরস্য সর্ব্ববাক্যানি/যন্মনুষ্যাণাং ত্রাণায় কার্য্যসাধনায় চ প্রকাশিতং/তদেব/ধর্ম্ম পুস্তকং/তস্যান্তর্ভাগঃ/......[১১] প্রভু তারক যিশুখ্রীষ্ট বিষয়কঃ/ যাবনিকভাষাৎ আকৃষ্য সংস্কৃত ভাষয়া লিখিতঃ/ শ্রীরামপুরে মুদ্রিতঃ/ ১৮০৮"। বইটিতে অনুবাদকের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।* বইটিতে কোন সূচীপত্র নেই, নেই কোন শুদ্ধিপত্রও। বাইবেলের কোন কোন সংস্কৃত অনুবাদে সূচীপত্র সংযোজিত হয়েছে।

গ্রন্থটির প্রারম্ভেই 'মঙ্গল সমাচারো মাতিউ-রচিতঃ'। St. Mathew র এই মঙ্গল সমাচারে আঠাশটি পর্ব আছে। পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে পর্বের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন—"সপ্তবিংশতিপর্ব্ব যথা মাতিউ" অথবা অষ্টবিংশতিপর্ব্ব মাতিউ রচিতঃ"। মার্ক, লূক, যোহনের মঙ্গলসমাচারও এই অনুবাদের অন্তর্ভূক্ত। মার্ক প্রভৃতির পুস্তকগুলিও পর্বে (Book) বিভক্ত। এক একটি পর্বের শেষে 'আমেন' শব্দটি যথাযথ রক্ষিত হয়েছে, শব্দটিকে সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত করার কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। মঙ্গল-সমাচারগুলির পর বিভিন্ন সন্তের লিখিত পত্রের (Epistle) অনুবাদ আছে, যেমন—"যআকুব প্রেরিতস্য সাধারণং পত্রং", "পিতর প্রেরিতস্য সাধারণং পত্রং"।

The Bible of Everyland নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বাইবেলের নিউটেস্টামেন্টের সংস্কৃত অনুবাদ শুরু হয় ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে। রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন গ্রন্থটির একটি কপি লন্ডনের 'ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি'র কাছে পাঠান। সংস্কৃত অনুবাদটির মূল গ্রিকভাষায় রচিত বাইবেল। রেভারেণ্ড ব্রাউন গ্রন্থটির আক্ষরিক অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। The Bible of

---

* বইটি শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরিতে সযত্নে রক্ষিত আছে এবং লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ অনুবাদকরূপে উইলিয়ম কেরীর নাম নির্দ্দিষ্ট করেছেন।

Everyland গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, যে এই বাইবেলটি কেরী নিজে মূল গ্রিক গ্রন্থ থেকে সরাসরি অনুবাদ করেন। ১৮০৮ সনে ফুলারের কাছে লেখা চিঠিতে কেরী নিজেই বলেছেন— "......three of the translations i.e. Bengalee, Sungskrita and Hindooshanee, I have translated by my own hand", পরে কেরী জোশুয়া মার্শম্যানের সাহায্যে বইটির প্রতিটি ছত্র মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। কেরী সাধারণত পণ্ডিতদের অনুবাদ সংশোধন করে দিতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি নিজে বইটির আদ্যন্ত লিপিকরদের শ্রুতিলিখন (dictation) দিয়েছেন।

St. Mathew-র রচিত মঙ্গল সমাচারের সংস্কৃত অনুবাদের কিছু নমুনা এই প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে—"তস্মিন্‌কালে যোহোদীয়ারণ্যে ঘোষয়ন্ স্বর্গরাজ্যং সন্নিধিবর্ত্ত ততঃ পরমানসং কুরুতেতি ব্রুবংশ্চ যোহনোঽবগাহক আজগাম যতোঽমস্তি কথিতো যিশোইহা ভবিষ্যদ্বক্ত্রেতি বদতা শব্দো বনে ইতি শব্দায়মানস্য যিউহঃ পন্থানং পরিষ্কুরুত মার্গং শরলঞ্চ কুরুত"। ১৮০৩ সনে নিউটেস্টামেন্টের যে বাংলা অনুবাদ শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়, সেই গ্রন্থ থেকে উল্লিখিত অংশের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হল—"স্বর্গরাজ্য সান্নিধ্য অতএব পরাগমন কর একথা ঘোষণা করিয়া কহিতে ২ যোহন ডুবক সেকালে যিহুদা দেশের অরণ্যে আইলেন। যিশয়াইহা ভবিষ্যত বক্তার প্রমুখাৎ যাহার বিষয় এই কথা কহা গেল অরণ্যে চীৎকারকরা একজনের এ রব যিহুদার পথ প্রস্তুত কর তাহার পথ শোজা করহ।"[১২]

উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত অনুবাদের আরও কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে— "অনন্তরং অনুপস্থিতে দিনে পেন্তিকস্তে আসন্ সর্ব্বে একমবসম একত্র তথাজায়ত অস্মাৎ স্বর্গাৎ শব্দো যৎ বেগবান্ বায়ুর্বলবাংশ্চ অপূর্যত সর্ব্বং গৃহং যত্রাসন্ বিশন্তঃ। তথাদৃশন্ত তেভ্যো দ্বিধা জিহ্বা যথাগ্নি রবিশ্চ উপরি এবৈকেস্য তেষাং। অপূর্যন্ত চ সর্ব্বে ধর্ম্মাত্মনা উপচক্রমিরে।" ("তাঁহারা সকলে একস্থানে সমবেত ছিলেন। আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল এবং যে গৃহে তাঁহারা বসিয়াছিলেন সেই গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল এবং তাঁহাদের প্রত্যেকজনের উপর বসিল।")[১৩]

সংস্কৃত ওল্ডটেস্টামেন্ট ঃ

বাইবেলের ওল্ডটেস্টামেন্টের সংস্কৃত অনুবাদ শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিরও প্রচ্ছদপত্র নেই, নামপত্রটি এইরূপ— "ঈশ্বরস্য সর্ব্ববাক্যং/ যন্মনুষ্যানাং ত্রাণায় কার্য্যসাধনায় চ প্রকাশিতং/ তদেব আদ্যান্তভাগাত্মকং ধর্ম্মপুস্তকং/ তস্যাদিভাগঃ/ মোশহা প্রকাশিতব্যস্য/যিশরএল রাজ্য বিবরণং / গীতাদি পুস্তকানি /আচার্যৈ প্রকাশিত বাক্যানি/এতচচতুষ্টয়াত্মকঃ / তস্যান্তর্গতং

যিশরএলরাজ্যবিবরণং/ এবরিভাষাৎ আকৃষ্য সংস্কৃত ভাষয়া লিখিতং। শ্রীরামপুরে মুদ্রিতং/ ১৮১১

নিউটেস্টামেন্টের মতো এই গ্রন্থটিও দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত। গ্রন্থটি দশটি পর্বে বিভক্ত, যথা—১) 'যিয়োশুঅবিষয়কং পুস্তকং', ২) 'বিচার পুস্তকং', ৩) 'অথহুতপুস্তকং', ৪) 'সামুএলবিষয়ক পুস্তকং', ৫) 'সামুএলবিষয়কং দ্বিতীয়পুস্তকং', ৬) 'রাজ্য বিষয়ক প্রথম পুস্তকং', ৭) 'কালবিবরণ প্রথম পুস্তকং', ৮) 'এজর পুস্তকং', ৯) 'নিখেমিয়াসপুস্তকমিদং' এবং ১০) 'এস্টরবিষয়কপুস্তকমিদং'।

ওল্ডটেস্টামেন্টের ভাষার কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—"সর্ব্বস্থানং যত্র যুষ্মাকং পাদতলং বিন্যস্যতি যুষ্মভ্যমদাং তদ্যথাভাষে মোশহং অরণ্যাদেতল্লবনোনাচ্চ বৃহন্নদীপর্য্যন্তং ফরাতনদী পর্য্যন্তমেব খতীয়ানাং সর্ব্বদেশং বৃহদর্ণবপর্য্যন্তমস্তদিশি ভবিষ্যতি যুষ্মাকং সীমা"।

("আমি মোশহকে যেমন করিয়াছি তেমন যে প্রত্যেক স্থানোপরি তোমার পদতল পড়ে সে প্রত্যেক স্থান তোমাকে আমি দিয়াছি। অরণ্য এবং লিবানোন অবধি করিয়া মহানদী এবং ফরাত নদী পর্যন্ত খিতীয়দের তাবদ্দেশ এবং সূর্যাস্তস্থানেরদিগে মহাসমুদ্র পর্যন্ত তোমার সীমা হইবে)"[১৪]

এই অনুবাদ গ্রন্থের ভাষার আরও একটু উদাহরণ উদ্ধৃত হল—"অনন্তর রাজা আরণাহমুবাচ তন্নেতি কিন্তু মূল্যেন চেক্রীষিষ্যে যিউবায় মদীশ্বরায় ন হোষ্যামি ব্যয়রহিতহব্যানি। অথ দাউদঃ খলং বলীবর্দ্দাংশ্চাক্রীণাৎ পঞ্চাশদ্রূপ্যশেকলৈঃ অনন্তর দাউদস্তত্র বেদিমুদগ্রণাৎ যিউহায় অজুহোচ্চ হব্যানি।"

("পরে রাজা আরাউণাহকে কহিল তাহা নয় কিন্তু আমি মূল্যদ্বারা নিশ্চয়ে তাহা তোমার স্থানে ক্রয় করিব এবং যাহাতে আমার কিছু ব্যয় নাই তাহা আমি আপনার ঈশ্বর যিহুয়ের উদ্দেশ্যে হব্যরূপে নিবেদন করিব না। অতএব দাউদ পঞ্চাশ শেকল রূপাতে সে খামার ও গরু ক্রয় করিয়া লইল। পরে দাউদ সে স্থলে যিহুয়ের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদী গাঁথিয়া হোম ও স্বস্ত্যয়ন নিবেদন করিল।")[১৫]

শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরিতে বাইবেলের আরও কয়েকটি সংস্কৃত অনুবাদ পাওয়া গেছে। এই অনুবাদ গ্রন্থগুলির প্রচ্ছদপত্রও নেই, আখ্যাপত্রও নেই। সুতরাং এগুলির অনুবাদকের নাম, প্রকাশের স্থান, প্রকাশকাল কিছুই জানা যায় না। নামপত্রহীন এইরকম একটি গ্রন্থ 'Poetical Books' এর অনুবাদ। এই অনুবাদ গ্রন্থটিতে পুস্তকের সংখ্যা চার—'আয়ুবপুস্তকম্', 'গীত সংহিতা', 'সুলেমানোপদেশঃ' এবং 'পরমগীতম্'।

বাইবেল ট্র্যানস্লেসন সোসাইটি তাঁদের প্রকাশিত ওল্ডটেস্টামেন্টের তৃতীয় খণ্ডে এই বইগুলি অন্তভূর্ক্ত করেন, প্রকাশকাল ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু উক্তগ্রন্থের ভাষার সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থটির ভাষার কোন সাদৃশ্য নেই। উইলিয়ম কেরীর নামে প্রচলিত এই

গ্রন্থটির ভাষা সাবলীল নয়। নিম্নলিখিত উদাহরণেই ভাষার আড়ষ্টতা স্বপ্রকাশ—"ঊষদেশে একজন আসীৎ তস্য নাম আয়োবঃ। স মনুষ্য সম্পূর্ণধর্ম্ম ঋজুরীশ্বরাদ্বিভ্যৎ কুকর্ম্মণো বিরতাঞ্চাসীৎ তস্য সপ্তপুত্রাস্ত্রিস্র পুত্র্যশ্চাজয়ন্ত......" ইত্যাদি ("ঊষ দেশে আয়োব নামে একজন ছিল। সে জন সম্পূর্ণধর্ম্ম ও সরল ও ঈশ্বর ভয়কারী ও কুক্রিয়া পরাঙ্মুখ। তাহার সাতপুত্র তিন কন্যা ছিল।")[১৬]

ভাষার আড়ষ্টতা থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রথম যুগের অনুবাদ। দায়ুদের 'গীতসংহিতা' ও 'পরমগীতম্'ও গদ্যে অনুবাদ করা হয়েছে, ছন্দে নয়। দায়ুদের গানের সামান্য অংশ উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হল—"হে যিহূহ মাং রক্ষ যত ত্বয়ি বিশ্বসিমি। যিহূহ মৎপ্রভুস্ত্বং মমভদ্রং তৎ পর্য্যন্তং ন পৃথিবীস্থপুণ্যবদ্ভ্যস্তু শ্রেষ্ঠভ্যঞ্চ যেষু মৎ সর্ব্বতুষ্টিঃ" (গীতসংহিতা ষোড়শগীতম্)। উইলিয়মকেরী এই অংশের বাংলা অনুবাদ করেছেন "হে প্রভো আমাকে রক্ষা কর যেহেতুক তোমাতে আমার ভরসা হে আমার আত্মন তুমি যিহূহকে ইহা কহিয়াছ যে তুমি আমার ঈশ্বর আমার ধর্ম্ম তোমা পর্য্যন্ত ব্যেপে না। কিন্তু পৃথিবীতে যে পুণ্যবান তাহারদিগ পর্য্যন্ত ব্যেপে এবং তাহারদিগতে আমার সকল সন্তোষ সে উত্তম লোকেরদিগ পর্য্যন্ত ব্যেপে।"[১৭]

বাইবেল ট্র্যানস্লেসন সোসাইটি প্রকাশিত বাইবেলের তৃতীয় খণ্ডে উক্ত গীতটি ছন্দে অনূদিত হয়েছে—

"হে মদীশ্বর মাং রক্ষ যতো বিশ্বসিমি ত্বয়ি।
পরেশং মন্মনো ব্যক্তি ত্বমেবাসি প্রভুমর্ম।।
ক্ষেমং তদ্ব্যতিরিক্তং হি মম কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
পরিত্রাণমহং সঙ্গো ধরণীতলবাসিনাং।।"

কেরীর নামে প্রচলিত গ্রন্থটিতে কমা ইত্যাদি যতি চিহ্ন নেই, মাঝে মাঝে পংক্তির নীচের দিকে ফুটকির (.) মতো চিহ্ন আছে, মনে হয় সেগুলি মূলের যতি চিহ্ন।

আখ্যাপত্রহীন আরেকটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে, সেটি Prophetical Book এর অনুবাদ। বাইবেল ট্র্যানস্লেসন সোসাইটির পক্ষে ব্যাপটিস্ট মিশন Prophetical Book-এর যে অনুবাদ প্রকাশ করেন সেটির নাম 'যিশয়িয়াদীনাং ভবিষ্যবাদিনাং'। তাঁদের প্রকাশিত অপর একটি গ্রন্থের নাম 'যিশায়িয়স্য ভবিষ্যদ্বাক্যানি।' কিন্তু আখ্যাপত্রহীন যে অনুবাদ গ্রন্থটি পাওয়া গেছে, তার নামকরণ করা হয়েছে 'যিশাইয়াহ আচার্যপুস্তকং'। কেরী লাইব্রেরির মতে এই গ্রন্থটিরও অনুবাদক উইলিয়ম কেরী। তাঁরা গ্রন্থটির রচনাকাল নির্দ্দেশ করেছেন ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ।

আমাদের মনে হয় কেরী লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষের মতই সমর্থনযোগ্য। উল্লিখিত সংস্কৃত গদ্য অনুবাদ দুটির ভাষা প্রসাদ গুণ বর্জিত। ভাষা অত্যন্ত আড়ষ্ট, মূলের আক্ষরিক অনুবাদ করার জন্য যান্ত্রিকভাবে মূলের অন্বয়কে অনুসরণ করে একটি শব্দের সঙ্গে

আরেকটি শব্দকে যোগ করা হয়েছে; যা কোন বিদেশীভাষা থেকে প্রাথমিক অনুবাদের ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই সূচনা করে। এই ভাষা কেরীকৃত বাইবেলের বাংলা অনুবাদের প্রথম সংস্করণের ভাষাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৮] বাইবেল ট্র্যানস্লেসন সোসাইটির অনুবাদের সঙ্গে এই গ্রন্থ দুটির ভাষার কোন সাদৃশ্য নেই। সবদিক বিবেচনা করে মনে হয় উইলিয়ম কেরীই অনামাঙ্কিত সংস্কৃত গদ্য অনুবাদ দুটির রচয়িতা।

ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

উইলিয়ম কেরীর বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের ভাষায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কেরী তাঁর অনুবাদের ভাষাকে যথাসম্ভব আক্ষরিক করার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি, রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন কেরীর আক্ষরিক অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ওল্ডটেস্টামেন্টের বিচার পুস্তকের প্রথম পর্বের কিছু অংশ এই বৈশিষ্ট্যের নমুনারূপে উদ্ধৃত হল—"যিহোশুআ মরণান্তরং যিশরএলসন্তানা অজিজ্ঞাসন্ যিউহং বচনেন। কঃ পুরোগমিষ্যত্যস্মাকং কনআনীআন্ প্রতি তৈ সহ যোদ্ধুং অথ যিউহো২ব্রবীৎ যিহোদেহো গমিষ্যতি পশ্যাদাং দেশং তস্য হস্তে। অথ যিহোদহাহ শিমআউণং স্বভ্রাতরমাগচ্ছ মাং নিকষা মমাধিকারে অথ যোৎসামহে কনআনীয়ান্ প্রতি অহমপি গমিষ্যামি সহ ত্বয়া অধিকারে অথ শিমআউনোঽগচ্ছৎ সহ তেন।"

("(১) অপর যিহোশুআর মরণের পর এমত হইল যিশরাএলের সন্তানেরা একথা কহিয়া যিহুহকে জিজ্ঞাসা করিল কনআনীয়েরদের প্রতিকূলে যুদ্ধকরণার্থ আমাদের নিমিত্তে প্রথম তাহাদের বিরুদ্ধে কে উঠিয়া যাইবে। (২) তাহাতে যিহুহ কহিলেন যিহুদাহ্ যাইবে দেখ আমি তাহার হস্তে দেশ অর্পণ করিয়াছি। (৩) পরে যিহুদার আপন ভ্রাতা শিমিওনকে কহিল আমার সহিত আমার বাঁটে উঠিয়া আইস যে আমরা কনআনীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করি এবং আমিও তোমার সহিত তোমার বাঁটে যাইব তাহাতে শিমিওন তাহার সহিত গেল।")

উল্লিখিত অংশটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মূলের প্রতি অত্যন্ত আনুগত্য বশত শব্দবিন্যাস সাবলীল নয় এবং অন্বয় আড়ষ্ট। যদিও সংস্কৃতভাষা যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক এবং এই ভাষায় কর্তা, কর্মাদি কারকের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব্যবহারের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই, তবু এই অনুবাদের ভাষার পদবিন্যাস অন্বয়ের সাবলীলতা নষ্ট করেছে। এই ভাষা পাঠের মূহূর্তেই তাৎক্ষণিক অর্থগ্রহণ সম্ভব হয় না, অর্থগ্রহণে কিছুটা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, ফলে অর্থগ্রহণ সময় সাপেক্ষও বটে।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

উল্লিখিত অংশে ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন—অজিজ্ঞাসন,

গমিষ্যতি, অব্রবীৎ ইত্যাদি। গম্ ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে— গমিষ্যতি, গমিষ্যামি, আগচ্ছ, অগচ্ছৎ ইত্যাদি। কৃদন্ত বিশেষণ অপেক্ষা বিভক্তি নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ ব্যবহারের প্রতি কেরীর প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতূধস্ব (পৃঃ ৪), অপাবর্ত্তিষ্যধব (পৃঃ ৪), সেবিষ্যামহে (পৃ-৫৭), যগমিষ্যতে (পৃ-৫৭), ক্ষমিষ্যতে (পৃ-৫৭) ইত্যাদি ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এই সব ক্রিয়ার ব্যবহার, আত্মনেপদী ক্রিয়া ব্যবহারের প্রতি কেরীর পক্ষপাত সূচিত করে। 'বলা' অর্থে 'গদ্' ধাতুর ব্যবহারই বেশী, যদিও 'কথ্' ও 'ভাষ্' ধাতুর ব্যবহারও আছে। কেরী সমধাতুজ ক্রিয়াও ব্যবহার করেছেন—"স্বাধিকারদেশমধিকরিষ্যথে"। নামধাতুর ব্যবহারও লক্ষিত হয়—"কেবলং বীরয়স্বাভিসমর্থয়স্ব" এখানে 'বীরয়স্ব' ও 'অভিসমর্থয়স্ব' নামধাতু। নিউটেস্টামেন্টের অনুবাদেও ইতস্তত নামধাতুর ব্যবহার আছে, যেমন লূকের মঙ্গলসমাচারে—"ধূপয়িতুং প্রবিষ্টস্য মন্দিরে ঈশ্বরস্য (প্রথমপর্ব্ব যথা লূকং, পঙ্‌ক্তি ৯) .

উপরে উল্লিখিত 'যোদ্ধুং অথ' ইত্যাদি অংশে 'যোদ্ধুম্ অথ' অথবা সন্ধি করে 'যোদ্ধুমথ' হওয়া উচিত ছিল। বস্তুত এই ধরণের প্রয়োগ বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।[১৮] এটি সাধারণভাবে শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস থেকে প্রকাশিত সংস্কৃত পুস্তকগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।[১৯]

যদিও আক্ষরিক অনুবাদের প্রচেষ্টায় কেরী মূলের প্রায় প্রতিটি শব্দকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুবাদ করেছেন, তবু সংস্কৃতভাষার সাধারণ প্রবণতায় ক্বচিৎ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারও লক্ষ্য যায়—"সর্ব্ববব্যবস্থানুসরণকরণীয়" (প্রথমপর্ব-পৃ-৪), শিবিরান্তরাদিলদেশধিকারায়, (প্রথমপর্ব পৃ-৪);'রাজগৃহছদিষু' (শামুএলবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকং একাদশপর্ব্ব, পংক্তি-২)।

ক্বচিৎ ভাবে সপ্তমীর ব্যবহার ভাষায় শ্রুতিমাধুর্যের সঞ্চার করেছে-'বৎসরে পরিবর্তমাণে রাজ্ঞাং নিষ্ক্রমণকালে' (শামুএলবিষয়ক দ্বিতীয়পুস্তকং একাদশ পর্ব, পঙক্তি-২) ;অথবা লোকেষু স্বেচ্ছয়া সমুপস্থিতেষু' (বিচারপুস্তকং পঞ্চম পর্ব্ব); 'এ', 'ষু' ইত্যাদি বিভক্তির পুনরুক্তিই এখানে ধ্বনি সৌকর্যের সৃষ্টি করেছে। উদাহরণগুলি ওল্ডটেস্টামেন্টের সংস্কৃত অনুবাদ থেকে গৃহীত।

কেরীর দিনপঞ্জী থেকে জানা যায় ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে তিনি দুপুর দুটো থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত বাংলা বাইবেলের প্রুফ দেখতেন এবং পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাহায্যে সেন্টম্যাথুর পুস্তকের অনুবাদ করতেন।[২০] কেরী নিজেও ভাল সংস্কৃত জানতেন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের Public Disputation-এর সভায় সংস্কৃতবিভাগের সঞ্চালক রূপে তিনি সংস্কৃতভাষায় ভাষণ দেন।[২১] সুতরাং কেরীর সংস্কৃত অনুবাদের ভাষা মোটামুটি নির্ভুল হবে এটাই আশা করা যায়।

অথচ কেরী লাইব্রেরিতে রক্ষিত বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদে বেশ কিছু অশুদ্ধ প্রয়োগ লক্ষিত হয়। এগুলি সব সময় মুদ্রণ প্রমাদও নয়। অনুস্বরের যথেচ্ছ প্রয়োগের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ওল্ডটেস্টামেন্টের আখ্যাপত্রে (পূর্বে উদ্ধৃত) 'আচার্যৈ' পদে বিসর্গের অভাব দেখা যায়, এটি মুদ্রণপ্রমাদও হতে পারে। কিন্তু "এবরি ভাষাৎ আকৃষ্য সংস্কৃত ভাষয়া লিখিতং" ইত্যাদি অংশে 'ভাষাৎ' পদটি মুদ্রণ প্রমাদ হতে পারে না। এখানে 'ভাষাৎ' শব্দটি 'ভাষায়াঃ' হওয়া উচিত ছিল অথবা সন্ধি করে বিসর্গের লোপে 'ভাষায়া, কোন ক্রমেই 'ভাষাৎ' নয়। এই রকম আরও কিছু অশুদ্ধ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়—

(ক) "পন্থানং পরিষ্কুরুত মার্গং শরলঙ্ক কুরুত" (মাতিউ রচিত দ্বিতীয়ং পর্ব্ব) এখানে 'সরল' পদের দন্ত্য সকার তালব্য শকারে পর্যবসিত হয়েছে।

(খ) "মহান্তি শক্তিমান্ সাধু চ তস্য নাম" (লূকের পুস্তক) এখানে পুংলিঙ্গ শব্দের ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ 'মহান্তি'।

(গ) "অথ পশ্য দূত ঈশ্বরস্য অদৃশ্যৎ....." (লূকের পুস্তক) 'অদৃশ্যৎ' শব্দের শুদ্ধরূপ 'অপশ্যৎ'।

(ঘ) ".......খ্যতিশ্চ প্রাগমৎ সর্ব্বস্মিন্ পরিতো দেশে হঅবিতৎ" (লূকের পুস্তক) 'পরিতঃ' শব্দের যোগে 'সর্ব্বস্মিন্' ও 'দেশে' পদদুটিতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া উচিত ছিল। এই রকম 'ঈশ্বরস্য পরিতঃ' ও ব্যবহৃত হয়েছে।

(ঙ) "যিশুস্তু মঞ্চন্ শব্দং মহান্তং প্রাণং তত্যাজ" (মার্কের পুস্তক) 'প্রাণ' শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এখানে একবচনান্ত প্রয়োগ হয়েছে। এইরকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের প্রুফ কেরী নিজে সংশোধন করতেন—এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—"Both the translator and two of his assistants went over the first proof and the second proof to bring the translation as near as possible to the original. The translator took the third proof to Carey, and they went over it as many more proofs necessary. It is evident that there was frequent consultation among the translators."[২২] এত সাবধানতা অবলম্বন করার পরও অশুদ্ধরূপগুলি কেমন করে দৃষ্টি এড়িয়ে গেল সেটি বিস্ময়ের ব্যাপার। অন্যান্য লৌকিক ভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রে কেরী দেশীয় পণ্ডিতদের অনুবাদ সংশোধন করে দিতেন; কিন্তু সংস্কৃত অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং অনূদিত অংশ লিপিকরদের কাছে মুখে মুখে বলে যেতেন। মনে হয় লিপিকররা অনবধানতা বশত যে প্রমাদ ঘটিয়েছেন, অতিব্যস্ততায় প্রুফ সংশোধনের সময় সেগুলি

কেরীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে; ব্যাপারটি এইভাবে ভাবা যেতে পারে।

প্রশংসাপত্র :

সংস্কৃত বাইবেল মুদ্রণের পর প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতদের শংসাপত্রও সংগৃহীত হয়েছিল। এবিষয়ে শ্রীরামপুর মিশনের Translation Memoir-এর অষ্টম খণ্ডে দুটি প্রশংসাপত্র উৎকলিত হয়েছে; একটি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত (জজ পণ্ডিত) রামজয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের, অপরটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত রামনাথ বাচস্পতি মহাশয়ের। প্রশংসা পত্র দুটি এখানে উদ্ধৃত হ'ল—"The testimony of Ramjoy Tarkalunkar, Chief Pundit in Supreme Court—সংস্কৃত ভাষয়া মুদ্রিতধর্ম্মপুস্তকং সংস্কৃতবোধশালিনামনায়াসেন বোধবিষয়ং নাল্পবোধশালিনাং তথা। ইতি বিজ্ঞপ্তিঃ বৈশাখস্য দ্বাদশদিবসীয়া লিপিরিয়ং—This translation of the scriptures which has been made into Sanskrit language, will be understood with ease by all who really understand Sungskrita language" এখানে যাঁরা অল্প সংস্কৃত জানেন তাঁরাও বুঝতে পারবেন "নাল্পবোধ-শালিনাংতথা" এই অংশ অনুবাদ করা হয়নি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধানপণ্ডিত রামনাথ বাচস্পতি উইলিয়ম কেরীকে লেখা একটি পত্রের মাধ্যমে প্রশংসাপত্র দেন। পত্রটি ইংরেজিতে লিখিত—"I have read the part of the Holy Book which you have sent me. The Sungskrit is perfectly correct. There are two or three trivial mistakes in the printing; but there is no fault in the language and diction".[২৩]

কিছু সমস্যা :

আমরা আগেই বলেছি, শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত নিউটেস্টামেন্টের এবং ওল্ডটেস্টামেন্টের সংস্কৃত অনুবাদ গ্রন্থের আখ্যাপত্রে অনুবাদকের নাম নেই। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিজন" গ্রন্থের পরিশিষ্টে উইলিয়ম কেরী লিখিত ও অনূদিত গ্রন্থের একটি তালিকা সন্নিবেশ করেছেন। সেখানে তিনি ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদগ্রন্থটির রচয়িতারূপে উইলিয়ম কেরীর নামই নির্দ্দেশ করেছেন; কিন্তু এই ব্যাপারে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমরা সমস্যাটির আলোচনা করছি।

The Bible of Everyland নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বাইবেলের নিউটেস্টামেন্টের সংস্কৃত অনুবাদ শুরু হয় ১৮০৩ সনে এবং শেষ হয় ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে। ঐ গ্রন্থে যোহনের পুস্তক থেকে উইলিয়ম কেরীর অনুবাদের ভাষাও উদ্ধৃত হয়েছে,

"আদৌ বাদ আসীৎ স চ বাদ ঈশ্বরেণ সার্দ্ধমাসীৎ স বাদ স্বয়মীশ্বর এবং স আদাবীশ্বরেণ সহ আসীৎ (১ ঃ ২) তেন সর্ব্ববস্তু সসৃজে সর্ব্বেষু দৃষ্টবস্তুষু কিমপি বস্তু তেনাসৃষ্টং নাস্তি। স জীবনস্যাকরঃ তচ্চজীবনং মনুষ্যাণাং জ্যোতিঃ (৩ ঃ ৪) তজ্জ্যোতিরন্ধকারে প্রচকাশে কিন্তু অন্ধকারস্তত্র জগ্রাহ (৫) যোহন নাম এক মনুজ ঈশ্বরেণ প্রেষয়াঞ্চক্রে তদ্ দ্বারা যথা সর্ব্বে বিশ্বসন্তি তদর্থং তজ্জ্যোতিষি প্রমাণং দাতুং সাক্ষিরূপেণ ভূত্বাগমৎ স স্বয়ং তজ্জ্যোতির্ন কিন্তু তজ্জ্যোতিষি প্রমাণং দাতুমগমৎ।"

কিন্তু শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরিতে রক্ষিত নিউটেস্টামেন্টের যে অনুবাদটি কেরীর নামে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে, সেই গ্রন্থে উক্ত অংশের পাঠ সম্পূর্ণ ভিন্ন—"(১/২) প্রথমে আসীৎ বাক্যং অথ বাক্যং আসীৎ সহেশ্বরেণ (৩) অথ তদ্বাক্যমাসীদীশ্বরং ইদমাসীৎ প্রথমে সহেশ্বরেণ সর্ব্বাণি তেনক্রিয়ন্ত ঋতে চ (৪) তং নাকারি একমেব যদকারি। তস্মিন্ জীবনমাসীৎ অথ তজ্জীবনামাসীদালোকা (৫) মনুষ্যাণাং অথ আলোকস্তিমিরে বভৌ তিমিরস্তুতন্নাগ্রহীৎ (৬) অভূন্মনুষ্যঃ প্রেরিত ঈশ্বর নাম্না যোহন ইতি স অগচ্ছৎ সাক্ষায় (৭) যৎ সাক্ষ্যয়েদধ্যালোকং তৎ প্রতীয়স্তেন। (৮) নাসীৎ স আলোকঃ কিন্তু যৎ সাক্ষ্যয়েদধ্যালোকং" (শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস প্রকাশিত নিউটেস্টামেন্টে, যোহনের পুস্তক, প্রথম পর্ব, পঙ্ক্তি ১-৮)।

উপরে উদ্ধৃত দুটি অনুচ্ছেদই কেরীর রচনারূপে প্রচলিত, অথচ উভয় উদ্ধৃতির মধ্যে ভাষার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং কেরী বাইবেলের নিউটেস্টামেন্টের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং সেই অনুবাদ ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কিন্তু কেরীর নামে প্রচারিত অনুবাদের দুটি গ্রন্থে বিধৃত একই অনুচ্ছেদের ভাষার দুস্তর পার্থক্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

মজা এই যে The Bible of Everyland গ্রন্থে যে অংশটি উইলিয়ম কেরীর রচনা হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে, সেই অংশটিই আবার 'ধর্ম্মপুস্তকস্য শেষাংশঃ' গ্রন্থে যোহনের পুস্তকে আছে, "ধর্ম্মপুস্তকস্য শেষাংশঃ" প্রকাশিত হয় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে।

The Bible of Everyland গ্রন্থের মতে উইলিয়ম কেরীর নিউটেস্টামেন্টের সংস্কৃত অনুবাদ ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আবার কেরী লাইব্রেরিতে রক্ষিত নিউটেস্টামেন্টের অনুবাদগুলির একটি ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কিন্তু পূর্বে উদ্ধৃত দুটি অংশের ভাষায় কোন সাদৃশ্য নেই। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কোন অনুচ্ছেদটি প্রকৃতই কেরীর রচনা। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার করলে দেখা যাবে কেরী লাইব্রেরির গ্রন্থটির ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। The Bible of Everyland গ্রন্থে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের তুলনায় এর ভাষা আড়ষ্ট, শ্রুতিমাধুর্যহীন। মূলের পদগুলির ক্রম রক্ষার একটা চেষ্টা শ্রীরামপুরের গ্রন্থটিতে দেখা যায়। "অভূন্মনুষ্য প্রেরিত ঈশ্বর নাম্না যোহন ইতি" ইত্যাদি অংশের সঙ্গে "যোহন নাম এক মনুজ ঈশ্বরেণ প্রেষয়াঞ্চক্রে" ইত্যাদি অংশের তুলনা

করলেই প্রথমটির ভাষার অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতা অনুমান করা যাবে। তাছাড়া 'মনুষ্য' শব্দের পরিবর্তে 'মনুজ' শব্দের ব্যবহার, 'আলোক' স্থলে 'জ্যোতি' দ্রবং 'সৃষ্ট' এই কৃদন্ত বিশেষণের প্রয়োগ পরবর্তী রচনাই সূচনা করে। কেরী লাইব্রেরির গ্রন্থের "সর্ব্বাণি তেনাক্রিয়ন্ত ঋতে চ(৪) তং ন নাকারি একমেব যদকারি" ইত্যাদি বাক্যের তুলনায় অন্যত্র উদ্ধৃত "তেন সর্ব্ববস্তু সসৃজে সর্ব্বেষু দৃষ্টবস্তুষু কিমপি বস্তু তেনাসৃষ্টং নাস্তি" বাক্যটি অনেক সাবলীল। প্রথম বাক্যটির অর্থগ্রহণই প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া দ্বিতীয় স্থলে মূলের ৩ ও ৪ পঙ্ক্তি দুটি একই সঙ্গে অনুবাদ করা হয়েছে, যেখানে শ্রীরামপুরের গ্রন্থটিতে দুটি পঙ্ক্তি পৃথক পৃথক অনুবাদ করা হয়েছে। সকলেই জানেন মূলের শুদ্ধতা রক্ষায় কেরী ছিলেন একনিষ্ঠ এবং কৃদন্ত বিশেষণ অপেক্ষা ক্রিয়ার ব্যবহারেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। এই সব কারণেই মনে হয় শ্রীরামপুরে রক্ষিত গ্রন্থটিই কেরীর মূল রচনা।

তাহলেও একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, "ধর্ম্মপুস্তকস্যাশেষাংশঃ" গ্রন্থে যোহনের পুস্তকের উল্লিখিত অংশের সঙ্গে Bible of Everyland যাকে কেরীর রচনা বলে উল্লেখ করেছেন তার আক্ষরিক মিল কিভাবে সম্ভব? এক্ষেত্রে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। ১৮৪১ সনে প্রকাশিত 'ধর্ম্মপুস্তকস্যাশেষাংশঃ' গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোকটি

"কুমারীং গর্ভিণীং পশ্য সা পুত্রং প্রসবিষ্যতে।
ইম্মানূয়েল তদীয়ং হি নামধেয়ং ভবিষ্যতি।।"

প্রায় একই ভাষায় ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত 'খ্রীস্টচরিতম্' গ্রন্থে পাওয়া যায়—

"কুমারীং গর্ভিণীং পশ্য সা পুত্রং প্রসবিষ্যতে।
ইম্মানূয়েল তদীয়ং হি নামধেয়ং ভবিষ্যতি।।"

আবার ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নিউটেস্টামেন্টের অনুবাদেও উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে—

"কুমারীং গর্ভিণীং পশ্য সা পুত্রং প্রসবিষ্যতে।
ইম্মানূয়েল ইত্যেব তস্য নাম ভবিষ্যতি।।"

মনে হয় পূর্ববর্তী গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অংশ ব্যবহার করা বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদগুলির সাধারণ ধারা ছিল এবং কেরীর অনুবাদের বিশেষ বিশেষ অংশ হয়তো পরবর্তী অনুবাদকেরা ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেরীর বাইবেলের বাংলা অনুবাদে ডাঃ টমাসের অনুবাদগুলি বিলীন হয়ে গেছে, আজ আর তাদের পৃথক করার কোন উপায় নেই।[২৪] 'ধর্ম্মপুস্তকস্যাশেষাংশঃ' গ্রন্থেও হয়তো কেরীর কৃত অনুবাদ থেকে উক্ত অংশ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে

হবে ডঃ ইয়েটস্ শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বাইবেল গ্রন্থগুলির ভাষার সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু তবু এ প্রশ্ন থেকেই যায় Bible of Everyland এর উদ্ধৃতি এবং শ্রীরামপুরের গ্রন্থের অনুচ্ছেদ এই দুটির ভাষার মধ্যে এত পার্থক্য কেন? হয়তো পরবর্তী কোন সংস্করণে কেরী ভাষার পরিমার্জনা করেছিলেন, যে সংস্করণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি, তবে সবটাই অনুমান, নিঃসন্দেহে কিছুই বলা যায় না।

বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ সম্পর্কে কিছু তথ্য ঃ

অন্যান্য ভাষার মতো বাইবেলের সংস্কৃতভাষার অনুবাদও প্রয়োজন অনুসারে চলতে থাকে। ১৮০৮ সনের একটি তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি St. Mathew র মঙ্গল সমাচারের সংস্কৃত অনুবাদ মুদ্রণের জন্য প্রেসে দেওয়া হয়েছে। বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত সারণী (table) থেকে—

Year	Language	Book	Page	Copies
1808	Sungskrita	N.T.		600
1811	”	Pentateuch	425	600
1815	”	Historical Books		1000
1818	”	Hagiographa		1000
1822	”	Prophetical Book		1000
1827	”	Book of kings		2000

বাইবেলের কিছু কিছু অংশ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল এবং ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ সমগ্র বা আংশিকভাবে ছাপা হয়েছিল মোট ছয় বার এবং মোট ছয়হাজার দুশকপি।[২৫] ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কেরী ব্যাপটিস্ট সোসাইটিকে সংস্কৃত অনুবাদের অগ্রগতি সম্পর্কে জানান—“In the Sungskrit the Historical books have been completed in the press. In this ancient language, therefore, the parent of nearly all the rest, three of the five parts into which we divide the scripture are both translated and published, the New Testament, the Pentateuch and the Historical books. Two remain, the Hagiographa, which is now put to press and the Prophetic books, the translation of which is nearly finished.”[২৬] বাইবেল অনুবাদের 7th memoir থেকে জানা যায় যে সংস্কৃত বাইবেলের

দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের জন্য প্রেসে প্রেরিত হয়ছে। সংস্কৃত বাইবেলের বিশেষ বিশেষ অংশ বারংবার অনূদিত হয়েছে। ১৮৩৪ সনের 10th memoir থেকে জানা যায়, উত্তরভারতে সংস্কৃত বাইবেলের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। সেই কারণে Pentateuch এর অনুবাদ মুদ্রণের জন্য প্রেসে প্রেরিত হয়েছে এবং মুদ্রণের অগ্রগতিও সন্তোষজনক।

এই memoir থেকে আরও জানা যায় যে, The book of Exodus পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং Historical book-এর দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ প্রায় সম্পূর্ণ। জোশুয়ার পুস্তক, বিচার পুস্তক, রূথ এবং স্যামুএল বিষয়ক দুটি পুস্তক দীর্ঘকাল পুনর্মুদ্রিত হয়নি। এগুলি এখন মুদ্রণোপযোগী করে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হবে—"As Dr. Carey has finished his improved edition of both the Old and New Testaments in Bengalee and those difficulties which impeded the operations of the press have been in a good degree surmounted, he is applying the Sanskrit version, which he hopes devine goodness will permit him to bring through the press, in an improved form, before he closes a life devoted to the work of translation nearly forty years."[২৭]

বাইবেলের অনুবাদ সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশনের বিখ্যাত ত্রয়ী, কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড, বিশেষভাবে উইলিয়ম কেরী প্রচুর ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন বাইবেলের অনুবাদের মাধ্যমেই খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা বিশ্বাস করতেন মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা করা সম্ভবপর। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রথমে বাংলা ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়েছিল, পরে মারাঠি, ওড়িয়া, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি চল্লিশটি ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়। এই অনুবাদের ব্যাপারে সংস্কৃত ভাষার একটি কার্যকরী ভূমিকা ছিল।

শ্রীরামপুর মিশনের কলেজের নির্দেশিকা পুস্তিকায় কেরী মার্শম্যান প্রমুখ যাজক ভ্রাতৃগণ প্রস্তাব করেছিলেন যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য দেশীয় খ্রিস্টান যুবকদের অবশ্য পাঠ্য হবে। উপযুক্ত কিছু ছাত্র গ্রিক ও হিব্রু ভাষায় শিক্ষিত হবে। বাল্যকাল থেকেই খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় থাকায় এই সব ছাত্ররা অনেক যথাযথ অথচ সাবলীল ভাবে বাইবেলের অনুবাদ করতে সক্ষম হবে।[২৮]

কেরীর ইচ্ছা ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে তাঁদের শ্রীরামপুর মিশনের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করবেন। এইসব পণ্ডিতব্যক্তি নিজনিজ মাতৃভাষাতেও পারদর্শী হবেন। সংস্কৃতভাষার সঙ্গে গ্রিক ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে, সুতরাং যিনি সংস্কৃত জানেন তিনি সহজেই গ্রিকভাষা শিখতে পারবেন। আর কেরী মনে করতেন এই তিনটি ভাষার মধ্যে সংস্কৃতভাষা শিক্ষাই সবচেয়ে কঠিন, তাই যিনি সংস্কৃত জানেন তাঁর পক্ষে গ্রিক ও হিব্রু ভাষা শেখা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

মিশন কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন গ্রিক ও হিব্রু ভাষায় জ্ঞান থাকলে মূল বাইবেল পড়া যাবে, ইংরেজিভাষার মাধ্যমের প্রয়োজন হবে না। যাঁরা এই তিনটি ভাষাতেই পারদর্শী হবেন তাঁদের কৃত অনুবাদ মূলের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত হবে। অনুবাদের ভাষাও সাবলীল ও সুষমামণ্ডিত হবে এবং বাইবেলের অনুবাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটবে। শ্রীরামপুর কলেজের নির্দেশিকা পুস্তিকায় এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"The natives thus qualified, and particularly christian natives trained up in the knowledge of Scriptures from their earliest youth, we may essentially hope for a translation, which shall combine fidelity to the original with all that beauty, phrase and ease of language, which are so desirable."[২৯]

একটি বিদেশীভাষা আয়ত্ত করা খুবই পরিশ্রমসাধ্য, এবং কোন বিদেশীই স্থানীয় মানুষের মতো সাবলীলভাবে স্থানীয়ভাষা লিখতে পারেন না। আর বিদেশী ব্যক্তিকে কেবল সংস্কৃতভাষা নয়, স্থানীয় ভাষাও শিখতে হবে। আর কেরী মনে করতেন সংস্কৃত না জানলে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ভালভাবে শেখা যায় না। তাই শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃপক্ষ মনে করতেন; বিদেশীরা লৌকিকভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করলে, সেই অনুবাদের ত্রুটি পরম্পরাক্রমে চলতেই থাকবে। তাই তাঁরা বলেছেন—"From these facts we are led to conclude that a native of India, already acquainted with the great parent of Eastern languages is fully competent to the study of Hebrew and Greek and few years of steady application will place him, in the studies of an equality with European student."

বিভিন্ন প্রসঙ্গে কেরী বার বার বলেছেন যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতভাষা থেকে উদ্ভূত। এই বিশ্বাস থেকে তিনি মনে করতেন যে, সংস্কৃতভাষায় যাঁদের অধিকার আছে তাঁদের পক্ষে বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া প্রভৃতি সগোত্র সমধর্মীয় (cognate) ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করা সহজসাধ্য।

কেরীর মতে ভারতবর্ষের প্রায় আঠাশটি ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত এবং এইসব ভাষার শব্দভাণ্ডারের দশভাগের নয়ভাগ শব্দই সংস্কৃত। উইলিয়ম কেরী বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃত শব্দের যে অনুপাত নির্ণয় করেছেন তাতে আতিশয্য থাকতে পারে তবে একথা সত্য যে ভারতীয় অনেক ভাষার শব্দভাণ্ডারেই তৎসম বা সংস্কৃত শব্দনির্বিচারে গৃহীত হয়েছে। এই সব ভারতীয় ভাষার পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। তাদের নিজস্ব শব্দভাণ্ডার আছে; ভাষায় ধাতু, বিভক্তি ইত্যাদির ব্যবহার স্বতন্ত্র, বাক্যগঠন প্রণালীতেও সাদৃশ্য নেই। কিন্তু কেরী মনে করতেন যাঁরা সংস্কৃতভাষা জানেন এবং মাতৃভাষায় যদি তাঁদের যথেষ্ট দখল থাকে তবে তাঁরা সহজেই সমগোত্রীয় অন্যভাষা

শিখতে পারেন এবং পরস্পরের সঙ্গে আলোচনাও করতে পারেন।

সংস্কৃতের সাহায্যে ভারতীয় অন্যান্য ভাষা শিক্ষাদান সহজ, এই বিশ্বাস থেকে কেরী আঠাশটি ভাষায় সংস্কৃত ভূ ধাতুর (হওয়া, to be) রূপ প্রদর্শন করেন। প্রথমে সংস্কৃত ধাতুরূপটি উপস্থাপিত করে পরে অন্যভাষায় 'হওয়া' (to be) ধাতুর বর্তমান ও অতীতকালে বিভিন্ন পুরুষ ও বিভিন্ন বচনে কিরূপ হয় তা উপস্থাপিত করেন। কেরীর ইচ্ছা ছিল চৌত্রিশটি ভাষায় উদাহরণ দেবেন, কিন্তু সম্ভব হয়নি।[২৯ক]

সংস্কৃত ভাষা শেখানোর প্রচেষ্টারূপে তিনি বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের অন্তর্গত 'প্রার্থনাপুস্তকটি, পৃথকভাবে পরিবেষণ করেন এবং বাংলা বাইবেলের 'প্রার্থনাপুস্তক' থেকে সংস্কৃত শব্দগুলিকে একত্রিত করে প্রকাশ করেন। কেরী মনে করেছিলেন, যে সব দেশীয় পণ্ডিত বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদকার্যে নিযুক্ত হবেন, তাঁরা হয়ত এইভাবে সংস্কৃতভাষার সাহায্যে মাতৃভাষাভিন্ন সমগোত্রীয় অন্যভাষার সঙ্গেও পরিচিত হবেন।

অনুবাদ সম্পর্কিত তাঁর এইসব ভাবনাচিন্তাকে অবশ্য তিনি বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যাপটিস্ট মিশনের অনুবাদ সম্পর্কিত পর্যালোচনার 7th memoir থেকে জানা যায় যে, বেশকিছু সংখ্যক দেশীয় পণ্ডিতকে বাইবেল অনুবাদের কাজে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা অনুবাদের কাজে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এই পণ্ডিতরা সংস্কৃত ও নিজনিজ মাতৃভাষা ছাড়া আরও তিন চারটি দেশীয় ভাষা জানতেন। আর অনুবাদ সম্পর্কে তাঁদের সমুচিত ধারণাও জন্মেছিল; তাঁরা জানতেন শব্দের পরিবর্তে শব্দ ব্যবহারই যথার্থ অনুবাদ নয়, মূলের বক্তব্যকে সঠিকভাবে পরিস্ফুট করাই অনুবাদের আদর্শ।[৩০] অনুবাদের এই আদর্শ সম্পর্কে কেরী বলেছেন—"This is a matter of such importance, that without it the very nature of a translation is misunderstood."

অনুবাদের কাজে দক্ষ এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা তাঁদের মাতৃভাষায় বা সমগোত্রীয় অন্যভাষায় বাইবেলের যে অনুবাদ রচনা করেন তা কেবলমাত্র মূলের প্রতি বিশ্বস্তই নয়, সেগুলির রচনারীতি ও প্রকাশভঙ্গীও অত্যন্ত উচ্চমানের। কোন য়ুরোপীয় অনুবাদকের পক্ষে স্বল্পসময়ে সেই দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। অনুবাদের কাজে এই দেশীয় পণ্ডিতগণ সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য। কেরী বলেছেন—"When such men are already prepared, it is wise to employ their knowledge and talents in forwarding the most important of all objects. The loss of such men a lapse of many years or even an age might fail to supply."[৩১]

কেরী মনে করতেন শ্রীরামপুর কলেজের যে সব ছাত্র সংস্কৃত, গ্রিক ও হিব্রুভাষায়

কৃতবিদ্য তাঁদের অনায়াসেই অনুবাদ কর্মের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। যে সব পণ্ডিত একাদিক্রমে অনুবাদের কাজ করছেন ছাত্ররা তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করতে পারে। Translation memoir থেকে আরও জানা যায় যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অভিজ্ঞ আঠারো বা কুড়িজন পণ্ডিত অনুবাদের কাজে নিযুক্ত হতেন। একজন য়ুরোপীয় কর্মাধক্ষ্য এই অনুবাদ কার্য পরিচালনা করতেন। সংস্কৃত বাইবেল ছিল অনুবাদের আদর্শ। এই পণ্ডিতরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতেন; কোন বিশেষ অনুচ্ছেদ বা বিশেষ প্রকাশভঙ্গী বা বাগ্ধারা সম্পর্কে পরস্পরের মত বিনিময় করতেন এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে য়ুরোপীয় পরিচালকের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারতেন। এমন কি উইলিয়ম কেরীর সঙ্গেও এই অনুবাদকরা মত বিনিময় করতে পারতেন—"They are able to converse with Carey on the meaning of any phrase or passage."[৩২] অবশ্য অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে কার্যসম্পন্ন করার জন্যও অনুবাদের কাজে দেশীয় পণ্ডিতদের নিয়োগ করা হত।[৩২ক]

এই পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘকাল অনুবাদ কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, ফলে অনুবাদের কাজে তাঁদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা ছিল। তাঁরা অন্যদের সাহায্য করতেন। বস্তুতপক্ষে দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের কাজ ছিল একটি যৌথ প্রয়াস; তার ফলেই উইলিয়ম কেরীর জীবদ্দশাতেই চল্লিশটি বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। আর সংস্কৃত ভাষার এবং বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের সাহায্য ছাড়া এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত হত না। সেই কারণেই উইলিয়ম কেরী সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত অনুবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই সংস্কৃত অনুবাদের জন্য শংসাপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন—"We first select two respecting the Sungskrit version as that version has perhaps been the most frequently consulted, ...the parent language of the Indian philological family."[৩৩]

শ্রীরামপুর মিশনের সংস্কৃত ও দেশীয়ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ও প্রকাশনাকে বহুসমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটিও পরবর্তীকালে অনুবাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অনুবাদ প্রসঙ্গে কেরীকে যে সব সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার প্রথম ও প্রধান অভিযোগ ছিল অনুবাদের কাজে পণ্ডিতদের সাহায্য গ্রহণ ব্যাপারে। সমালোচকরা মনে করতেন যেহেতু দেশীয় পণ্ডিত ও মৌলভিদের খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস ও ভক্তি নেই সুতরাং খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের যথার্থ অর্থ গ্রহণে তাঁরা অপারগ, সেই কারণেই অনুবাদের কাজেও তাঁরা অযোগ্য। সমালোচকরা আরও প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ধর্মপুস্তকগুলি দুর্বোধ্য তাদের অর্থগ্রহণ সহজসাধ্য নয়।[৩৪]

এই শেষোক্ত সমালোচনাটি অবশ্য কতকাংশে সত্য। প্রথম প্রকাশকালে বাইবেলের বাংলা অনুবাদের ভাষা দুর্বোধ্যই ছিল, পরবর্তী কালেও ভাষার বিশেষ উন্নতি হয়নি। বাইবেলের বাংলা অনুবাদকে কেন্দ্র করে 'ফেরেঙ্গীবাংলা' নামে একটি ঈষৎ শ্লেষাত্মক শব্দ সেকালে প্রচলিত ছিল। উইলিয়ম কেরী অবশ্য এইসব সমালোচনার যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন।[৩৫]

পরবর্তীকালে অবশ্য শ্রীরামপুর মিশনের বাইবেল অনুবাদপ্রচেষ্টাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল—"The translations though imperfect are splendid monument to the zeal, the pretty munificence and preserving industry of the missionaries especially of the erudite and indefatigable W. Carey."[৩৬]

কিন্তু বিপুল অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে সংস্কৃত ভাষায় বাইবেল অনুবাদের আরও উদ্দেশ্য ছিল; কেবলমাত্র দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের সহায়তাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না।

ভারতীয় হিন্দুরা মনে করতেন সংস্কৃত দেবভাষা। হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সবই ছিল সংস্কৃতে লেখা। সুতরাং বাইবেল সংস্কৃতে অনূদিত হলে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থগুলির সমকক্ষ মর্যাদা লাভ করবে, মিশনারিরা এইরকম চিন্তা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থগুলি প্রথমে পালিভাষায় লিখিত হলেও, পরবর্তীকালে সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল অনেক বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশপ হাউস থেকে 'খ্রীষ্টোপনিষৎ' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির লেখক ছিলেন তারাচরণ তর্কদর্শনতীর্থ। এমন কি 'আল্লোপনিষৎ' নামে গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্পর্কেও কিংবদন্তি আছে। সুতরাং বাইবেলকে ভারতবাসীর কাছে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের সমান মর্যাদাসম্পন্ন করাই ছিল বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

তাছাড়া উইলিয়ম কেরীর সমসাময়িককালে ভারতীয় জ্ঞানীগুণীরা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। আরবি, ফারসি ছাড়া অন্য কোন বিদেশীভাষা হয় তাঁরা জানতেন না অথবা সামান্য জানতেন। কেরীর সংস্কৃতশিক্ষার অন্যতম গুরু, সংস্কৃত রচনায় উৎসাহদাতা ও সাহায্যকারী এবং কেরীর সংস্কৃত রচনার সংশোধনকার্যে প্রধান সহায়ক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। দেশীয় অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাদেশিকভাষায় শাস্ত্রালোচনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের রুচিকর ছিল না। বাংলাভাষায় শাস্ত্রালোচনা বিশেষত উপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ ও বাংলাভাষায় বেদান্তের আলোচনাই রামমোহনের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিরোধের প্রধান কারণ ছিল।

তাছাড়া কেরী প্রভৃতি যাজকরা ভেবেছিলেন ভারতীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের মনে বাইবেল তথা যিশুর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যদি একবার সঠিক ধারণার উন্মেষ করা যায় তবে

তাঁরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবেন, সাধারণ মানুষ বিদেশী পাদরিদের চেয়ে দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের উপদেশ অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর নবদ্বীপের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা যেতে পারে। কলকাতায় পদার্পণের পর নির্দ্দিষ্ট কোন জীবিকার অভাবে কেরী যখন স্থান থেকে স্থানান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তিনি নবদ্বীপে বসবাসের বিষয় চিন্তা করেছিলেন—"There in the capital of last Hindoo kings, beside the leafy tols or colleges ......which rivals Benaras, Poona and Canjeeveram in sanctity, where Chaitanya the vaishnava reformer was born".[৩৭] এই নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর ও ডাঃ টমাসের বিচার বিতর্ক হয়। এই সম্বন্ধে কেরী তাঁর জার্নালে লিখেছেন—"Several of the most learned Pundits and Brahmanas wished us settle there, and as that is the great place for Eastern learning, we seemed inclined, especially as it is the bulwork of heathenism, which if once carried, all the rest of the country must be laid open to us".[৩৮] কিন্তু শেষপর্যন্ত কেরী জীবিকার স্বার্থে উত্তরবঙ্গে গমন করেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রসম্পর্কীয় বিচারবিতর্ক অসমাপ্তই থেকে যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে পদার্পণ করেই তিনি ভেবেছিলেন উচ্চকোটির শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা খ্রিস্টের মাহাত্ম্য স্বীকার করলেই ভারতীয় জনসাধারণ খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

কেরী তাঁর অনুবাদের ভাষাকে যথাসম্ভব আক্ষরিক করার চেষ্টা করেছিলেন, ফলে অনুবাদ মূলের অনুগত হলেও ভাষার কাঠিন্য ও আড়ষ্টতা দেখা দেয়। হয়তো সেই কারণেই কেরীর অনুবাদগুলি ততটা জনপ্রিয় হয়নি। এইরকম অবস্থায় নূতনতর অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাইবেল ট্র্যানস্লেসন সোসাইটি সমগ্র ধর্মপুস্তকের সংস্কৃত অনুবাদের জন্য পাঁচশত পাউণ্ড অনুমোদন করেন। ১৮৪৩ সন থেকে পরপর কয়েক বৎসর বাইবেলের বিভিন্ন 'পুস্তক' অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। মোট চারখণ্ডে সমগ্র ধর্মপুস্তকের সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৯] উইলিয়ম কেরীর প্রাক্তন সহকারী উইলিয়ম ইয়েটস্ এই অনুবাদ সুসম্পন্ন করার কাজে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।[৪০]

উইলিয়ম কেরী ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের যে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেন তা আজও অব্যাহত গতিতে প্রবহমান।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। Mukhopadhyay Indira , William Carey's Contributions for The Promotion of Sanskritic Studies. Published in—Carey's Obligation and India's Renaissance, Serampore. 1993.

১ক। গ্রন্থটির লেখক Fr. Manoel-da-Assumpcam, গ্রন্থটি পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরথেকে ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি রোমান অক্ষরে বাংলাভাষায় গুরুশিষ্যের কথোপকথনের আকারে লেখা। গ্রন্থটিতে খ্রিস্টধর্মের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে। পুস্তকটির একদিকের পৃষ্ঠায় বাংলা অপর দিকের পৃষ্ঠায় পোর্তুগীজ ভাষার অনুবাদ। লেখক মনোএল রোমানক্যাথলিক অগস্থানীয় শাখার যাজক ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের নাগোরি গ্রামের গির্জার মঠাধ্যক্ষ। সুতরাং বইটিতে ঢাকার লৌকিক উপভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। মনোএল-দ্য-আপসুমাসাঁও এর অপর গ্রন্থ Vocabulario em Idioma Bangalla e Portuguez Vividido em Duas Parts." গ্রন্থটি বাংলা পোর্তুগীজ এবং পোর্তুগীজ বাংলা শব্দকোষ এবং পোর্তুগীজ ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণ।

২। ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থটির লেখক দোম আন্তনিও। কথিত আছে ইনি ভূষণার রাজকুমার। কিংবদন্তি অনুসারে তিনি মগেদের দ্বারা অপহৃত হন। ফাদার রোজারিও নামে একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক তাঁকে উদ্ধার করেন ও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয় দোম আন্তনিও। আন্তনিও খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর গ্রন্থটি কথোপকথনের আকারে রচিত। যাজক মনোএল তাঁর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপিটিও মুদ্রণের জন্য নিয়ে যান। তবে গ্রন্থটি লিসবনে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। সুরেন্দ্রনাথ সেন গ্রন্থটি পোর্তুগালের এভোরা নগরে আবিস্কার করেন এবং বেশকিছু অংশ নকল করে আনেন। তিনিই গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। গ্রন্থটি সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শোনা যায় পাণ্ডুলিপিটি লিসবনের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

৩। Smith George, প্রাগুক্ত, p. 60.

৪। Chattopadhyay, SunilKumar, Memories of Serampore Translation, Dharma Dipika, Vol. I, No. 1, June 1997. p. 1.

৫। মৎ লিখিত "বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৯২তম বর্ষ।। ১ম-২য় সংখ্যা, ১৩৯২, পৃ-৪১-৫৩।

৬। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'শ্রী খ্রিস্টসঙ্গীতা'। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা বিশপ কলেজ প্রেস থেকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৭। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, p. 61.

৮। The Bible of Everyland, (Publisher) Samuel Bagster and sons. London, 1860, p. 89.

৯। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, p. 61.

১০। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীযুক্ত ফুলারের কাছে লেখা উইলিয়ম কেরীর চিঠি।

১১। কীটদষ্ট, পাঠের অযোগ্য।

১২। ধৰ্ম্মপুস্তক, মঙ্গল সমাচার মাতিউ রচিত, তৃতীয় পৰ্ব্ব, শ্রীরামপুর। ১৮০৩, পৃ-২১৩।

১৩। প্রাগুক্ত, যোহনের পুস্তক।

১৪। ধর্ম্মপুস্তক, যিহোশুআ পুস্তক, প্রথম পর্ব্ব, শ্রীরামপুর, ১৮৩২।

১৫। ধর্ম্মপুস্তক, শামুএল বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক, শ্রীরামপুর, ১৮৩২, পৃ-৩০৮।

১৬। তদেব, আয়োবের বিবরণ পুস্তক, পৃ-১

১৭। তদেব, দায়ুদের গীতসংহিতা, পৃ-৩১

১৮। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই বাইবেলের বাংলা অনুবাদের ভাষায় অন্বয়ের আড়ষ্টতার উল্লেখ করেছেন। মূলের আক্ষরিক অনুবাদ ও ইংরেজি ধরণের বাক্যগঠনের ফলেই ভাষা এই কিম্ভূত আকার গ্রহণ করেছে বলে অনেকে মনে করেন।

১৮ক। শ্রীরামপুর প্রকাশিত সংস্কৃত বাইবেলের প্রায় সর্বত্র 'ম্' অনুস্বরে পরিণত হয়েছে; এমনকি শেষ মকারটিও অনেক সময় অনুস্বরে (ং) পরিণত হয়েছে। আমরা সংস্কৃত অনুবাদ থেকে যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছি সেই সব অনুচ্ছেদেও এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যাবে।

১৯। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত নিউটেস্টামেন্ট ও ওল্ডটেস্টামেন্টের প্রথম অনুবাদ ছাড়াও পরবর্তী অনুবাদ এবং মিশন প্রেস প্রকাশিত অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তকে এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে অনুস্বরের (ং) যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় অনুস্বরকে তাঁরা যেন 'ম্' কারের প্রতিরূপ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। বাইবেল ট্র্যানস্লেসন সোসাইটি প্রকাশিত অনুবাদে এই ত্রুটী অনেকাংশে সংশোধিত হয়েছিল।

২০। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে লিখিত কেরীর দিনপঞ্জী।

২১। বিষয়টি তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

২২। Hooper, J.S, The Bible Translation in India Pakistan and Ceylon, London. p.331; সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

২৩। A Brief view of Baptist Missions and Translation Memoir, Serampore, 8th Memoir, Dec 31. 1822, p. 9.

২৪। ডাঃ টমাস তাঁর মুন্সি রামরামবসুর সাহায্যে ম্যাথু, মার্ক প্রভৃতি সন্তের 'মঙ্গলসমাচার' বাংলায় অনুবাদ করেন। বস্তুত উইলিয়ম কেরীর আগমনের আগেই টমাস এককভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং বাইবেলের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেন।

২৫। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, pp. 64-65.

২৬। Translation Memoir : 1st Memoir, p.1.

২৭। তদেব, 10th Memoir. p. 5.

২৮। College for the Instruction of Asiatic Christian etc. প্রাগুক্ত, p. 3.

২৯। তদেব, p. 5.

২৯ক। Translation Memoir: 5th Memoir. Appendix.

৩০। "........যাকে বলা যেতে পারে অনুবাদের গৃহীত আক্ষরিক পদ্ধতি। ...... মূল রচনার প্রতিটি শব্দের সদৃশ শব্দে রূপান্তরই এর প্রধান লক্ষণ। এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করলে কোন অনুবাদই কখনো যথাযোগ্য হয়ে উঠে না"। শক্তিব্রত ঘোষ, উইলিয়ম কেরী ঃ সাহিত্য সাধনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, পৃ-১০৬।

৩১। Translation Memoir, 7th Memoir, p. 26.

৩২। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায, প্রাগুক্ত, p. 65.

৩২ক। "......and on the otherhand amazingly small sum for which labours of the learned can be obtained in India", The College for Instruction etc.: প্রাগুক্ত, p. 4.

৩৩। Translation Memoir : 8th Memoir, p. 8

৩৪। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায, প্রাগুক্ত, p. 65.

৩৫। Translation Memoir : 8th Memoir, pp. 4-6.

৩৬। Potts, E.D, British Baptist Missionaries, Cambridge. 1967. p. 86; সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

৩৭। Smith George, প্রাগুক্ত, pp. 59-60.

৩৮। তদেব, pp. 59-60.

৩৯। The Bible of Everyland, প্রাগুক্ত p. 89.

৪০। তদেব, p. 89.

(খ) সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ "রামায়ণ"

উইলিয়ম কেরী যেমন গ্রিক ও হিব্রু বাইবেল সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তেমনি সংস্কৃত থেকে ইংরেজি ভাষায় রামায়ণও অনুবাদ করেছিলেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে সাটক্লিফকে লেখা এক চিঠিতে কেরী হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ অনুবাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন—"I have long wished to obtain a copy of the Vedas; [Foot Note : The most sacred writings of The Hindoos] and am now in hopes I shall be able to procure all that are extant......If I succeed, I shall be strongly tempted to publish them with a translation, pro bono publico"[১]

অবশ্য ঐ একই পত্রে তিনি সংস্কৃতকাব্য সম্বন্ধে নিন্দাসূচক উক্তিও করেছেন এবং জানিয়েছেন এসব কাব্যের অনুবাদের কাজে তিনি সময়ের অপব্যয় করতে চান না।[২]

যাইহোক রেভারেণ্ড ওয়ার্ডের জার্নাল[৩] থেকে আমরা জানতে পারি যে অধ্যাপক কোলব্রুক তাঁর সংগৃহীত বেদগ্রন্থগুলি কিছুদিনের জন্য কেরীকে ব্যবহার করতে দিতে চেয়েছিলেন। অধ্যাপক কোলব্রুকের ইচ্ছা ছিল বেদগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হোক।

১৮০৩ সনের ২রা জুন কেরী ফুলারের কাছে এক চিঠিতে জানান যে বেদের একটি নূতন সংস্করণ মুদ্রণে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন। কেরী ঐ চিঠিতে আশা প্রকাশ করেন যে ভারতসরকার ঐ গ্রন্থের একশটি কপি কিনবেন। চিঠি থেকে আরও জানা যায় যে গ্রন্থটি কুড়ি খণ্ডে প্রকাশিত হবে এবং প্রতি খণ্ডে পাঁচশ পৃষ্ঠা থাকবে।[৫] কিন্তু ঐ চিঠিতে বেদের অনুবাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

শ্রীরামপুর কলেজ কমিটির ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদনে বেদের মুদ্রণের উল্লেখ করা হয়েছে। বেদের পুঁথি ক্রমশই দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, ঐ প্রতিবেদনে কলেজ কমিটি উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন এবং হিন্দুদের এই সুবিশাল পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে সম্পূর্ণলোপের থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা ঋক্ প্রভৃতি চারিটি বেদেরই মুদ্রণে উদ্যোগী হন।[৬] কিন্তু এখানেও বেদের ইংরেজি অনুবাদের কোন পরিকল্পনা নেই। অবশ্য সাটক্লিফকে লেখা চিঠিতে সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থাদি সম্পর্কে যে বিদ্বিষ্ট মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে এখানে তার নামমাত্র নেই, বরং বেদ সম্পর্কে শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু বেদের মুদ্রণের অনেক আগেই রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ হয় এবং ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম খণ্ডটি

প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দেই কেরী বিশিষ্ট সংস্কৃতগ্রন্থগুলি একাদিক্রমে প্রকাশের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে একটি প্রস্তাব দেন। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবস্থা তখন এক অনিশ্চয়তার আবর্তে ঘোরতর সংকটের সম্মুখীন।[৭] এই অবস্থায় কেরীর প্রস্তাবটি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া তো দূরের কথা, আলোচনারও সুযোগ ছিল না এবং কেরীর প্রস্তাবটি চাপা পড়ে যায়। পরে কলেজের অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হলে কেরী এই ব্যাপারে ডঃ ফ্রান্সিস বুকাননের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডঃ বুকানন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি স্যার জন আনস্ট্রুথারের কাছে কেরীর প্রস্তাবটি পেশ করেন।[৮] স্থির হয় যে, কোন সংস্কৃত ক্ল্যাসিক, ইংরেজি অনুবাদসহ প্রকাশিত হবে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি যৌথভাবে প্রকাশনার আর্থিক দায়িত্ব বহন করবে, উভয় সংস্থাই মাসিক দেড়শত টাকা সাহায্য দেবে। স্থির হয় এই উপলক্ষে একটি কমিটি গঠিত হবে এবং সেই কমিটি প্রকাশনার উপযুক্ত গ্রন্থ নির্বাচন করবে। উইলিয়ম কেরীর সুপারিশ ক্রমে[৯] কমিটি প্রথমে মূল, গদ্য অনুবাদ ও কিছু টীকাসহ রামায়ণ মহাকাব্য প্রকাশে উদ্যোগী হন। য়ুরোপের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের কাছে হিন্দুধর্ম, ভারতীয় সাহিত্য, ভারতীয় আচার ব্যবহার অর্থাৎ সর্বাঙ্গীনভাবে ভারতীয় চরিত্রের পরিচিতি প্রদান করাই ছিল কমিটির উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে রামায়ণকেই তাঁরা ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করেন এবং প্রথমেই রামায়ণ মহাকাব্য প্রকাশিত হয়, অনুবাদক ছিলেন উইলিয়ম কেরী এবং জোশুয়া মার্শম্যান। গ্রন্থটি ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। রামায়ণের মাত্র প্রথম দুটি কাণ্ড তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। রামায়ণের প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রটি নিচে উদ্ধৃত হল—THE/RAMAYANA/IN THE ORIGINAL SUNGSKRIT/ WITH A PROSE TRANSLATION/AND EXPLANATORY NOTES/ BY W. CAREY AND JOSHUA MARSHMAN/VOL I/ CONTAINING THE FIRST BOOK/ SERAMPORE/1806.

রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের দ্বিতীয়খণ্ড ১৮০৮ সালে এবং তৃতীয়খণ্ড ১৮১০ সালে শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[১০]

প্রথমখণ্ডের মুখবন্ধে একটি বিজ্ঞাপন (Advertisement) আছে। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি স্যার জন আনস্ট্রুথার দেশবিদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে এই গ্রন্থটি সম্পর্কে আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদনের কিছু অংশ এখানে উৎকলিত হল—"The Asiatic Society and the College of the Fort William being desirous of promoting the knowledge of the Literature in India, and at the same time disclosing to the learned Europe the stores

which lie hid in The Ancient language of India, have accepted a proposal, which has been made to them by the Brethren of the Mission of Serampore, of translating successively the principal works to be found in the Sungskrit language, particularly those held sacred by the Hindoos, or those which may be illustrative of their mannares, their history or their religion including also the principal works of science.

It is proposed to print the first works in the original Sungskrit accompanied by a translation as nearly literal as the genius of the two languages will admit. The advantage of such a plan, both as it tends to preserve the works of the learned of ancient India from perishing and as it tends to open Indian Science, Antiquity and Religion to the learned in Europe in the mode of best calculated to enable them to appreciate their values, are sufficiently obvious. ......The College of Fort William and the Asiatic Society, have been fortunate in finding a body of men not only willing to undertake but to perform the work with a degree of vigour and permanancy not to be hoped for from individual exertion. ......I am desired by Asiatic Society of which I have the honour to be president, and by the College of Fort William, to request your patronage to the undertaking.......and the subscription is only expected to continue till the publication of one work, to be renewed or not at the option of subscriber. I have the honour to enclose a copy of the proposals, and request you to lay them before the Learned Body over which you preside, with the hope that it will be honoured with their patronage and subscription." স্যার আনস্ট্রুথারের এই আবেদনে বেশ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল মনে হয়।

এখানে রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের প্রথমখণ্ড থেকে কয়েকটি শ্লোক অনুবাদ ও টীকাসহ উৎকলিত হচ্ছে—

"তপঃ স্বাধ্যায়নিরতস্তপস্বী বাগ্বিদাম্বরঃ।
নারদং পরিপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিসত্তমঃ।। 1
কোন্বস্মিন্ প্রথিতো লোকে সজ্জনৈর্গুণবত্তরঃ।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ।। 2

উদারাচারসম্পন্নঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
বীর্য্যবাংশ্চ বদান্যশ্চ কশ্চাপি প্রিয়দর্শনঃ।। 3
জিতক্রোধো মহান্ কশ্চ ধৃতিমান্ কোহনসূয়কঃ।
সংজাতরোষাৎ কস্মাচচ দেবতা অপি বিভ্যতি।। 4
ক উদারঃ সমর্থশ্চ ত্রৈলোকস্যাপি রক্ষণে।
কঃ প্রজানুগ্রহরতঃ কো নিধিঃ গুণসম্পদাং।। 5
সমগ্রা......লক্ষ্মীঃ কামেকং সংশ্রিতা নরং।
অনিলানলসূর্য্যেন্দু শক্রোপেন্দ্রসমশ্চ কঃ।। 6
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বো নারদঃ তত্ত্বতঃ।
দেবর্ষে ত্বং সমর্থোহসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরং।। 7

(রামায়ণ Book I Sect I, p.3)

কেরী ও মার্শম্যান উল্লিখিত অংশের অনুবাদ করেছেন এইভাবে—"Valmeeki, the Chief of Moonis, devoted to sacred austerities and the persual of the Veda, the incessant Tupushee, pre-eminent among the learned, earnestly enquired of Narada, who in the Universe is to transcendent in excellences, versed in all the duties of life, grateful, attached to truth, steady in his course, exuberant in virtues, delighting in the good of all beings? Who is heroic, eloquent, lovely, of subdued anger, truly great? Who is patient, free from malice, at whose excited wrath the gods tremble ? Who is great mighty in preserving the three worlds?[1] Who devoted to the welfare of men? The ocean of virtue and wealth? In whom has Lukshmee, the complete, the beautiful chosen her abode? Who is equal of Unila[2], Unula[3], Soorya[4], Indoo[5] Shukra[6] and Oopendra[7]? From you O Narada, I would hear this. You are able, O devine sage to describe the man". অনুবাদের সঙ্গে অনুবাদকরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু টীকা যোগ করেছেন, যেমন—

"Note :

1. The Three Worlds : Swarga, heaven, Murtya, the earth and Patala, the world of Serpents or hydras. These three terms include the Universe according to the Hindoos.
2. Puvana, the god of winds.

3. Ugni, the god of fire.
4. The sun, or rather the deva who presides over it.
5. Chundra, the moon.
6. Indra, the god who presides over the heavens and seasons.
7. Vishnoo."

গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫৬। সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।[১১]

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডেও একটি নিবেদন বা Advertisement আছে, সেখানে অনূদিত গ্রন্থের আকার ও আয়তন সম্বন্ধে অনুবাদকরা কিছু নিবেদন করেছেন—অনুবাদটি প্রথমে নয় খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু আয়তন বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সবকটি খণ্ডের আকারের সমতা রক্ষার জন্য দশ খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, ফলে মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে।[১২]

দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২২। অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথমাংশের অনুবাদেই দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি। দ্বিতীয় খণ্ডের একটি শ্লোক অনুবাদসহ উৎকলিত হল—

"সুরম্যাসাদ্য তু চিত্রকূটং নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং।
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।।"

"Having thus arrived at the pleasant mountain Chitrakoota, and at the river Malyavutee, the excellent and sacred place frequented by deer and birds Rama was filled with joy, and relinquished all grief on account of his exile."

অনুবাদকদ্বয় পৃথক পৃথক শ্লোকের অনুবাদ না করে অনেকসময় দুটি তিনটি শ্লোক একসঙ্গে অনুবাদ করেছেন, যেমন—

"কথয়িত্বা তু দুঃখার্ত্তঃ সুমন্ত্রেণ চিরং সহ।
রামে দক্ষিণকূলস্থে জগাম স্বগৃহং গুহঃ।। 1
ভরদ্বাজভিগমনং প্রয়াগে চ সভাজনং।
অগিরের্গমনন্তেষাং তত্রস্থৈরাভিলষিতং।। 2
অনুজ্ঞাতঃ সুমন্ত্রোঽথ যোজয়িত্বা হয়োত্তমান্।
অযোধ্যানেব নগরীং প্রযযৌ গাঢ়দুর্ম্মনাঃ।। 3"

"When Rama arrived on the southern shore, Gooha having talked a longtime with Soomontra, returned home. By then standing at Gooha's house, the arrival of the heroes at Prayaga, their approach to Bhuradwaja and their lodging with him, advised by Gooha, yoked

the horses and returned with a heavy heart to the city of Uyodhyay." এখানে তিনটি শ্লোককে একই সঙ্গে অনুবাদ করা হয়ছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে এই ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা অপ্রত্যাশিত নয়। বিশেষত সংস্কৃত ভাষায় ভাব সবসময়ে একটিমাত্র পদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, পরের শ্লোকেও সঞ্চারিত হয়। কিন্তু অনুবাদের ভাষায় মূলের সৌন্দর্য ও সরলতা সঞ্চার করা যায়নি।

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯২। অযোধ্যাকাণ্ডের শেষাংশ এই খণ্ডে বিধৃত হয়েছে। তৃতীয়খণ্ডের অনুবাদের কিছু নমুনা মূলসহ উদ্ধৃত হল।

"যদা হি যৎকার্য্যমুপৈতি কিঞ্চিদুপায়নাঞ্চাপহৃতং মহার্হং।
স পাদুক্যাভ্যাং প্রথমং নিবেদ্য চকার পশ্চাদ্ভরতো যথাবৎ।।"

"The fortunate Bhuruta installed with the shoes of that excellent one, paying homage to them, thus governed the Kingdom. All presents brought, and all the business of state which occured, he first laid before the shoes and afterwards did as occasion required." তৃতীয়খণ্ডের সমাপ্তিসূচক "ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে অযোধ্যাকাণ্ডে পাদুকাভিষেকে নামাশীতিতমসর্গঃ সমাপ্তশ্চায়মযোধ্যাকাণ্ডঃ।" ইত্যাদি অংশটি অনুবাদকদ্বয় ইংরেজিতে অনুবাদ করেননি।

কিন্তু রামায়ণের এই গদ্য অনুবাদ জনপ্রিয় হয়নি। মূলের আক্ষরিক অনুবাদ করার চেষ্টায় ভাষা আড়ষ্ট হয়েছে এবং মূলের কাব্যসৌন্দর্যকে যথাযথ প্রকাশ করা যায়নি। আক্ষরিক অনুবাদের প্রতি উইলিয়ম কেরীর যে বিশেষ ঝোঁক ছিল তা আমরা জানি। বাইবেলের বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদে এই আক্ষরিক অনুবাদের প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে এবং বাইবেলের বাংলা অনুবাদের অষ্টম সংস্করণেও (১৮৩২) ভাষার এই আড়ষ্টতা কেরী কাটিয়ে উঠতে পারেননি।[১৩]

জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর গ্রন্থে রামায়ণের অনুবাদ সম্পর্কে লিখেছেন—"It was a faithful version of the most renowned Epic of India but it was destitute of the poetic glow of the original. A prose translation of any great poem must necessarily be tame, but in case of the Ramayana, the translators were fettered by the juxtaposition of the text printed in the same page and they were obliged to give an exact and literal rendering of the expressions of the original in which little of its spirit could be retained. For the time it was useful undertaking, it was the first publication from which the English public was

enabled to form any idea of the general character of Sanskrit Poetry."[১৪]

ভূমিকায় অনুবাদকরা দাবী করেছেন যে তাঁরা আন্তরিক ভাবে মূলানুগ অনুবাদের চেষ্টা করেছেন, ফলে মূলের সৌষ্টব ও প্রাঞ্জলতা অনেক সময়েই রক্ষা করা যায়নি। কিন্তু অধ্যাপক হোরেস হেমান উইলসন অনুবাদকদের এই বক্তব্যকে যথার্থ মনে করেননি। তাঁর মতে অনুবাদের ভাষা সরল ও সহজবোধ্য হলেও অনুবাদ অনেক সময়েই মূলানুগ হয়নি।[১৫] তাঁর মতে অনুবাদের এই কাজটি আসলে অনুবাদকের প্রতিভার উপযোগীই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কোন পৌরাণিক কাব্য সম্পর্কে কেরী বা মার্শম্যানের মতো মিশনারির আগ্রহ বা অনুসন্ধিৎসা সেই পরিমাণে থাকতে পারে না। তাঁদের মতো ব্যক্তি কাব্যের ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারেন অথবা কাব্যে প্রতিফলিত হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহারের প্রতি উৎসুক হতে পারেন, কিন্তু একটি পৌরাণিক মহাকাব্যের যথাযথ অনুবাদ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অপরপক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি জন আনস্ট্রুথার অনুবাদকদের যথেষ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁরা জানতেন এই বিশাল কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, তাই উপযুক্ত অনুবাদকের সন্ধান পেয়ে তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেছেন—"The Fort William College and Asiatic Society, have been fortunate in finding a body of men not only willing to undertake but qualified to perform the work, with a degree of vigour and permanency not to be hoped for from individual exertion."[১৬] কেরী ও মার্শম্যানের রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ কেবলমাত্র ইংলণ্ডের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনেই ঔৎসুক্যের সঞ্চার এবং তাঁদের গ্রন্থটি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলেনি, এমন কি Robert Southey-র[১৭] মতো কবিরাও এই অনুবাদ পাঠে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। কেরীর অন্যতম জীবনীকার জর্জ স্মিথ এই সম্পর্কে বলেছেন—"Southey eagerly turned to it for materials for his "Curse of Khema" in the notes to which he make long quotations from the excellent and learned Baptist missionaries of Serampore."[১৮]

স্মিথ আরও জানিয়েছেন যে ইংলণ্ডে প্রেরণ করার সময় রামায়ণের অনুবাদ গ্রন্থগুলির অধিকাংশই সমুদ্রপথে নষ্ট হয়ে যায়, মাত্র কয়েকটি বই যা বিভিন্ন ব্যক্তিকে পূর্বাহ্নেই উপহার দেওয়া হয়েছিল সেগুলিই রক্ষা পায়। ফলে রামায়ণের এই অনুবাদ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে।[১৯]

উইলিয়ম কেরী যেমন সংস্কৃতসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন লৌকিক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন, তেমনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদিও ইংরেজিতে অনুবাদ

করতে চেয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটিরও অভিলাষ ছিল সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করা। অনুবাদের উপযুক্ত গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য তাঁরা একটি সমিতি গঠন করেন, উইলিয়ম কেরী ঐ সমিতির সদস্য ছিলেন, এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে, বিশেষত ভারতের সাহিত্য, ধর্ম্ম, আচারব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। কেরী মনে করতেন একটি দুটি প্রবন্ধ বা কোন একটি গ্রন্থের আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুবাদের সাহায্যে এই গরুড়ের ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করা যাবে না। অনুবাদের যোগ্য গ্রন্থনির্বাচনের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি যে সমিতি গঠন করেন সেখানে রামায়ণ মহাকাব্যের নাম প্রস্তাবিত হয় এবং কেরী ও মার্শম্যান অনুবাদক মনোনীত হন। কেরী এই সুযোগ গ্রহণে ইতস্তত করেননি। বস্তুত কেরীর সুপারিশক্রমেই সর্বাগ্রে রামায়ণগ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়।[২০] কেরী মনে করতেন ভারতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয় রামায়ণ মহাকাব্যেই সর্বাধিক পরিমাণে বিধৃত, সুতরাং রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদেই তাঁদের উদ্দেশ্য সর্বাধিক সফল হবে, কারণ—"........ who from their profound insight into Indian literature, are well qualified to make the decision, have made the choice of Ramayana of Valmeeki to be the first in the series from Sangskrit, the reverence in which it is held, the extent of the country through which it is circulated, and the interesting view which exhibits the religion, the doctrines, the mythology, the current ideas and the mannars and customs of the Hindoos, combine to justify their selection."[২১] তবে এটাও ঠিক যে ভাষার আড়ষ্টতার জন্য এবং রামায়ণের কাব্য সৌন্দর্য্যকে যথাযথ প্রকাশে অসমর্থ হওয়ায় রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ জনপ্রিয় হয়নি।

গ্রন্থটি দশ খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল এবং অনুবাদকরা অনুমান করেছিলেন প্রতিখণ্ডে গড়ে ৫০০ পৃষ্ঠা থাকবে। এই বিশাল গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায় কম ছিল না। বিশেষত ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে রামায়ণের বহু পাণ্ডুলিপি ভস্মীভূত হয়।[২২] এই অবস্থায় মিশন কর্তৃপক্ষের মন ভেঙ্গে যায় এবং তাঁরা নতুন করে রামায়ণের অন্যান্য খণ্ডগুলি অনুবাদ ও সেগুলি প্রকাশের চেষ্টা করেননি। অধ্যাপক উইলসনের মতে রামায়ণের দুটি কাণ্ডের অনুবাদ তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ায় রামায়ণের অন্য কাণ্ডগুলি অনূদিত ও প্রকাশিত হয়নি।[২৩]

পরবর্তীকালে ইতালীয় ভাষায় রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক Gorresio নামে একজন ইতালীয় পণ্ডিত। গ্রন্থটি প্যারিসের সরকারী প্রেসে ছাপা হয়।

গ্রন্থটিতে নাগরী অক্ষরমালাও খুব শোভনভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। রামায়ণের এই ইতালীয় অনুবাদটি খুবই সমাদর লাভ করে। য়ুরোপীয় ভাষায় এইটিই রামায়ণের প্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ।[২৪]

অনেকে বলেন উইলিয়ম কেরী সাংখ্যদর্শনেরও ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, তবে সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।[২৫]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পক্ষ থেকে কেরী 'হিতোপদেশ' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ছয়টি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠ বিচার করে গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়। কেরীর সম্পাদিত 'হিতোপদেশ' 'Pilpay's Fables' অভিধায় অনূদিত হয়। য়ুরোপে ভারতীয় লোককথার এই সংকলনগ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

কেরী আচার্য দণ্ডীর বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ 'দশকুমারচরিতের' একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন এবং ভর্তৃহরির শতকগ্রন্থমালা[২৬] সম্পাদনা করেন।

কেরী অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ বা সম্পাদনা করেছিলেন কিনা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে সাটক্লিফকে রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের সংবাদ দিয়ে যে চিঠি তিনি লেখেন[২৭] সেই চিঠিতেই লিখেছেন "I have also begun an attempt at translating the Veds". কিন্তু আমরা আগেই জানিয়েছি বেদের এই অনুবাদের কোন হদিস আমরা পাইনি।

অধ্যাপক কোলব্রুক তাঁর সম্পাদিত কোষগ্রন্থ অমরকোষের ভূমিকায় কেরীর কাছে ঋণস্বীকার করেছেন। কোলব্রুক এই বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধানটি ব্যাখ্যাসহকারে অনুবাদ করেন। কেরী পুস্তকটির প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদির ইংরেজি অনুবাদ করার অভিলাষ কেরীর ছিল, কিন্তু তাঁর কাছে তার চেয়েও বেশি জুরুরী ছিল ভারতের বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ রচনা।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। ১৮০২ সালের ১৭ই মার্চ কলকাতা থেকে মিঃ সাটক্লিফকে লেখা চিঠি।

২। তদেব।

৩। ওয়ার্ডের জার্নাল—১লা এপ্রিল ১৮০৩, Periodical Accounts-এ উদ্ধৃত।

৪। "Mr Colebrooke has offered to lend brother Carey all the Vedas which he has been able to procure, if he will print them and this we have been promised to do."
তদেব, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে মিশন কর্তৃপক্ষ চারিটি বেদই মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন।

৫। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে ডঃ ফুলারকে লিখিত কেরীর পত্র। সজনীকান্ত দাসের গ্রন্থে উদ্ধৃত।

ঐ গ্রন্থে সজনীকান্তদাস লিখেছেন যুরোপীয় শিক্ষিত সমাজে চারিবেদ ও রামায়ণ মহাকাব্যের অসারতা প্রমাণ করার জন্য কেরী ঐ সব গ্রন্থ অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় কেরী রামায়ণ মহাকাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অন্যত্রও বেদ সম্পর্কে কেরী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

৬। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

College for the Instruction of Asiatic Christian and other youth in Eastern Literature and European Science, Serampore, 1818, p. 12.

৭। Marshman J.C, Life and times of Carey Marshman and Ward. Vol I. London, 1859, p. 220.

৮। তদেব, p. 220.

৯। তদেব, p. 220.

১০। রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র—THE/RAMAYUNA/ OF VALMEEKI/IN THE ORIGINAL SUNGSKRIT/WITH A PROSE TRANSLATION/AND EXPLANATORY NOTES/BY W. CAREY, J. MARSHMAN/VOL. II/ CONTAINING PART OF SECOND BOOK, SERAMPORE- 1808.

তৃতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রের সদৃশ, কেবল Vol. II এর স্থলে Vol. III এবং তারিখও পৃথক ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ। আর Containing part of second book এর স্থলে লেখা হয়েছে containg second part of second book.

১১। "ইতি শ্রীরামায়ণে চতুর্বিংশতিসহস্র্যাং সংহিতায়াং বাল্মীকিপ্রোক্তা......কাণ্ডে বালচরিতে শ্রীরামাভিষেকব্যবসায়ে আদিকাণ্ড সমাপ্তিঃ ত্রয়চতুঃষষ্ঠিতমসর্গঃ।" "End of the First Volume, Containing the First Book." "......" চিহ্নিত অংশ কীটদষ্ট।

১২। রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের দ্বিতীয়খণ্ডের প্রারম্ভেই নিম্নলিখিত নিবেদন বা Advertisement আছে।

"This poem consists of seven books, which it was originally proposed to confine nine volumes, but as nearly all the books except the first must then have been divided in order to make the volumes equal in size, it appears better to divide three largest books into two volumes each. Although this will increase the number of volumes to ten; it is proposed to the ten strictly with price of this volume therefore is fixed at thirty ruppes instead of forty."

১৩। "ভাষার দিক দিয়া কেরী যে শেষপর্যন্ত বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না।" সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত পৃ ৯৯।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা বাইবেলের অষ্টম সংস্করণ (১৮৩২) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—"একালের বাঙালির কানে এই উদ্ধৃতি যথেষ্ট স্বাভাবিক বলে মনে হয় না, সেকালেও কোন কোন বাঙালি এই ভাষার প্রখর সমালোচনা করেছিলেন।"

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০২।

১৪। Marshman J.C, প্রাগুক্ত, p. 221.

১৫। Wilson H.H, Remarks on the Character of Labours of Dr. Carey as an Oriental Scholar and translator.
Memoir of William Carey (Eustace Carey) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। p. 593.

১৬। Carey W. and Marshman, Ramayana, Serampore 1806, Vol. I, Preface. I.

১৭। Southey Robert— ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।
ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ প্রমুখ 'লেক পোয়েট' দের তিনি অন্যতম তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা কোলরিজের সমকক্ষ প্রতিভা তাঁর ছিল না। তিনি দূরবর্তী দেশের স্বল্পপরিচিত সভ্যতা সম্বন্ধে কাব্যরচনা করতে ভালবাসতেন। "Farfetched mythologies seemed to him picturesque subjects : what he knew about them he learned from the book in his Library." তাঁর Curse of Kehma কাব্যগ্রন্থটি ১৮১০ সালে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় অতিকথা (মিথলজি) এই কাব্যে স্থান পেয়েছে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।
Legois Emili, A Short History of English Literature. (Translated by V.F. Boyson and J. Coulson) Oxford, 1934. Reprint 1947, pp. 283-284.

১৮। Smith George, প্রাগুক্ত, p. 171.

১৯। তদেব, p. 171.

২০। Marshman J.C, প্রাগুক্ত, p. 200.

২১। অধ্যাপক উইলসন মন্তব্য করেছিলেন যে রামায়ণের অনুবাদকরূপে কেরী ও মার্শম্যানের নির্বাচন সঠিক হয়নি, কারণ তাঁদের মানসিকতা কোন মহাকাব্য অনুবাদের উপযোগী ছিল না। (এ ব্যাপারে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি)। কিন্তু রামায়ণের ভূমিকার উৎকলিত অংশটিতে অনুবাদকদ্বয়ের রামায়ণ সম্পর্কে সার্বিক শ্রদ্ধা এবং অনুবাদের প্রতি আগ্রহ অত্যন্ত স্পষ্ট।

২২। কেরীর জীবনীকাররা প্রায় সকলেই বলেছেন ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের বিধ্বংসী আগুনে বহু পাণ্ডুলিপি ভস্মীভূত হয়। শ্রীযুক্ত সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের মতে রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের ১২টি কপি এবং ঐ অনুবাদের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ছাই হয়ে যায়।
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বড়সাধ বড়সেবা, পৃ-১০৭

২৩। Wilson, H.H, প্রাগুক্ত p. 594.

২৪। Marshman J.C, প্রাগুক্ত, p. 22.

২৫। "It was understood, also, that he prepared for press some translations of treatises on the metaphysical system called Sankhya; but these were never published." Wilson H.H, প্রাগুক্ত, p. 595.

২৬। ভর্তৃহরির তিনটি শতক—শৃঙ্গার শতক, বৈরাগ্য শতক, শান্তি শতক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উইলিয়ম কেরী ও সংস্কৃতশিক্ষা

ধর্মযাজকরূপে ভারতে পদার্পণের আগে উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন জীবিকার অন্যতম ছিল শিক্ষকতা। তিনি আজন্ম শিক্ষক, আর সেই কারণেই শ্রীরামপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রচলিত ছিল। এমনকি মদনাবাটিতে তিনি যখন নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক তখন সেখানেও বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেই সময়েই তিনি এবং ডাঃ টমাস মদনাবাটিতে দুটি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। স্থির হয়েছিল এই প্রস্তাবিত কলেজে ছয়জন মুসলমান এবং ছয়জন হিন্দু মোট বারোজন ছাত্রের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব একজন পণ্ডিতের উপর ন্যস্ত হবে। সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসি ভাষা এই কলেজের পাঠ্যসূচীতে স্থান লাভ করেছিল, বাইবেল অবশ্যই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; সম্ভব হলে কিছুটা দর্শনশাস্ত্র এবং ভূবিদ্যা পড়ানোর ব্যাপারেও কেরী চিন্তা করেছিলেন।[১] এই কলেজ খুব সম্ভব বাস্তবে রূপায়িত হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষে পদার্পণের কিছুকাল পরেই কেরী নিজে যেমন সংস্কৃত শিক্ষায় মনোযোগী হয়েছিলেন, তেমনি সংস্কৃতশিক্ষার প্রসারের জন্যও তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন, কেরীর প্রস্তাবিত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষাদানের অভিলাষ এই সাক্ষ্যই বহন করে।

শ্রীরামপুর বিদ্যালয় ঃ

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পরই মিশনের পরিচালকগণ— উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড স্থির করেন যে মিশন পরিচালনার এবং ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় আর্থিক ব্যাপারে তাঁরা যথাসম্ভব স্বনির্ভর হবেন, ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাপটিস্ট সোসাইটির উপর সর্বাঙ্গীনভাবে নির্ভরশীল হবেন না। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য জোশুয়া মার্শম্যান ও তাঁর পত্নী হানা মার্শম্যান কলকাতা ও নিকটস্থ স্থানে বসবাসকারী য়ুরোপীয় পরিবারের বালকবালিকাদের জন্য দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দুটি বিদ্যালয়ই ছিল আবাসিক এবং হানা মার্শম্যান বিদ্যালয়দুটির বিশেষত বালিকাদের আবাসিক বিদ্যালয়টি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২]

এই বিদ্যালয়ে সাধারণত য়ুরোপীয় ধাঁচে শিক্ষাদান করা হত। কিন্তু ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের গ্রিক, হিব্রু, ফারসি, সংস্কৃত ইত্যাদি যে কোন একটি ভাষায় বিশেষ জ্ঞানলাভের সুযোগ ছিল।[৩] মিশনের বিদ্যালয়ে য়ুরোপীয় ছাত্রদের জন্য এই সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থায় উইলিয়ম কেরীর কেবলমাত্র অনুমোদন ছিল তাই নয়, তিনি বিশেষ সমর্থনও করেছিলেন।

শ্রীরামপুর কলেজ ঃ

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন দেশীয় খ্রিস্টানদের শিক্ষার প্রয়োজনে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের তিন মুখ্য পরিচালক উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড বিশেষত কেরী ও মার্শম্যান কার্যক্রমাদি বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে "College for the Instruction of Asiatic Christian and other youths in Eastern Literature and European Science" নামে পুস্তিকাটি রচিত হয়। পুস্তিকাটি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

এই নির্দেশিকায় স্থির হয়েছিল শ্রীরামপুর কলেজ য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হবে। সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, যোগাযোগ সচিব এবং কার্যকরী-সচিব য়ুরোপীয় হবেন। আর এই সমিতির দেশীয় বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত হবেন সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ও দ্বিতীয় পণ্ডিত, আরবিভাষার ও ফারসিভাষার মৌলবি এবং চিনাভাষার শিক্ষক। প্রয়োজন সাপেক্ষে অন্যান্য পণ্ডিত ও শিক্ষককে পরিচালন সমিতিতে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এই কলেজের পাঠ্য সূচীতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়। সংস্কৃত কেন খ্রিস্টান যুবকদের অবশ্য পাঠ্য হবে, বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী খ্রিস্টান ভদ্রলোকদের মনে এই প্রশ্ন জাগা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাই নির্দেশিকা পুস্তিকাটিতে সংস্কৃত-পঠন-পাঠন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

মূলত খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই কলেজ স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের বিখ্যাত ত্রয়ী মনে করতেন একমাত্র বাইবেলের বাণী প্রচারই স্থানীয় জনসাধারণের মনে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আগ্রহ জাগাতে পারে। আর সেই কারণেই তাঁরা এই দেশের নানা আঞ্চলিক ভাষায় বাইবেল অনুবাদে রত হন, কারণ মাতৃভাষার সাহায্যেই কোন বিদেশীতত্ত্বকে অন্তরে প্রবেশ করানো সহজসাধ্য। কিন্তু এদেশের মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ দূরে থাক 'গসপেলে'র বাণী শুনতেও ভয় পায়। সুতরাং এদেশীয় জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য 'সদ্ধর্ম' প্রচারের তথা বাইবেল অনুবাদ ও প্রকাশের দায়িত্ব যাঁরা

নেবেন তাঁদের এদেশে প্রচলিত ধর্ম বিশেষত হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধেবিশেষজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, কারণ হিন্দুরাই ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৪] কিন্তু হিন্দুধর্ম ও দর্শনে জ্ঞান থাকার জন্য সংস্কৃত ভাষা জানা একান্ত প্রয়োজন, যেহেতু ঐ গ্রন্থ সমূহ সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত। সুতরাং দেশীয় খ্রিস্টান যুবকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষাও ছিল প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মালে দেশীয় খ্রিস্টান যুবকরা হিন্দু ষড়্দর্শনের বিভিন্ন শাখায়, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে এবং পৌরাণিক উপাসনা, আচার-আচরণাদি সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। একমাত্র ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে গভীরজ্ঞানের সাহায্যেই এই সব যুবকরা শিক্ষিত হিন্দুদের বিতর্কে পরাস্ত করে খ্রিস্টধর্মের মহিমা প্রচার করতে পারবে। সাধারণত দেখা যায় দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে ধর্মালোচনার সময় অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দুশাস্ত্রের তুলনায় বাইবেলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন। কেরী মনে করতেন এইসব ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা যে নিজেদের শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ, অথবা য়ুরোপীয় যাজকগণ নিজধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে অধিকতর পারদর্শী, তা নয়। বস্তুত কেবলমাত্র জাতিগতভাবে য়ুরোপীয় হওয়ার জন্যই দেশীয় পণ্ডিতরা তাঁদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতেন। দেশীয় খ্রিস্টানদের এই সুযোগ পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সংস্কৃত ভাষা দেশীয় খ্রিস্টানদের অবশ্য শিক্ষনীয় ছিল, কারণ কেবলমাত্র এই ভাষার সাহায্যেই তাঁরা হিন্দুধর্মশাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সমকক্ষ হতে পারতেন।[৫]

কলেজের উদ্দেশ্য নির্ণেয়ক এই পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, যে সমস্ত দেশীয় খ্রিস্টান যুবক এই কলেজে পাঠ গ্রহণ করবেন সংস্কৃত ভাষা হবে তাঁদের অন্যতম আবশ্যিক বিষয়। অবশ্য সেই সঙ্গে কিছুটা আরবি ও ফারসি ভাষাও তাঁদের শিখতে হবে। সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শেখানোর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করবেন—"This college shall secure the instruction in the Sungskrita language of all the Native Christian youth admitted, and of a certain number of Arabic and Persian for which purpose, the ablest native teachers shall be retained in these languages at adequate salaries". এখানে তিনটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমত প্রতিটি দেশীয় ছাত্রকে অবশ্যই সংস্কৃত শিখতে হবে। প্রতিটি ছাত্রকে কি উদ্দেশ্যে সংস্কৃত শিখতে হবে সে ব্যাপারটি কেরী পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া কেরীর মনোগত অভিলাষ ছিল বাইবেলের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার অনুবাদকে সংস্কৃত অনুবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করা।[৬]

দ্বিতীয়ত সংস্কৃত ও আরবি-ফারসিভাষা শেখানোর জন্য দেশীয় শিক্ষক নিয়োগ। কেরী উপলব্ধি করেছিলেন কোন বিদেশী য়ুরোপীয় শিক্ষকের চেয়ে স্থানীয় শিক্ষকনিয়োগ অপেক্ষাকৃত উপযোগী, কারণ বিদেশী শিক্ষককে প্রথমে ঐ ভাষাগুলি আয়ত্ত করতে

হবে, পরে তিনি পাঠদান করবেন। তাছাড়া ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ভাষার ব্যবধানও পাঠদানের পক্ষে অন্তরায় হতে পারে। কেরী নিজে যদিও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পাঠদান করতেন, কিন্তু তিনি পাঠদান করতেন স্বজাতীয় ইংরেজি ভাষাভাষী ছাত্রদের। আর সেখানে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো বিখ্যাত পণ্ডিতরাও অধ্যাপনা করতেন। শ্রীরামপুর মিশনেও বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজে বহুপণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের আগে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা বৈষয়িক কারণে প্রায় সকলেই ফারসি ভাষা ভালভাবে শিখতেন। মুসলমান আমলের পর ইংরেজ শাসনেরও প্রথমদিকে বেশ কিছুকাল ফারসি সরকারি ভাষা থাকায় ফারসিভাষা শিক্ষাদানের উপযুক্ত মৌলবির কোন অভাব দেশে ছিল না। অপরপক্ষে য়ুরোপীয় রাজপুরুষ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ যাঁদের ভাষাশিক্ষার প্রতি প্রবণতা ছিল না, তাঁরা হিন্দুস্থানী নামে এক মিশ্রভাষায় কাজকর্ম চালাতেন। সুতরাং সংস্কৃত ও আরবি এবং ফারসি ভাষা পড়ানোর জন্য দেশীয় পণ্ডিত ও মৌলবি নিয়োগই ছিল সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।

তৃতীয়ত এই সব অধ্যাপকদের বেতনের ব্যাপারে শ্রীরামপুর মিশন কোন কার্পণ্য করতে চাননি, তাঁরা জানতেন কেবলমাত্র মৌখিক সম্মান নয়, জ্ঞানীগুণী অধ্যাপকদের আর্থিক সম্মান প্রদানও প্রয়োজন। কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের মাসিক বেতন নিম্নলিখিতহারে নির্দ্দিষ্ট করেছিলেন, স্থির হয়েছিল অধ্যাপকরা মাসে আড়াইশত টাকা বেতন পাবেন। সংস্কৃতের প্রধান পণ্ডিতের বেতন হবে একশত টাকা। প্রয়োজনবোধে কলেজ কর্তৃপক্ষ বেতনের কাঞ্চনমূল্য আরও বাড়াতে পারবেন। অন্যান্য পণ্ডিত ও শিক্ষকের সংখ্যা ও বেতন সময়ানুযায়ী ও অবস্থানুসারে কলেজ পরিচালক সমিতি কর্তৃক নির্ণীত হবে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতের বেতন কলেজ স্থাপনের পূর্বাহ্ণেই স্থিরীকৃত হয়েছিল, কারণ শ্রীরামপুর কলেজের কর্তৃপক্ষ মনে করতেন সংস্কৃত শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন এবং তা পাঠক্রমের আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্গত হওয়া উচিত। তাই আবশ্যিক বিষয়ের শিক্ষক ও পণ্ডিত নিয়োগ এবং তাঁদের বেতন বিষয়ে সিদ্ধান্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ আনুষ্ঠনিকভাবে চালু হওয়ার আগেই নিয়েছিলেন।

কিন্তু কেবলমাত্র স্থানীয় খ্রিস্টান ছাত্ররাই মিশন কলেজে সংস্কৃতশিক্ষা লাভ করতেন না, বহিরাগত ছাত্রদেরও এই কলেজে সংস্কৃত ভাষাসাহিত্য পাঠের সুযোগ ছিল। কোন য়ুরোপীয় বা আমেরিকান অথবা ভারতের যে কোন অঞ্চলের অধিবাসী, যে কোন ব্যক্তি এই কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুদর্শন পাঠ করতে পারতেন। তাঁদের কেবলমাত্র কলেজের পরিচালন সমিতির কাছে অনুমতির জন্য আবেদন করতে হত। পাঠ গ্রহণের জন্য দক্ষিণা দেওয়ার কোন দায় তাঁদের ছিল না, তবে ক্লাসে যোগদান ছিল বাধ্যতামূলক।

পাঠাভ্যাস এবং ক্লাসের কাজও (exercise) নিয়মিত করতে হত। তাঁদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন শিক্ষাবর্ষ ছিল না; তাঁদের ইচ্ছানুসারে শিক্ষার সময়সীমা নির্ধারিত হত, অর্থাৎ নিজেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁরা যতদিন প্রয়োজন বোধ করতেন ততদিন ক্লাসে যোগ দিতেন। শিক্ষালাভের জন্য নিয়মিত দক্ষিণা দিতে না হলেও, তাঁদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার তাঁদের নিজেদেরই বহন করতে হত।[৭]

ঐ নির্দেশিকায় আরও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে এশীয় যুবকগণ, পোর্তুগীজ ও ফরাসি বংশোদ্ভূত যুবকগণও প্রয়োজনবোধে এই কলেজে সংস্কৃত, গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা শিখতে পারবেন, তা তাঁরা ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট যে সম্প্রদায়ভুক্তই হন না কেন। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ যুবকরাও ইচ্ছা করলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন, তবে তারজন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় তা তাঁদের নিজেদেরই বহন করতে হত। সংস্কৃত ও ইংরেজিভাষার শিক্ষকরাই এই পাঠদানের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন।[৮]

উল্লিখিত পুস্তিকা থেকে সংস্কৃতবিভাগের পাঠক্রমেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণের পঠনপাঠনের মধ্য দিয়েই সংস্কৃত শিক্ষার সূচনা হত। কেরীর সমসাময়িক কালে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চতুষ্পাঠীগুলিতে বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পঠনপাঠনই প্রচলিত ছিল। কেরী নিজেও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের গুণগ্রাহী ছিলেন। নিজের ইংরেজিভাষায় লেখা ব্যাকরণে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকেই অনুসরণ করেছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রস্থান সম্পর্কে কেরী অবহিত ছিলেন এবং জানতেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত ব্যাকরণের পাণিনীয় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রস্থানের পঠনপাঠন প্রচলিত আছে। এই কলেজের ছাত্ররা যাতে নিজনিজ অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাকরণের পাঠগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা এই কলেজে ছিল। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রতিটি ছাত্রকে অবশ্যই পড়তে হত। নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে—"All the youth in the college shall commence the study of Sungskrita under different pundits, after the most approved grammars in the Sungskrita language used in different provinces of India"[৯]

সংস্কৃত ব্যাকরণ কিছুটা আয়ত্ত করার পর উপসমিতির নিদের্শনুসারে পরবর্তী পাঠ্য ছিল পুরাণ। তাছাড়া হিন্দু ষড়্দর্শন এবং বৌদ্ধদর্শনও পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত ছিল।[১০]

উক্ত নির্দেশিকায় প্রস্তাব করা হয়েছিল কিছু কিছু ছাত্রকে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে অতিরিক্ত ভাষারূপে আরবি ও ফারসি ভাষাও শিখতে হবে। আর প্রস্তাব ছিল উপসমিতির নির্দেশক্রমে, কিছু বিশেষভাবে নির্বাচিত ছাত্র, যারা চিনা ভাষা শিখতে ইচ্ছুক, তারা চিনাভাষা শিখবে। অবশ্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ কিছুটা অগ্রসর হলেই,

চিনাভাষার পাঠদান শুরু হত। কর্তৃপক্ষ মনে করতেন সিংহলী, ব্রহ্মদেশীয় এবং শ্যামদেশীয় যুবকরাই চিনাভাষায় পাঠগ্রহণের বিশেষ অধিকারী। তাঁরা মনে করতেন ঐ সব ভাষার সঙ্গে চিনা ভাষার একটি অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য আছে, সুতরাং ঐসব ভাষাভাষী ছাত্রদেরই চিনাভাষা শিক্ষায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।[১১] ইচ্ছুক ছাত্ররা সংস্কৃতভাষা ছাড়াও অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে গ্রিক ও ল্যাটিনভাষা শিখতে পারতেন।

বহু সংস্কৃতগ্রন্থ নানাকারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেইসব গ্রন্থের চিনা অনুবাদ তিব্বত ও চিনদেশে রক্ষিত ছিল। কেরী মনে করতেন চিনাভাষা থেকে ঐসব সংস্কৃত গ্রন্থের পুনর্নির্মাণ সম্ভবপর। আর সেইজন্যই চিনাভাষা শিক্ষার উপর তিনি এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত পুঁথির সন্ধানে তিনি যেমন নবদ্বীপ, কাশী ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করেছেন, সেইরকম সংস্কৃত পুঁথির খোঁজে নেপালেও লোক পাঠিয়েছিলেন।

অপরপক্ষে কেরী মনে করেছিলেন য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গেও এই কলেজের ছাত্রদের পরিচয় প্রয়োজন। প্রাথমিক ইতিহাস ও ভূগোলকে অবশ্যপাঠ্য করার বিষয় কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ পরিচালকেরা চিন্তা করেছিলেন। এছাড়া সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষণশক্তি, গণিত, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, খনি সম্পর্কিত বিদ্যা, যন্ত্রসম্পর্কিত বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ও ছাত্রদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূত ছিল। মিশন কর্তৃপক্ষ মনে করতেন এইসব বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে হলেও যেন যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেরী চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক কিছু কিছু গ্রন্থ যেন সংস্কৃতে অনূদিত হয়। অন্যান্য বিষয় সংস্কৃতে অনূদিত হয়েছিল কিনা, অথবা সেই অনুবাদের ব্যাপ্তি কতখানি ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ভূগোলের একটি বই সংস্কৃতে অনূদিত হয়েছিল। সংস্কৃত বইটির নাম 'গোলাধ্য' (?)।[১২]

এই কলেজে বাইবেল তো অবশ্যপাঠ্য ছিলই, তাছাড়া খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত অন্য গ্রন্থাদিও অবশ্যপাঠ্য ছিল। বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' (ওল্ডটেস্টামেন্ট) ও 'নূতননিয়ম' (নিউটেস্টামেন্ট) সংস্কৃতে অনূদিত হয়েছিল এবং পাঠ্যও ছিল।

কার্যক্ষেত্রে এই শিক্ষাসূচীর বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি কেমন হবে এই নির্দেশক পুস্তিকায় তারও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত পড়ানোর জন্য উপযুক্ত পণ্ডিত নিয়োগের বিষয় আমরা আগেই আলোচনা করেছি এবং এইসব পণ্ডিতদের জন্য যথেষ্ট সম্মান দক্ষিণার ব্যবস্থা ছিল।

প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপকগণের বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিহাস, পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব প্রভৃতি ছিল বক্তৃতার বিষয়। অধ্যাপকরা ছাত্রদের মাতৃভাষায় এবং সংস্কৃতে এই বক্তৃতা দিতেন। ছাত্ররা পরে এইসব বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার রচনা করে নিজ নিজ অধ্যাপকের কাছে জমা দিতেন।[১৩]

এই পুস্তিকায় আরও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে প্রতিটি ছাত্রকে প্রতি সপ্তাহে বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ থেকে কিছু অংশ মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে হবে অথবা মাতৃভাষায় রচিত ধর্মশাস্ত্র থেকে কিছু অংশ সংস্কৃতে অনুবাদ করতে হবে। এই অনুবাদ পণ্ডিতমশাই সংশোধন করে দেবেন, তবে চরম অনুমোদনের জন্য সেই রচনা অধ্যাপক, পরীক্ষক অথবা সভাপতির কাছে পেশ করতে হবে।[১৪]

নির্দেশিকায় আরও প্রস্তাব করা হয়েছে যে প্রতি শ্রেণীর প্রথম পাঁচটি স্থানাধিকারী ছাত্র প্রতি তিনমাস অন্তর সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজি যে কোন ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করবে। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আগেই ঘোষিত হবে। ছাত্রদের সংস্কৃতশিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদানেরও ব্যবস্থা ছিল। এই প্রবন্ধ রচনায় প্রথমস্থানাধিকারীকে পঞ্চাশ টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে ত্রিশ টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে যোলো টাকা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।[১৫] সেই সময়ে পঞ্চাশ টাকার মূল্য কম ছিল না, একটি বড় গৃহস্থের একমাসের ভরণপোষণ সুচারুভাবেই সমাধা হত।

শ্রীরামপুর কলেজে দেশীয় খ্রিস্টান যুবকদের সংস্কৃত পাঠক্রমের প্রারম্ভিক বিষয় ছিল ব্যাকরণ এবং ছাত্রদের সংস্কৃতজ্ঞান পরিপক্কতা লাভ না করা পর্যন্ত সংস্কৃত পাঠাভ্যাস অব্যাহত গতিতে প্রচলিত থাকত। ছাত্ররা সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যে কিছুটা পারদর্শী হলে তখন দর্শনাদি অন্য বিষয়ের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল।

কলেজে শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম প্রতিবেদন থেকে সংস্কৃত শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে মাত্র একবৎসরে বেশকিছু ছাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের তিন চতুর্থাংশ মুখস্থ করেছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণে অন্যান্য ছাত্রদের অগ্রগতিও প্রায় সমান।[১৬] বলাবাহুল্য মাত্র একবৎসর কার্যকালের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের মতো একটি দুরূহ বিষয়ে ছাত্রদের এতখানি অগ্রগতি সত্যই শ্লাঘার ব্যাপার। এই প্রতিরেদনে আরও বলা হয়েছে, যে নয়জন খ্রিস্টানযুবক কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষেই সংস্কৃতবিদ্যায় এত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন যে কলেজ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট—"Nine Christian youths making so happy a beginning the very first year of college, in a language which forms the key to all the science and literature of India, filled the mind of the committee with sensations of pleasure and hope, which they cannot easily describe."[১৭]

প্রতিবেদনে কলেজের পরীক্ষাপদ্ধতির, বিশেষত সংস্কৃত ব্যাকরণের পরীক্ষাপদ্ধতির একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায়। কেরী স্বয়ং ঐ পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ২রা আগস্ট (১৮১৯ ?) তারিখে ঐ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়—"....... on the 2nd of

August, the students, who have commenced the study of Sungskrita to the number of seventeen, were examined respecting the progress they had made in Grammar, by Dr. Carey, the president in the presence of a number of pundits resident of Serampore. They are divided into three classes, those who are in the verbs, those in the nouns, adjectives and pronouns (in Sungskrita grammar classed together, as following precisely the same regimen); and those who are committing to memory the Sundhee, the rules for junctions of various letters." পরীক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কেও এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে— "The method adopted in examining them was such as to preclude the concealment of non-proficiency; the examiner having ascertained how far they are advanced, opened the book casually and pronounced first two or three words, the student immidiately went on repeating page after page till the president told him to cease; the examination then turning to another part began in the same manner and the student responded as before, going for word till told to stop. This was repeated till the president had fully satisfied himself respecting their proficiency."

ঐ পরীক্ষায় ক্রিয়া, নামপদ, সন্ধি ইত্যাদি যে শ্রেণীবিভাগ হয়েছিল, তার প্রথম বিভাগে অর্থাৎ ক্রিয়াপদের বিভাগে চারজন পরীক্ষার্থী ছিল; তাদের মধ্যে তিনজন খ্রিস্টান এবং একজন ব্রাহ্মণ। এদের মধ্যে কমল নামে যে খ্রিস্টান যুবকটি প্রথম স্থান অধিকার করেছিল তার বয়স প্রায় আঠারো। সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একশবারো পাতা মুখস্থ করেছিল এবং ক্লাসে একদিনও অনুপস্থিত ছিল না। দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছিল তারাচন্দ্র নামে একটি বালক। সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের নব্বই পৃষ্ঠা মুখস্থ করেছিল এবং ক্লাসে মাত্র দশদিন অনুপস্থিত ছিল। তৃতীয় স্থানাধিকারী ঈশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক। তার বয়স আনুমানিক উনিশ বৎসর। প্রতিবেদনে এই ছাত্রটির খুব প্রশংসা করা হয়েছে। এই ছাত্রটি শ্রীরামপুরে দেশীয় বিদ্যালয়ে তিনবৎসর শিক্ষালাভ করে, পরে আরও উচ্চশিক্ষালাভের অভিলাষে শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য বর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে। কর্তৃপক্ষ তার আবেদন মঞ্জুর করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সে তার অধীত বিষয়কে বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছিল।[১৮] রামমোহন নামে এক নিষ্ঠাবান দেশীয় খ্রিস্টানের পুত্র জীবন চতুর্থ স্থানাধিকারী। তার বয়স মাত্র বারো বছর। প্রায়ই অসুস্থ থাকার জন্য সে পরীক্ষায় আরও ভাল ফল করতে পারেনি।

পরীক্ষাসংক্রান্ত এই প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মুখস্থবিদ্যাই ছিল পরীক্ষার নিয়ামক এবং পরীক্ষার ফলের ভালমন্দের মাপকাঠি। অবশ্য বর্তমান কালেও সংস্কৃত ব্যাকরণে পারদর্শিতা অনেকটাই মুখস্থবিদ্যা নির্ভর।

উক্ত প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায় যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দুইজন ছাত্র ব্রাহ্মণ, দুইজন কায়স্থ, একজন শিখ। অন্যান্যদের মধ্যে একজন ছিল খাসিয়া উপজাতিভূক্ত এবং অপর দুইজন ব্রহ্মদেশীয়।[১৯]

কলেজকর্তৃপক্ষ যে ছাত্রদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন সে ব্যাপারটিও এই প্রতিবেদন থেকে পরিস্ফুট হয়। জীবন নামে দ্বাদশবর্ষীয় বালকটি অসুস্থতার জন্য পরীক্ষায় অভিলষিত ফল লাভ করতে পারেনি, এ বিষয়টি উল্লেখ করতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ভুলে যাননি।

এই পরীক্ষায় একজন মাত্র ছাত্র উত্তীর্ণ হতে পারেনি;তার নাম প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু সেই ছাত্রটি যে অসুস্থতার জন্য প্রায় ছয় সপ্তাহ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিল এবং সেই কারণেই তার পরীক্ষার ফল ভাল হয়নি, এ তথ্যটি সহানুভূতির সঙ্গে সরবরাহ করা হয়েছে। আমাদের মনে হয় ছাত্রটিকে অকৃতকার্যতার লজ্জা ও সঙ্কোচ থেকে রক্ষা করার জন্যই তার নাম প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়নি।

শ্রীরামপুর কলেজ চালু হওয়ার প্রথম বৎসরেই নয়জন ব্রাহ্মণকে মাসিক তিনটাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল। ঐ ব্রাহ্মণেরা জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য শ্রীরামপুর কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। এঁরা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সংস্কৃতভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন এঁদের আদৌ ছিলনা।[২০]

যদিও দেশীয় খ্রিস্টানযুবকদের ধর্মশাস্ত্রে যথাযথ শিক্ষিত করার জন্য শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, তবুও দেশীয় খ্রিস্টানযুবক ব্যতীত য়ুরোপীয় ও অন্যান্য দেশের অধিবাসীরাও সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য এই কলেজের অন্তেবাসী হতেন এবং দেশীয় অখ্রিস্টান যুবকরাও নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য এই কলেজে ছাত্ররূপে যোগ দিতেন।

ছাত্র ও অধ্যাপকদের জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। এই গ্রন্থাগারে প্রধানত সংস্কৃত ও কিছু বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি লৌকিক ভাষায় রচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। ইংরেজি ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থেরও অভাব ছিলনা, তবে তুলনামূলকভাবে বিদেশীভাষায় রচিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল অল্প। কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ইংরেজিসহ অন্যান্য বিদেশীভাষায় লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা দেড়শত এবং সংস্কৃত ও অন্যান্য লৌকিকভাষায় লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা চারশতাধিক।[২১] গ্রন্থাগারে মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক ছিল পঁচিশটি এবং পাণ্ডুলিপির সংখ্যা একশত এক। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ,

পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, কোষ, কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানাবিষয়ক পুঁথি গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছিল।[২২]

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা যেমন ছিল তেমনি গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশনার সুব্যবস্থার জন্য শ্রীরামপুর মিশন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল। মিশন প্রেসে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার পুস্তক মুদ্রিত হত। শ্রীরামপুর মিশন সংস্কৃতশিক্ষা প্রসারের জন্য সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থাও করেছিলেন। প্রকাশনা বিভাগে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলি মুদ্রণের সাহায্যে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করতেন এইসব প্রাচীনগ্রন্থে যেমন সংস্কৃত ভাষার বিভিন্নস্তর বিধৃত হয়েছে, তেমনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এবং ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপকরণও এই সমস্ত প্রাচীনগ্রন্থে নিহিত আছে। এই গ্রন্থগুলি প্রাচীনকাল থেকেই জাতির জীবনের বিভিন্ন দিকের ইতিহাস সযত্নে রক্ষা করছে আবার সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার, বাক্যের গঠনপ্রণালী, বিভিন্ন ধাতুর অর্থ, উচ্চারণ ও বানানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয় ভারতীয় লৌকিক ভাষাগুলির উপর প্রভাব ফেলেছে। এইসব বিভিন্ন দিক চিন্তা করে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃপক্ষ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলি মুদ্রণের সাহায্যে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য পাশাপাশি পুঁথি নকলের ব্যবস্থাও ছিল।

সংস্কৃতগ্রন্থ সংরক্ষণের কার্যকরী ব্যবস্থা রূপে শ্রীরামপুর কলেজ কমিটি কয়েকটি গ্রন্থ মুদ্রণের সিদ্ধান্তে নেন। প্রথমেই বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মুদ্রণের সিদ্ধান্ত হয়। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পঠনপাঠন নিম্নবঙ্গে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল[২৩] এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন ছাত্রদের সংস্কৃতশিক্ষার জন্য এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক গ্রন্থ। মুগ্ধবোধ অক্টেভ পৃষ্ঠার তিনশত কপি ছাপার প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুদ্রণের সাহায্যে অন্যান্য ব্যাকরণ সংরক্ষণের অভিলাষও তাঁদের ছিল। শ্রীরামপুর কলেজের দ্বিতীয় প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আর একটি সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করা হয়।[২৪]

কলেজ কর্তৃপক্ষ ঋক্ প্রভৃতি চারিটি বেদের প্রকাশনারও উদ্যোগ নেন। বেদের পুঁথি ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠেছিল এবং চতুর্বেদকে সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অতল থেকে রক্ষা করার জন্য শ্রীরামপুর মিশন চারিটি বেদ মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন।[২৫]

মিশনের অপর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ছিল বিখ্যাত অভিধান অমরকোষ। সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে অমরকোষ, ব্যাকরণের পরিপূরক ছিল। কলেজ পরিচালন সমিতি তাঁদের প্রতিবেদনে অমরকোষের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দিয়েছেন।[২৬]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে এইচ. টি. কোলব্রুক ইংরেজি ব্যাখ্যা সমেত

অমরকোষের যে সংস্করণটি রচনা করেন সেটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটির প্রকাশনায়ও উইলিয়ম কেরী যথেষ্ট সাহায্যে করেছিলেন, তিনি পুস্তকটির আগাগোড়া প্রুফ দেখেন। রেভারেণ্ড লঙ এই গ্রন্থটিকে জনসনের বিখ্যাত অভিধানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[২৭]

কেবলমাত্র প্রকাশনা নয়, প্রকাশনার উপকরণাদি উৎপাদনের ব্যাপারেও শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগ ছিল। মিশন প্রেস তৎকালে একটি বড় প্রতিষ্ঠান ছিল, মুদ্রণের প্রয়োজনীয় কাগজ, কালি, টাইপ সবই তাঁরা নিজেরাই উৎপন্ন করতেন। বিদেশ থেকে আমদানি করা কাগজের দাম অত্যন্ত বেশি ছিল, তাই শ্রীরামপুর মিশন একটি কাগজের কল স্থাপন করেন। এই কারখানায় উৎপন্ন কাগজে এক বিশেষধরণের রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকত, ফলে কাগজ স্থায়িত্ব লাভ করত এবং কীটদষ্ট হত না। পাণ্ডুলিপির জন্য প্রস্তুত হাতে তৈরী কাগজের মানও উচ্চস্তরের ছিল। এখনও শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরিতে রক্ষিত পুরাতন পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি কাগজের উৎকর্ষ প্রমাণ করে।

মুদ্রণের কালিও শ্রীরামপুর মিশনে উৎপন্ন হত। পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত কালিও খুব উচ্চমানের ছিল। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির অক্ষরগুলি এখনও এত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে মনে হয় যেন লেখা সদ্য সমাপ্ত হয়েছে।

উইলিয়ম কেরী কেবলমাত্র সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশ করেই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, মুদ্রণের উপযুক্ত সরঞ্জাম সুলভে এবং সহজে যাতে পাওয়া যায় সে বিষয়েও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশের একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত করেছিল।

উইলিয়ম কেরী তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায়, চিঠিপত্রে, দিনপঞ্জীতে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের প্রশস্তি করেছেন, অপরদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃতভাষার বিষয়গৌরব বৃদ্ধির আন্তরিক অভিলাষও তাঁর ছিল। তিনি মনে করতেন নিউটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিক, বেকন, লক প্রমুখ চিন্তাবিদ্ এবং ফুলার প্রমুখ খ্রিস্ট-ধর্ম্মজ্ঞদের রচনা সংস্কৃতভাষায় অনূদিত হলে সংস্কৃত সাহিত্য আরও সমৃদ্ধিলাভ করবে ও গৌরবান্বিত হবে।[২৮]

দেশীয় খ্রিস্টানদের জন্য স্থাপিত এই কলেজে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ফলাফল সম্বন্ধে উইলিয়ম কেরী আশাবাদী ছিলেন। খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ ছিল এই কলেজের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য। কৈশোর ও প্রথমযৌবন থেকেই বাইবেল এবং খ্রিস্টীয় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত থাকায় ঐ বিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞান হত গভীর। আবার সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যপাঠের ফলে তাদের ভাষাজ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করত, বুদ্ধিবৃত্তিশাণিত এবং মনস্বিতা উজ্জ্বল হত।[২৯] কেরী মনে করতেন সংস্কৃতভাষা ভারতীয় ভাষাগুলির জননীস্বরূপা, সংস্কৃতভাষার জ্ঞান নিজনিজ মাতৃভাষার জ্ঞানকেও গভীর করে। কলেজে ইচ্ছুক ছাত্রদের হিব্রু ও গ্রিকভাষা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং ছাত্রদের মূল বাইবেলের সঙ্গে পরিচিত

হওয়ার সুযোগ ছিল। এই শিক্ষিত যুবকেরা বাইবেলের অনুবাদ করলে সেই অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হবে বলেই কেরী বিশ্বাস করতেন;অন্তত সেই অনুবাদের গুণগতমান বিদেশীদের করা অনুবাদের তুলনায় অনেক উচ্চ হবে এটাই ছিল কেরীর বিশ্বাস। তাই কলেজের নির্দেশিকা পুস্তিকায় তিনি নিজেই বলেছেন—"An acquaintance with these languages combined with their intutive knowledge of their own dialects, will enable them to improve the translation and to free it from all those defects inseparable from the work of a foreigner."[৩০]

একজন ধর্মযাজকরূপে কেরী মনে করতেন যে খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ সাধারণ মানুষের নৈতিকচেতনার উন্নতি ঘটায়। সুতরাং হিন্দুদর্শন, পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের মহান ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও নৈতিকশিক্ষা যুক্ত হলে সংস্কৃত সাহিত্য অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী হবে। দেশীয় খ্রিস্টানরা সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ভাষায় পারদর্শী হলে একদিকে তাঁরা স্বদেশের প্রাচীন দর্শনাদিতে পারঙ্গম হবেন, অপরদিকে ইংরেজিভাষায় লিখিত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহ পাঠ করে নিজেদের বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তুলবেন এবং নূতনতর গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়ে দেশকে নূতন সম্পদে ভূষিত করবেন।

উইলিয়ম কেরী মনে করতেন দেশীয় খ্রিস্টানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের কর্মধারাকে যদি উৎসাহের সঙ্গে সঠিকভাবে পরিচালিত করা যায় তবে জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান সুপ্রাচীন নগরী কাশীর মতোই এই প্রতিষ্ঠান জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হবে—"If this college be conducted with due vigor it may be made Christian Benares.[৩১] কিন্তু ধর্মযাজক কেরী গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছাই শেষ পরিণাম, তাই তিনি সমস্ত পরিকল্পনা, সমস্ত উদ্যোগে রত থেকেও নম্র চিত্তে বলেছিলেন—"Let us open to them the original fountains of the sacred knowledge and all the rest to the gracious operation."

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সংস্কৃত বিভাগ ঃ

শ্রীরামপুর মিশন কলেজের সংস্কৃত পঠনপাঠন সম্পর্কে উইলিয়ম কেরী যেমন গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপকরূপেও সংস্কৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে কেরীর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। শ্রীরামপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের সংস্কৃতশিক্ষা ব্যবস্থা উভয়ই ছিল কেরীর কাছে পরস্পরের পরিপূরক।

যদিও অধ্যাপক কোলব্রুক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই সংস্কৃত বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, তবু অন্যতর সরকারী কাজে জড়িত থাকায় কলেজের সংস্কৃত বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবেই উইলিয়ম কেরী নির্বাহ করতেন।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়।[৩১] বিলাত থেকে সদ্য আগত তরুণ সিভিলিয়নদের স্থানীয়ভাষা ও দেশীয় আইনকানুনে সুশিক্ষিত করার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ* স্থাপিত হয়। কলেজের শিক্ষাক্রম যথাবিধি চালু হওয়ার সময় থেকেই আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, বাংলা, তেলিঙ্গ, মারাঠি, তামিল ও কানাড়া ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ যথাশীঘ্র সম্ভব এই বিভাগগুলিতে অধ্যাপক নিয়োগের বিষয় চিন্তা করেছিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দুআইন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এইচ. টি. কোলব্রুক। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের চার তারিখে উইলিয়ম কেরী কলেজের বাংলাবিভাগের শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। বাংলাবিভাগের প্রথম পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, দ্বিতীয় পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার এবং রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ (?), পদ্মলোচন চূড়ামণি প্রমুখ মুনসি ও পণ্ডিতও ঐদিন কাজে যোগদেন।

কিছুকাল পরে কেরী সংস্কৃত বিভাগেরও শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮০১ সনের ৫ই জুন ডঃ রাইল্যাণ্ডকে একটি চিঠিতে কেরী লেখেন—"I am also appointed teacher of the Sunguskrit language". ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে কেরী বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক এবং মারাঠি ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন।

সংস্কৃতবিভাগের ছাত্র ঃ

কেরী যখন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যবিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন তখনও সেই বিভাগে কোন ছাত্র ছিলনা। কেরী রাইল্যাণ্ডকে লিখেছেন—"though no students have yet entered in that class, yet I must prepare for it."

অবশ্য সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য বিভাগে কখনই বেশি সংখ্যক ছাত্র ছিল না। কিন্তু যে সব ছাত্র সংস্কৃতবিভাগে যোগ দিতেন তাঁরা প্রায় সকলেই কৃতী ছাত্র ছিলেন। সর্বাধিক ছাত্র যোগ দিতেন ফারসি ও হিন্দুস্থানী বিভাগে। কলেজের পরীক্ষার ফলের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ফারসি ও হিন্দুস্থানী বিভাগের ছাত্ররা অনেকেই তৃতীয় এমনকি চতুর্থশ্রেণীভুক্তও হতেন।[৩৪] কিন্তু সংস্কৃতবিভাগের অল্প সংখ্যক ছাত্র সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতেন, তাঁদের অনেকেই পদক এবং মেধার শংসাপত্রও

---

* কলেজ শব্দটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংক্ষিপ্তরূপ হিসাবে এখন থেকে ব্যবহৃত হবে।

পেতেন। নিচে সংস্কৃতবিভাগের ছাত্রদের পরীক্ষার ফলের একটি বৎসরানুক্রমিক সারণী দেওয়া গেল—

বৎসর	ছাত্রের পরিচয়
Jan 1803	1. Gowan —(Prize) 2. Martin — (Honorary rewards)
1804	1. Gorton — a Medal 2. Hayes — a Medal 3. Impay Junior — a Medal
1807	1. Romney — a Medal
1812	1. Chasteny 2. Haughton—(permitted to attend Lecture) ইনি সামরিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন)
1813	1. Glyn—Degree of Honor 2. Houghton— A medal in merit of Sanskrit
1814	1. Master—Medal of Merit 2. Fell—Medal and Rs. 1000. 3. Walker—Medal and Rs. 1000
1815	1. Monaghton—Medal of Merit 2. Monckton—Medal of Merit
1816	1. Clerk--Medal of Merit
1817	1. Morries.

ছাত্রদের মধ্যে Fell, Houghton and Walker সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৩৫]

সংস্কৃত বিভাগের ছাত্ররা প্রায় সকলেই সম্মানের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, পদক এবং মেধাবী ছাত্ররূপে শংসাপত্রও লাভ করেছেন। ১৮০৩ সনের সংস্কৃতবিভাগের পদক পাওয়া ছাত্র Gowan অন্যান্য বিষয়েও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় Mr. Gowan হিন্দুস্থানীতে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন, সংস্কৃতে পদক পেয়েছেন, কলেজ পরীক্ষায় চতুর্থস্থান, বাংলা ও নাগরী হস্তলিপিতে প্রথম, ইংরেজি প্রবন্ধ রচনায় প্রথম হয়েছেন; ক্ল্যাসিক সাহিত্য ও ফরাসিভাষার পরীক্ষায় বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। বাৎসরিক সভায় ইনি হিন্দুস্থানীভাষায় বিতর্কে এবং সংস্কৃতভাষায় প্রবন্ধ রচনায় অংশগ্রহণ করেন।[৩৬] ইনি সত্যসত্যই মেধাবী ছাত্র, বিদ্যার সর্বক্ষেত্রেই যাঁর সমান অধিকার। উইলিয়ম কেরী শিক্ষকতার প্রারম্ভিক পর্বে এই কৃতী ছাত্রের কৃতী অধ্যাপক ছিলেন।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদনে Glyn এবং Houghton এর কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়—"Two of those Houghton and Glyn have been rewarded for the difficult and rare attainment of Sanskrit."[৩৭]

শিক্ষক কেরী ঃ

শিক্ষাদানের ব্যাপারে উইলিয়ম কেরীর বিশেষ ভাবনা-চিন্তা ছিল। ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে তিনি সাক্ষাৎভাবে বিষয়মুখী পঠনপাঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বাংলা বা সংস্কৃত শিক্ষাদানের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। রামরাম বসু ব্যতীত বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিত ও মুনসিদের মধ্যে কেউই ইংরেজি জানতেন না। ভাসাভাসা ইংরেজিজ্ঞানের সাহায্যে বাংলা বা সংস্কৃতভাষায় পাঠদান কেরী পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার দুইজন পণ্ডিত কর্মপ্রার্থী হয়ে কেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এঁরা সামান্য ইংরেজি জানতেন; কেরী এঁদের শিক্ষক পদের অযোগ্য মনে করেন। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোন কোন ছাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কলেজের বাইরে শিক্ষক নিযুক্ত করতেন (Private tutor)। এই দুইজন পণ্ডিত ব্যক্তিগত শিক্ষক নিযুক্ত হন। কলেজের পণ্ডিত ও মুনসিরা এই সংবাদপেয়ে অভিযোগ করেন এবং কেরী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানান। ১৮২৭ সনের মার্চ মাসের ৬ তারিখে কেরী কর্তৃপক্ষের কাছে যে পত্র পাঠান তাতে মন্তব্য করেন—"The circumstance of their having a smattering English is rather a disadvantage than otherwise, as the vanity of imitating English composition almost invariably leads them to adopt a similar phraseology which is diametrically opposed to the proper formation of Bengalee sentences."[৩৭ক]

কথোপকথন পুস্তকের ভূমিকাতেও কেরী জানিয়েছেন অনুবাদের মাধ্যমে নয়, সাক্ষাৎ উপস্থাপনাই বিদেশী ভাষা শিক্ষার যথার্থ পন্থা, কিন্তু বিশেষ কিছু কারণেই তিনি কথোপকথনের সংলাপগুলির অনুবাদ করেছেন,[৩৮] তবে এই সংলাপগুলির আক্ষরিক অনুবাদ করেননি।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ছাড়াও অন্যান্য নানা উপায়েও কেরী ছাত্রদের ভাষাশিক্ষায় উৎসাহ দিতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সংস্কৃতবিভাগের (এবং বাংলাবিভাগেরও) ছাত্ররা বিতর্ক, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতেন। ১৮০৪ সনের Public Disputation অনুষ্ঠানে সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র C. Gowan সংস্কৃতভাষায় প্রবন্ধপাঠ করেন;Primtiae Orientales গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—"Declamation in the Sanskrit Language by Mr. Gowan."[৩৯] তাঁর প্রবন্ধের

শিরোনাম "সংস্কৃত ভাষাভ্যাসস্য ফলান্যেতানি।" ঐ গ্রন্থেই নিম্নলিখিত তথ্যটিও পরিবেষিত হয়েছে—"A declamation in the Sanskrit Language pronounced at the public disputation on the 20th September 1804 by the students of the college of Fort William, to which is added a speech in the Sanskrit Language delivered on the occasion by the Sanskrit teacher with translation."

ঐ সভায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি তাঁর ভাষণে সংস্কৃতবিভাগের ছাত্র ও অধ্যাপকদের উৎসাহের প্রশংসা করেন—"The declamation pronounced in the present occasion, in the Sanskrit language forms a peculiar distinction in the exercises of this year; the difficulties which have embarrassed the attainment of a correct knowledge of that ancient language appear to have considerably diminished, by the zeal assiduity and talents of the Professors and students and by exertions which have been successfuly employed, to facilitate the study of its elementary principles."[৪০]

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের Public Disputation-এ সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র G.C. Haughton নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন—"On the elegance and precision of the Sanskrit Language" সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক উইলিয়ম কেরী ডি.ডি।[৪১] ১৮১৪ সনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সংস্কৃত বিভাগ একটি বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করে। এই বিতর্কের প্রস্তাব ছিল—"The Greek systems of Philosophy are derived from the Hindoos" প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন Lt. Fell অপর দুইজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন J. Master and G.C. Haughton. Haughton ও সামরিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই বিতর্ক সভারও সঞ্চালক ছিলেন উইলিয়ম কেরী।[৪২]

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন Mr. Macnaghton তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল—"It is more probable that the Sanskrit, as it now exists gradually formed into one language than that with its avowed copiousness and artificial structure, it should be an aboriginal tongue"[৪২ক] সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন উইলিয়ম কেরী। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে ছাত্রদের প্রবন্ধ রচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন উইলিয়ম কেরী। প্রবন্ধে প্রকাশিত ছাত্রদের বক্তব্যের সঙ্গে উইলিয়ম কেরীর মতামতের যথেষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান।

কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় যে সব প্রবন্ধ রচিত হত অথবা বিতর্কের জন্য যে সব প্রস্তাব নির্দ্দিষ্ট হত তার অনেকগুলিই সংস্কৃতঘেঁষা। ১৮১৪ সনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় বিতর্কের প্রস্তাব ছিল—"The translation of the best works in the Sanskrit into popular languages in India would promote the extension of science and civilization" অর্থাৎ "মূল সংস্কৃতগ্রন্থ চলিত ভাষাতে তর্জমাতে বিদ্যা প্রচার হয় এবং লোকেরদের নীতিজ্ঞতাকরণ দ্বারা উপকার হয়।" এই বিতর্কের প্রস্তাবক ছিলেন টড; প্রথম নিবর্তক হায়েস (Hayes) এবং দ্বিতীয় নিবর্তক ইম্পে (জুনিয়র)। এই ইম্পে ইলাইজা ইমেপর পুত্র, অসুস্থ থাকায় তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। হায়েস ও ইম্পে উভয়েই সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যে বিশেষভাবে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং সংস্কৃত পরীক্ষায় উভয়েই পদক পান। বিতর্ক সভার সঞ্চালক ছিলেন উইলিয়ম কেরী। টডের প্রবন্ধটি Primitae Orientales পুস্তকে সংকলিত হয়েছিল।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে নিম্নলিখিত প্রস্তাবের উপর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল—"Bengalee is the purest of those languages which are derived from Sanskrit." ১৮১৩ ও ১৮১৪ সনের বাংলাভাষায় বিতর্কের বিষয় ছিল যথাক্রমে "The Oriental style of composition is more characterisation of a particular age than of a particular country." এবং "The study of Sanskrit by the learned natives of Bengal has occasioned the Bengalee language to be neglected"[৪৩] এই সব বিতর্ক সভার অনেকগুলিরই সঞ্চালক ছিলেন উইলিয়ম কেরী। শিক্ষক হিসাবে যেসব সমস্যার তিনি সম্মুখীন হতেন তারই কিছু কিছু এইসব বিতর্কে ও প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছিল।

বিশেষ পরীক্ষা ঃ

সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপকরূপে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কেরীকে এক বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল, তিনজন পরীক্ষকের কেরী ছিলেন অন্যতম। ১৮১৩ সনের বার্ষিক সভার বিবরণে কলেজের তৎকালীন সচিব বলেছিলেন—"I have alluded to the success which has already attended the measure adopted by Government of encouraging the study of Sanskrit and Arabic languages by high pecuniary rewards. That success will sufficiently evinced by the reports of two committees appointed to examine Mr. Sutherland in Sanskrit and Mr. Princep in Arabic, which as conveying first result of an interesting experiment. I am desirious of

reading in the very terms in which they are presented." সংস্কৃত পরীক্ষার পরীক্ষকত্রয় যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ এখানে পরিবেষিত হল—

"To C.M. Ricketts esq.
Secretary of the Government Public Dept.

Sir,

On compliance with your letter of the 6th February last, a Public Examination has been instituted of the proficiency of Mr Sutherland in the Sanskrit Language, and we have now request that you will lay the result of that Examination before the Right Honourable the Governor General in Council. ....

The manner in which the exercises are performed, evinced a knowledge of the Sanskrit Language and the Hindoo Law, that reflect the highest credit upon Mr. Sutherland's diligence and abilities, and entitles him most honourably, in our estimation to the reward which the liberality of Government has proposed.

We have ....

Signed :
H.T. Colebrooke
W. Carey
H.H. Wilson"

Calcutta, April 5, 1813[88]

প্রকাশনা ও মুদ্রণ ঃ

বাংলা বিভাগের প্রধানরূপে পাঠ্য পুস্তকের অভাবে কেরীকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সংস্কৃতবিভাগে অবশ্য সেই অসুবিধা তত তীব্রভাবে ছিল না, তবু তিনি ছাত্রদের সুবিধার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থপ্রকাশে মনোনিবেশ করেন। ১৮০৩ সনেই দুটি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়, একটি Folio ও আরেকটি Quarto; দ্বিতীয় গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫০।[৪৫] ১৮০৩ সনে একটি সংস্কৃত অভিধানও প্রকাশিত হয়।[৪৬] ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের

দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া কর্তৃপক্ষ সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮০৩ সনে মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণের বাংলা অনুবাদ এবং ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ভগবদ্গীতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গীতার অনুবাদক ছিলেন চণ্ডীচরণ মুনসি। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণের তৃতীয় ও চতুর্থখণ্ড প্রকাশিত হয়। এছাড়া হিতোপদেশ, দশকুমার চরিত ও ভর্তৃহরির তিনটি শতকও প্রকাশিত হয়েছিল। ভর্তৃহরির শতকের ভূমিকা লেখেন অধ্যাপক কোলব্রুক।[৪৭]

নাগরী অক্ষরে প্রেম-সাগর নামে একটি পুস্তক এইসময় প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি ভাগবতের দশম স্কন্দের অনুবাদ।[৪৮] ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দেই বিখ্যাত সংস্কৃত কোষগ্রন্থ অমরকোষ মুদ্রণের জন্য প্রেসে প্রেরিত হয়েছিল। ইংরেজি অনুবাদ ও টীকাসহ গ্রন্থটি সম্পাদন করেন অধ্যাপক কোলব্রুক। অধ্যাপক কোলব্রুক হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের (law) দায়ভাগ গ্রন্থটিও ইংরেজি অনুবাদ ও টীকাসহ সম্পাদনা করেছিলেন।[৪৯] সেই পুস্তকটিও মুদ্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত ছিল।

কলেজ কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতের একটি বর্ণানুক্রমিক অভিধান সংকলনের জন্য দেশীয় পণ্ডিতদের নিয়োগ করেন। এই অভিধানে শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তির সঙ্গে বিভিন্ন প্রাচীনগ্রন্থ থেকে উদাহরণ আহরণের পরিকল্পনাও ছিল। অভিধানটির একটি প্রতিলিপিও নাকি কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য শ্রীরামপুরের কেরী লাইব্রেরিতে এইধরণের একটি সংস্কৃত অভিধানের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।[৫০]

১৮০৯ সনে কলেজের সচিব হান্টারের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান অমরকোষের ধাঁচে একটি অভিধান সংকলনের কাজে দেশীয় পণ্ডিতদের নিযুক্ত করা হয়েছে। এই অভিধানে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা, ওড়িয়া, ত্রিহুত, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, কাশ্মীরী, নেপালি, গুজরাটি, কানাড়ি, তেলেঙ্গা, মারাঠি, তামিল অথবা মালাবার অঞ্চলের ভাষার প্রতিশব্দ প্রদত্ত হবে। এই অভিধান শ্রীরামপুরে কেরী লাইব্রেরিতে রক্ষিত Polyglot Dictionary-র অনুরূপ। উভয় অভিধানেই সংস্কৃতকে আশ্রয় করে আরও ১২টি ভাষার প্রতিশব্দ যোজিত হয়েছে, তবে ভাষাগুলি উভয় ক্ষেত্রেই এক নয়।[৫১] এই অভিধানটি মুদ্রিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপকরূপে উইলিয়ম কেরী নিশ্চয়ই অভিধান সংকলন, ব্যাকরণ রচনা ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন।

অধ্যাপক কেরীর নেতৃত্বে কলেজের সংস্কৃত ও বাংলাবিভাগ সর্বদাই কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ত থাকত। কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁরা নানাস্থানে উইলিয়ম কেরীর প্রশংসা করেছেন।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সহযোগিতায় রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উইলিয়ম কেরীই প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলি সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য

বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক বিবরণে কলেজের সচিব এই প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর বিশেষ প্রশংসা করেন—"I have received with great satisfaction the information that under patronage of the Asiatic Society, the Society of the Missionaries at the Danish settlement of Serampore, aided and superintended by the ability of Mr. Carey Professor of the Sanskrit and Bengalee Languages, has undertaken the translation of some of the most eminent and authentic works of literature......."[৫২]

উন্নতধরণের, নতুন সুছাঁদ দেবনাগরী অক্ষর ঢালাই-এর জন্যও কলেজ কর্তৃপক্ষ কেরীর প্রশংসা করেছেন—"A new and improved Debnagari type has been cast for the Shanskrit Language under the superintendence of Mr. William Carey."[৫৩]

বিতর্কসভা, প্রবন্ধপাঠ, গ্রন্থ প্রকাশনা ইত্যাদি কলেজের সমস্ত ব্যাপারেই কেরীর সংযোগ ছিল নিবিড় ও স্বতঃপ্রণোদিত। সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রদের পরীক্ষার ফলও ছিল উচ্চমানের;তাঁরা কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎসাহের সঙ্গে যোগদানও করতেন, তবু সংস্কৃত বিভাগে ছাত্রের সংখ্যা আশানুরূপ ছিল না। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে বার্ষিক অনুষ্ঠানে সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র Mr. T. Clerck যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন তাতে এই সমস্যার উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে—"To acquire a perfect knowledge of the Sanskrit Language requires a long period of deligence and exertion than to attain a similar degree of proficiency in any vernacular language."

অল্প সময়ে ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন করে কর্মজীবনে প্রবেশ করাই ছিল তরুণ ছাত্রদের কাম্য সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অধিকতর সময় ব্যয় করা তাঁরা সমীচীন মনে করতেন না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা এবং শ্রীরামপুর মিশনে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা কেরীর কাছে উভয়ই ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পার্থক্য এই যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম কেরী ছিলেন সরকারের অধীন, কিছু বিধিনিষেধ সেখানে কার্যকর ছিল কিন্তু শ্রীরামপুরে সংস্কৃতশিক্ষার প্রসার ও সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানে কেরী ছিলেন স্বাধীন;তাঁর যাজক ভ্রাতৃগণও ছিলেন একান্তভাবে তাঁরই অনুগামী। সুতরাং শ্রীরামপুরে সংস্কৃতশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা অনেক বেশি ফলবতী হয়েছিল।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। Smith, George, প্রাগুক্ত, p. 74.

২। Chattopadhyay Sunil kr : Hannah Marshman. Hoogly, 1987 p.40.

৩। তদেব, p. 40.

৪। শ্রীরামপুর মিশনের বিভিন্ন কাগজপত্র থেকে জানা যায়, ধর্মপ্রচারের সময় হিন্দু জনসাধারণ খ্রিস্টান পাদ্রিদের বক্তব্য শুনতেন, যদিও ধর্মান্তর গ্রহণের প্রতি তাঁদের আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ছিল না। কিন্তু মুসলিম জনগণ খ্রিস্টান যাজকদের প্রচারেরও বিরোধিতা করতেন। কয়েকবার মিশনের যাজকদের উগ্রপ্রতিরোধেরও সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং নির্দেশিকা পুস্তিকায় বিশেষভাবে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রাদি শিক্ষাদানের বিষয় বলা হয়েছে।

৫। College for the Instruction of Asiatic Christian and other youths in Eastern Literature and European Science. প্রাগুক্ত, p. 4.

৬। A brief view of Baptist Missions and Translating Memoir : To the progress of the translation of the Sacred Scriptures. p. 14.

৭। College for the Instruction etc. : p. 17.

৮। তদেব, p. 5.

৯। তদেব, p. 15.

১০। উল্লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত ব্যবহারশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থাও ছিল—"They shall then by direction of sub-committee proceed to read the Purans : The various systems of Hindoo philosophy, their Law works : Their best works on Astronomy and Rhetoric etc." তদেব ঃ p. 15.

১১। তদেব, p. 15.

১২। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে 'গোলাধ্য' নামে একটি বই সংস্কৃতে অনূদিত হয়। গ্রন্থটি ভূগোল সম্বন্ধীয়। Translation Memoir এর দশম খণ্ডে গ্রন্থটির মুদ্রণ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছিল। মহম্মদ সিদ্দিক খান, বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬২। পৃ-১১৪। উইলিয়ম কেরী য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশেষত ভূগোলের সংস্কৃত অনুবাদের জন্য বারংবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল।

১৩। Instruction for etc. p. 14.

১৪। তদেব, p. 14.

১৫। "The best essay shall be rewarded with a prize of Fifty Rupees the next with one of Thirty and the third with one of Sixteen" তদেব, p. 14.

১৬। "Suffice is to say, that several of the christian youths have committed to memory above threefourths of Sungskrita grammar in the space of one year, and that the progress of the greater part of the rest affords almost equal hope." তদেব, p. 10.

১৭। তদেব, p. 10.
সংস্কৃত ভাষা যে ভারতীয় সমস্ত জ্ঞানবিভাগের মাধ্যম একথা কেরী তাঁর রচনায় বারংবার বলেছেন।

১৮। যদিও শ্রীরামপুর কলেজ খ্রিস্টান যুবকদের জন্য স্থাপিত হয়েছিল তবু সেখানে দেশীয় অখ্রিস্টানদের প্রবেশাধিকার ছিল, এবং তাঁরা সেখানে নিজ নিজ অভিলষিত বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারতেন। প্রতিবেদনে ব্রাহ্মণ যুবকটির উদ্যমের যে প্রশংসা করা হয়েছে, তা কেরী মার্শম্যান প্রমুখ যাজকদের উদারতারই পরিচয় দেয়। তদেব, Ist Report p. 9.

১৯। তদেব, Ist Report p. 10.

২০। তদেব, Ist Report p. 10.

২১। তদেব, Ist Report p. 4.

২২। শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

২৩। হোরেস হেমান উইলসন এই মন্তব্য করেছেন। কেরীর সাহিত্যকৃতির সার্বিক মূল্যায়ন অধ্যাপক উইলসন সংক্ষেপে করেছিলেন। উইলসনের সেই আলোচনা কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র Eustace কেরীর Memoir of William Carey গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।

২৪। The College for Asiatic Christian etc. Second Report, p. 11.

২৫। "I have long wished to obtain a copy of the Vades and am now in hopes I shall be able to procure all that are extant....... If I succeed, I shall be strongly tempted to publish them with a translation, pro bono publico." ১৮০২ সালের ১৭ই মার্চ কেরী মিঃ সাটক্লিফকে এই পত্র লেখেন। ঐ পত্রে বেদ সম্পর্কে ফুটনোটে লেখা হয়েছে "The most sacred writing of the Hindoos" Periodical Accounts/ Relative to the Baptist Mission Society Vol. II. প্রাগুক্ত, p. 234.

২৬। College for the Asiatic Christion etc. Second report p. 8

২৭। মহম্মদ সিদ্দিকখান, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৩।

২৮। "....... We may hope gradually to see the Sungskrita and its chief dialects enriched by the best works of a Bacon, a Newton, a Locke .... and choicest intellectual treasures of Britain."

College for the Asiatic Christian etc. p. 17.

২৯। তদেব, p. 15.

৩০। তদেব, p. 2.

৩১। তদেব, p. 5.

৩২। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগস্টমাসে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলেজের পড়াশুনা ইত্যাদি শুরু হয় নভেম্বর মাসে। টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে বড়লাট ওয়েলেসলির যুদ্ধজয়ের দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ পিছিয়ে ৪ঠা মে থেকে গণ্য করা হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাস সম্পর্কে ইংরেজি ও বাংলায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাস আমরা আলোচনা করিনি।

৩৩। "Professorship shall be established as soon as may be practicable and regular courses of lectures commenced in the following branches of literature and science......"

Roebuck T, Annals of the College of Fort William. Calcutta. 1819. Introduction XV.

৩৪। রোবাকের প্রাগুক্ত গ্রন্থে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকা আছে। এবং ছাত্রদের পরীক্ষার মান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যও এই তালিকার অন্তভূর্ক্ত।

৩৫। রোবাকের প্রাগুক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত বিভিন্ন বাৎসরিক পরীক্ষার বিবরণ থেকে গৃহীত।

৩৬। Primitiae Orientales : (Vol. II) Calcutta 1803, p. XXIII.
উক্ত গ্রন্থের আখ্যাপত্রে যদিও ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ মুদ্রিত আছে কিন্তু পরবর্তী বৎসরের বিবরণও উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়, এটি প্রথমখণ্ডের তারিখ। পরবর্তী খণ্ড গুলি একত্রে বাঁধাই হয়েছে।

৩৭। Roebuck T, প্রাগুক্ত, p. 350.

৩৭ক। Das Sisir Kumar, Sahib and Munshis of Fort William College, p. 65.

৩৮। "It is readily acknowledged, that who-ever undertakes to learn a language, should accustom himself to give an account of every word, in whatsoever connection it may be found. It is on this account that Dialogues with translation have been supposed to be useless, if not injurious, furnishing the student with a kind of knowledge gratis, which he ought to aquire by application ...."
Carey W, Dialouge, p. preface I.

৩৯। Primitiac Orientales (Vol. III) প্রাগুক্ত, p. IV.

৪০। Roebuck T, প্রাগুক্ত, p. 64.

৪১। Roebuck T, তদেব, p. 345.

৪২। Roebuck T, তদেব, p. 345.

৪৩। রোবাকের প্রাগুক্ত গ্রন্থে বাৎসরিক প্রতিবেদনে বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠিত বিতর্ক, প্রবন্ধাদির বিবরণ আছে।

৪৪। Roebuck T, প্রাগুক্ত, , pp. 364-65.

৪৫। Primitiae Orientales প্রাগুক্ত, p. XIVIII.

৪৬। তদেব p. IV.

৪৭। উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হলেও সম্পূর্ণ গ্রন্থটি ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কোলব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়নি।

৪৮। College of Fort William in Bengal, London 1805, p. 226.

৪৯। তদেব, p. 299.

৫০। উক্ত অভিধান সম্পর্কে এই গ্রন্থের অভিধান অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫১। কেরী লাইব্রেরিতে রক্ষিত অভিধানে মধ্যদেশভাষা, পর্ব্বতভাষা, মিথিলাভাষা ও দ্রাবিড়ভাষার প্রতিশব্দ প্রদত্ত হয়েছে। অপরপক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অভিধানে হিন্দুস্থানী নেপালী, ত্রিহুত ভাষা সংযুক্ত হয়েছে।

৫২। Roebuck T, প্রাগুক্ত, p. 114.

৫৩। Primitiae Orientales, প্রাগুক্ত, p. xxxix.
College of Fort William in Bengal, p. 233.

সপ্তম অধ্যায়

কেরীর অন্যান্য রচনায় সংস্কৃতমনস্কতা

(ক) বাংলা বাইবেল।

উইলিয়ম কেরীর বাংলা রচনাতেও তাঁর সংস্কৃতমনস্কতা ছায়াপাত করেছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যতই নিবিড় হচ্ছিল তাঁর বাংলা রচনাতেও সংস্কৃত প্রবণতা স্ফুটতর হচ্ছিল।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে "মঙ্গলসমাচার মতীয়ের রচিত' শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। এইটি শ্রীরামপুরমিশনের প্রকাশিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ। ১৮০১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সমগ্র নিউটেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু অনুবাদের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছিল অনেক আগেই সেই প্রিন্সেস মারিয়া জাহাজে, যখন কেরী জাহাজের চিকিৎসক ডাঃ টমাসের কাছে বাংলাভাষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গের মদনাবাটিতে যখন তিনি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক, তখন মুনসি রামরামবসুর কাছে তাঁর ভাষাশিক্ষার গতি দ্রুততর হয়। রেভারেন্ড কেরী সবসময়েই মনে করতেন যে কোনও দেশের জন সাধারণের কাছে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রধান উপায় তাদের মাতৃভাষায় খ্রিস্টের বাণী প্রচার করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাইবেলের বাংলা অনুবাদের কাজে প্রবৃত্ত হন। তার পূর্বে ডাঃ টমাস বাইবেলের কোন কোন অংশের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।[১] কিন্তু তা মুদ্রিত হয়নি। রামরামবসুর সহায়তায় বাইবেলের অনুবাদের কাজ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। উইলিয়ম কেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্স এবং নবাগত যাজক জন ফাউন্টেনও বাইবেলের বাংলা অনুবাদের কাজে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। ১৭৯৬ সনেই কেরী নিউটেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ প্রায় সম্পূর্ণ করেন।[২] ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে জর্জ উডনি একটি কাঠের মুদ্রণ যন্ত্র কেরীকে উপহার দিলেও বাংলা বাইবেলের মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য তাঁকে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পর উইলিয়ম ওয়ার্ড প্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন ব্রান্সডন ও ফেলিক্স। ওয়ার্ড একজন সুদক্ষ মুদ্রাকর ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় অত্যল্পকালের মধ্যেই সেন্ট ম্যাথুর সুসমাচার মুদ্রিত হয়। 'সুসমাচারের'

প্রথম পাতাটি যেদিন ছাপা হয় সেদিন প্রেসের সকলের উৎসাহের সীমা ছিল না। ওয়ার্ড তার জার্নালে লিখেছেন—"This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Mathew".[৩]

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র নিউটেস্টামেন্ট মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কেরী লিখেছেন রামরাম বসু কেরীর বাংলা অনুবাদের ভাষা সংশোধন করে দিতেন। বাইবেলের প্রথম সংস্করণে ডাঃ টমাস, জন ফাউন্টেন, রামরামবসু সকলের রচনাই অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল, সেই সব রচনাকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করার কোন উপায় আর নেই।[৪]

১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, উইলিয়ম কেরীর জীবৎকালেই বাংলা বাইবেলের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সজনীকান্ত দাসের মতে এই তারিখ সঠিক নয়। তিনি বলেন "ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮০৩ সাল ছাপা থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হইয়ছিল।"[৫] অবশ্য এই উক্তির স্বপক্ষে তিনি কোন কারণ দর্শাননি। শক্তিব্রত ঘোষ ও এই তারিখই গ্রহণ করেছেন।[৬] সে যাই হোক, ১৮৩২ সনে নিউটেস্টামেন্টের বিশেষভাবেসংশোধিত অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় কেরী অত্যন্ত স্বস্তি পেয়েছিলেন।

ওল্ড টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদের প্রথম খণ্ড ১৮০১ সনে প্রকাশিত হয়।[৭] কেরীর মদনাবাটিতে অবস্থান কালেই ওল্ড টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ হয়েছিল। এই কাজে রামরাম বসু ও জন ফাউন্টেন কেরীকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। ফেলিক্সের সহায়তা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। জোশুয়া মার্শম্যানও অনুবাদের কাজে সহায়তা করেন। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওল্ডটেস্টামেন্টের চারিটি খণ্ডই প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন সমগ্র বাইবেলের নাম দেন 'ধর্ম্মপুস্তক'। তাঁরা নিউ টেস্টামেন্টকে 'ধর্ম্মপুস্তকে'র পঞ্চম খণ্ড আখ্যা দিয়েছেন। ওল্ডটেস্টামেন্টেরও কয়েকটি সংস্করণ হয়েছিল।

বাইবেলের সংস্কৃতপ্রবণতা ঃ

শ্রীরামপুর প্রকাশিত ধর্মপুস্তকের ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য কেরী সতত সচেষ্ট ছিলেন। তাই বিভিন্ন সংস্করণের ভাষার উন্নতি সাধনের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। সজনীকান্ত দাস প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা বলেছেন সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কেরীর বিভিন্ন গ্রন্থে ক্রমশ সংস্কৃতায়ণের প্রবণতা বাড়ছিল, বাইবেলের বাংলা অনুবাদও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ধর্মপুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণের কয়েকটি অনুচ্ছেদের তুলনামূলক আলোচনা করলেই প্রকৃত তথ্যটি উদঘাটিত হবে। আমরা প্রথমে নিউটেস্টামেন্টের কয়েকটি অনুচ্ছেদের আলোচনা করছি।

১৮০০খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নূতন নিয়মের "মাতিউ রচিত তৃতীয় পর্ব্ব"—"সে

কালে যিহোদা দেশের উজাড়ে যোহন ডুবা আইল ঢেড়ি দিতে দিতে এবং বলিতে বলিতে খেদ কর একারণ স্বর্গের রাজ্য সান্নিধ্য এই সে জন যাহার বিষয় বিভাষিত ছিল যিশউহে ভবিষ্যৎ বক্তা হইবে বলিয়া একজনের রব চেঁচাইতে চেঁচাইতে উজাড়ে প্রস্তুত করহ ঈশ্বরের পথ সোজা কর তাহার পথকে এবং সে যোহনের ছিল লোমের পরিচ্ছদ চর্ম্মের পটুকা কমরে তাহার ভক্ষ ও পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ও বনমধু। তখন যিরোশলেম ও যিহোদা দেশের চতুঃসীমার প্রজা সকল তাহার স্থানে যাইয়া পাপ স্বীকার করিলে যির্দনে ডুবিৎ ছিল তাহার করণক। অনেক ফারিসি ও শাদিতি লোক আইল তাহার ডুবিতে। অতএব তাহারদিগকে দেখিয়া বলিলেন আর সর্পের বংশ কে পরামর্শ দিয়াছে তোমাদিগকে পলায়ন করিতে আগত ক্রোধ হইতে অতএব খেদের উচিৎ।"

ঐ একই অধ্যায়ের ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণ থেকে উৎকলিত অংশ—"স্বর্গরাজ্য* সন্নিধ্য অতএব পরাগমণ+ কর একথা ঘোষণা করিয়া কহিতে ২ যোহন ডুবক সেকালে যহুদা দেশের অরণ্যে আইলেন। যিশয়াইয়া ভবিষ্যত বক্তার প্রমুখাৎ যাহার বিষয় এই কথা কহা গেল অরণ্যে চীৎকার করা একজনের রব যিহুদার পথ প্রস্তুত কর তাহার পথ সোজা করহ এই তিনি । সে যোহনের উটের লোমের পরিচ্ছদ ছিল ও কমরে চর্ম্মের পটুকা তাহার ভক্ষ্য ও পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ও বনমধু। তখন যিরোশালম ও যহুদা দেশের সবর্বলোক ও যির্দন দেশের নিকটস্থ প্রজা সকলে তাহার নিকট যাইয়া পাপ স্বীকার করিয়া তাহার করণক যির্দনে ডুবিত ছিল। অনেক ফারুসি ও শাদিকি লোক তাহার ডুবেতে আইল অতএব তাহারদিগকে দেখিয়া তিনি বলিলেন আর সর্পের বংশ ভবিষ্যৎ ক্রোধ হইতে পলাইতে কে তোমাদের পরামর্শ দিয়াছে অতএব পরাগমনের উচিত ফল ফলাও...."।

"তৃতীয়পবর্ব মাত্তিউ রচিত" অংশটি ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণে এইরূপ—"স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী অতএব পরাগমন কর একথা ঘোষনা করতে যোহন ডুবক সেকালে যিহুদাহ দেশের অরণ্যে আইল। এই তিনি যাহার বিষয় যিশাঈয়াহ, আচার্যের প্রখুখাৎ এই কথা কহা গেল যে অরণ্যে চীৎকারকারী একজনের রব যিহুহের পথ প্রস্তুত কর তাঁহার পথ শোজা কর। সে যোহন উটের লোমের বস্ত্র পরিধান করিত ও কমরে চর্ম্মের পটুকা ও তাহার ভক্ষ্য পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ও বন্যমধু। তখন য়িরোশলম ও যিহুদাহ দেশের সবর্বলোক যরদন দেশের নিকটস্থ প্রজা সকলে তাহার নিকট যাইয়া পাপ স্বীকার করিয়া তাহার করণক যরদনে ডুবিত হইল। তাহার ডুবেতে অনেক ফারিশি ও শাদুকিরদিগকে দেখিয়া তিনি তাহারদিগকে বলিলেন আর সর্পের বংশ ভবিষ্যত ক্রোধ হইতে পলাইতে কে তোমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছে। অতএব পরাগমণের উচিত ফল ফলাও।"

* অর্থাৎ ঈশ্বর রাজ্যের ন্যায় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন ইহার কাল নিকটবর্ত্তী।

\+ অর্থাৎ এক মনন ত্যাগ করিয়া অন্য মনন কর।

বাংলা বাইবেলের অষ্টম তথা কেরীর জীবদ্দশার শেষ সংস্করণটি কেরী আদ্যান্ত সংশোধন করেন এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করেন। ১৮৩২ সনের সংস্করণ থেকে আলোচ্য অংশটি উৎকলিত হল "পরাগমন কর কেননা স্বর্গরাজ্য নিকটবর্তী একথা ঘোষণা করতে যোহন ডুবক সেকালে যিহুদাহ দেশের অরণ্যে আইল যিহুয়ের পথ প্রস্তুত কর, তাঁহার পথ সোজা কর অরণ্যে চীৎকারকারি একজনের এই রব যাহার বিষয়ে যিশাঈয়াহ আচার্যের প্রমুখাৎ এই কথা কহা গেল এই তিনি সে যোহন উটের লোমের বস্ত্র পরিধান করিত ও কোমরে চর্ম্মপটুকা ও তাহার ভক্ষ্য পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ও বন্যমধু। তখন যিরুযালম ও যিহুদাহ দেশের সর্ব্বলোক ও যরদান দেশের নিকটস্থ প্রজাসকল তাঁহার নিকট যাইয়া আপন ২ পাপ স্বীকার করিয়া তাঁহার দ্বারা যরদানে ডুবিত হইল। তাঁহার ডুবেতে অনেক ফারিশি ও শাদুদীকে দেখিয়া তিনি তাহারদের বলিলেন ওরে সর্পের বংশ ভবিষ্যৎ ক্রোধ হইতে পলাইতে কে তোমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছে অতএব পরাগমণের উচিত ফল ফলাও।" ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত[৯] অনুচ্ছেদটির অর্থগ্রহণ কষ্টসাধ্য, অশুদ্ধ বানানও বেশ কয়েকটি দেখা যায়, যেমন— 'কমর' (কোমর), 'ভক্ষ' (ভক্ষ্য), উচিৎ (উচিত), ডুবিৎ (ডুবিত), ইত্যাদি। এখানে 'ঢেড়ি' 'উজাড়', 'চেঁচাইতে চেঁচাইতে' ইত্যাদি দেশজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অবশ্য তৎসম শব্দের সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি। 'চতুঃসীমা,' 'তাহারকরণক' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত প্রয়োগের পরিচয় দেয়। ১৭৯৬ সনেই কেরী নিউটেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন, কিন্তু তখনও তাঁর বাংলা ভাষার জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করেনি, অপরদিকে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং ভাষায় জড়তা আছে, অন্বয় আড়ষ্ট, আর তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হলেও সংস্কৃত ভাষা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রচনায় 'ঢেড়ি' শব্দ 'ঘোষণা'য়, 'উজাড়ে' শব্দ 'অরণ্যে' এবং 'চেঁচাইতে' শব্দ 'চীৎকারে' পর্যবসিত হয়েছে। তাছাড়া 'স্বর্গরাজ্য', 'সর্ব্বলোক', 'নিকটস্থ' প্রভৃতি সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। 'প্রমুখাৎ' শব্দটি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত প্রয়োগ এবং 'পরাগমণ' শব্দটি দার্শনিকশব্দগন্ধী। কেরী 'পরাগমণ' শব্দটির ব্যাখ্যাও করেছেন পাদটীকায়। এই অনুচ্ছেদে বানানেরও উন্নতি দেখা যায়, যদিও 'কোমর' শব্দ এখনও 'কমর'ই আছে। কেরী এখানে একটি নতুন শব্দ তৈরী করেছেন—'ডুবক'। 'পাচক' ইত্যাদি শব্দের অনুকরণে দেশজ 'ডুব্' ধাতুর সঙ্গে 'অক্' (ণক্) প্রত্যয় যোগ করে শব্দটি নিষ্পন্ন করেছেন। বস্তুত পক্ষে অন্বয়ের আড়ষ্টতা সত্ত্বেও ভাষার সংস্কৃত প্রবণতার অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। এই সময় কেরী বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষকের পদে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান করেছেন; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে, ফলে ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব একান্ত স্বাভাবিক।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে সংস্কৃত প্রত্যয়ের সঙ্গে কেরী অধিকরতর পরিচত হয়েছেন, 'সান্নিধ্য' শব্দের পরিবর্তে নিকটবর্ত্তী এবং 'চিৎকরা একজন' এই শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে 'চীৎকারকারী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উভয়স্থলেই তিনি সংস্কৃত ণিন্' প্রত্যয়ের ব্যবহার করেছেন। আর একটি কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দব্যবহার করেছেন 'আগত'। পূর্ববর্ত্তী সংস্করণের 'তাহার ডুবেতে আইল' ইত্যাদি অংশ 'তাহার ডুবেতে আগত' রূপ পেয়েছে। অর্থাৎ 'আইল' শব্দের পরিবর্তিত রূপ হয়েছে 'আগত'। আরেকটি উল্লেখযোগ্য শব্দ ব্যবহার 'করত'। 'ঘোষণা করিয়া কহিতে'[২] এই অংশকে 'ঘোষণা করত' তে রূপান্তরিত করা বিশেষ মনস্বিতার পরিচয়। 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত ও 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত দুটি অসমাপিকা ক্রিয়ার পাশাপাশি অবস্থানকে কেরী একটি তসিল্ প্রত্যয়ান্ত পদ 'করত'তে রূপান্তরিত করেছেন। অবশ্য তসিল্ প্রত্যয়ের অন্তর্গত বিসর্গ (ঃ)টি লোপ পেয়েছে। এটি অবশ্য আধুনিকতার লক্ষণ নয়, অনবধনতার লক্ষণ। 'বনমধু' শব্দটিও সংস্কৃত রূপ পেয়েছে 'বন্যমধু।'

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণের পাঠ মোটামুটি ১৮১৩ খিস্টাব্দের সংস্করণের অনুরূপ। তবে এখানে 'কোমর', 'সোজা' শব্দ দুটির সঠিক বানান প্রযুক্ত হয়েছে, 'কমর', 'শোজা' নয়। কিন্তু 'চীৎকারকারী একজন' রূপান্তরতি হয়েছে 'চীৎকারকারি একজন' পদগুচ্ছে। এটি কি অসাবধনতা বশত হয়েছে অথবা কেরীর সংস্কৃত মননের ফল। প্রত্যয়যোগে ও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে ইন্ ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের দীর্ঘ ঈকার হ্রস্ব ইকারে রূপান্তরিত হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের এই নিয়ম কি কেরীর মননে স্থান পেয়েছিল! তাই তিনি 'চীৎকারকারি একজন' পদগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন! এক্ষেত্রে সঠিকভাবে কিছু বলা যায়না। তবে ১৮৩২ সনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন "তাহার দ্বারা যর্দনে ডুবিত হইল" বাক্যাংশের 'তাহার দ্বারা'। ১৮০০ সনের সংস্করণ, থেকে পরপর সবকয়টি সংস্করণে 'তাহার করণক' ব্যবহৃত হয়েছে। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্নরূপে 'করণক' শব্দটি বাংলাগদ্য সাহিত্যের প্রথম দিকে প্রায়ই ব্যবহৃত হত। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিভিন্ন গ্রন্থে তৃতীয়া বিভক্তিতে 'করণক' শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়[১০] এবং এটি সংস্কৃত ভাষাভঙ্গীর প্রয়োগ। কেরীর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণে 'তাহার করণক' পদের পরিবর্তে "তাহার দ্বারা' এই প্রয়োগের বিশেষ কারণ থাকতে পারে। কেরীর জীবৎকালেই তাঁর অনূদিত বাইবেলের দুর্বোধ্যতা ও ভাষার আড়ষ্টতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল। এমনকি ইয়েটস্, ওয়েঙ্গার প্রমুখ মিশানরিরাও কেরীর বাংলা বাইবেলের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন[১১] অনেকে আবার অতিরিক্ত সংস্কৃতপ্রবণতা দুর্বোধ্যতার কারণ মনে করেছিলেন। এইসব সমালোচনা সম্বন্ধে কেরী নিশ্চয় অবহিত ছিলেন, হয়তো ভাষাকে সহজবোধ্য করার জন্যই 'করণক' স্থলে "দ্বারা" বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছিল।

ওল্ডটেস্টামেন্টের সংস্কৃতায়ণ ঃ

বাইবেলের ওল্ডটেস্টামেন্ট বা পুরোন নিয়মের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংস্করণে এই সংস্কৃতায়ণ ঘটেছিল। আখ্যাপত্র অনুসারে ওল্ডটেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদের প্রথম সংস্করণ ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মতে এই তারিখ ঠিক নয়। ১৮০১ সনের ১৮ই ডিসেম্বর কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড লিখিত একটি চিঠি ও ১৮০২ সনের ১৬ই জুলাই-এর একটি চিঠি উদ্ধৃত করে সজনীকান্ত দাস দেখিয়েছেন যে ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণ ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষে প্রকাশিত হয়েছিল।[১২] পুরাতননিয়ম বা ওল্ড-টেস্টামেন্টের চারিটি বর্গের মধ্যে এটি প্রথম বর্গ—'মোশারব্যবস্থা"। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে 'দাউদের গীত', ১৮০৫ সনে চতুর্থ বর্গ 'ভবিষ্যদ্বাক্য' এবং ১৮০৯ সনে দ্বিতীয় বর্গ 'য়িশারালের বিবরণ' প্রাকাশিত হয়। আমরা পুস্তকে মুদ্রিত তারিখই গ্রহণ করেছি। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম সংস্করণ থেকে নিম্নলিখিত অংশ উৎকলিত হয়েছে—"(১) প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী (২) পৃথিবী শূন্য এবং অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান (৩) হইলেন জলের উপর পরে ঈশ্বর বলিলেন (৪) দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন তৎপরে (৫) ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকারে বিভিন্ন করিলেন ঈশ্বর ও দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস (৬) এবং ঈশ্বর বলিলেন আকাশ হউক জলের মধ্যে স্থলে সে জল এজল প্রথক করুক (৭) অতএব ঈশ্বর সৃজন করিলেন আকাশ ও প্রথক করিলেন আকাশের ওপরের জল নিচের জল হইতে (৮) তাহাতে সে মত হইল ঈশ্বর সে আকাশের নাম রাখিলেন স্বর্গ সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইলে হইল দ্বিতীয় দিবস। এবং ঈশ্বর বলিলেন স্বর্গের নিচের জল একত্তর হউক একস্থানে ও সুস্ক ভূমি প্রকাশ হউক। পরে ঈশ্বর সে সুস্কভূমির নাম রাখিলেন পৃথিবী ও সে জলের একত্তরের নাম রাখিলেন সমুদ্র ঈশ্বর ও তাহা দেখিলেন বিলক্ষণ।"

উল্লিখিত অংশটি ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণে নিম্নলিখিত রূপ লাভ করেছে—"(১) প্রথমে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃজন করিলেন (২) পৃথিবী শূন্যা ও অস্থিরাকার ছিল এবং গাম্ভীর্যের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে (৩) দোলায়মান হইলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন যে দীপ্তি হউক (৪) তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন সে দীপ্তি যে উত্তম ঈশ্বর তাহা দেখিলেন তৎপরে (৫) ঈশ্বর দীপ্তি ও অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করিলেন। ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস রাখিলেন ও অন্ধকারের নাম রাত্রি। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল। (৬) এবং ঈশ্বর বলিলেন জলের মধ্যস্থলে আকাশ হউক এবং সে জল এজল হইতে পৃথক করুক। (৭) অতএব ঈশ্বর আকাশ সৃজন করিলেন ও আকাশের উপরিস্থ জলকে নীচস্থ জল হইতে পৃথককরিলেন (৮) তাহা সে মত হইল। ঈশ্বর সে

আকাশের নাম স্বর্গ রাখিলেন সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল (৯) এবং ঈশ্বর বলিলেন স্বর্গের নীচস্থ জল একস্থানে একত্র হউক ও শুষ্কভূমি প্রকাশিত হউক তাহাতে সেইমত হইল। পরে ঈশ্বর সে শুষ্কভূমির নাম পৃথিবী রাখিলেন ও সে জল একত্র হওয়ার নাম সমুদ্র রাখিলেন। পরে সে যে উত্তম ঈশ্বর তাহা দেখিলেন।"

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ১৮৩২ সনের সংস্করণ থেকে গৃহীত "(১) প্রথমে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন (২) পৃথিবী অস্থিরাকার এবং শূন্যা এবং গম্ভীর স্থলের উপর অন্ধকার ছিল ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর দোলায়মান হইলেন (৩) পরে ঈশ্বর বলিলেন যে দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল (৪) তখন ঈশ্বর দেখিলেন যে দীপ্তি উত্তম তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি ও অন্ধকার বিভিন্ন করিলেন। (৫) ঈশ্বর দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল। (৬) এবং ঈশ্বর কহিলেন জলের মধ্য স্থলে আকাশ হউক এবং সে জল এ জল হইতে পৃথক করুক (৭) অতএব ঈশ্বর আকাশের সৃষ্টি করিলেন এবং আকাশের উপরিস্থ জলকে নীচস্থ জল হইতে পৃথক করিলেন তাহাতে সেমত হইল (৮) এবং ঈশ্বর আকাশের নাম স্বর্গ রাখিলেন এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল। (৯) পরে ঈশ্বর বলিলেন স্বর্গের নীচস্থ জল একত্র হউক ও শুষ্ক ভূমি প্রকাশিতা হউক তাহাতে সেইমত হইল। পরে ঈশ্বর শুষ্কভূমির নাম পৃথিবী রাখিলেন ও সে জল একত্র হওয়ার নাম সমুদ্র রাখিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে তাহা উত্তম।"

ভাষার বিশ্লেষণ ঃ

উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলির ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ওল্ডটেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণে কেরী প্রধানত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কয়েকটি স্থলে বানানের বিপর্যয় ঘটেছে, যেমন—'পৃথক' স্থলে 'প্রথক', 'শুষ্কভূমি' 'সুস্কভূমি'র রূপ গ্রহণ করেছে। কেরী একটি তদ্ভব শব্দ 'একত্তর' প্রয়োগ করেছেন, যা সাধারণত কবিতায় ব্যবহৃত হয়। দুটি স্থলে উত্তম বা ভাল অর্থে 'বিলক্ষণ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। বিলক্ষণ শব্দের অর্থ বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত, অর্থাৎ অন্যের থেকে পৃথক। কিন্তু ভাল বা খুব অর্থে বাংলা ভাষায় বিলক্ষণ শব্দের অর্থ কিছুটা তির্যক, যেমন—"বিলক্ষণ উত্তমমধ্যম দেওয়া গেল"; অর্থাৎ ভাল মতো প্রহার করা গেল। অব্যয়পদ রূপেও বিলক্ষণ শব্দের প্রয়োগ আছে, যেমন—"বিলক্ষণ! এ আর বেশি কথা কি!" সুতরাং বিলক্ষণ শব্দটি যদি কেরী সচেতন ভাবেও প্রয়োগ করে থাকেন, তবে সেটি সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়নি।

১৮১৪ সনের সংস্করণে বানানের সে রকম কোন বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়না। সংস্কৃতভাষার সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠতায় কেরী বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণটিও স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করেছেন—"পৃথিবী শূন্যা ও অস্থিরাকার ছিল।" ঐ অনুচ্ছেদেই

'শুষ্কভূমির' 'প্রকাশিতা' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের 'গভীর' শব্দটি 'গাম্ভীর্য্যে পর্যবসিত হওয়ায় অধিকতর সংস্কৃত ভাবাপন্ন হয়েছে, কিন্তু অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। 'বিলক্ষণ' শব্দটি উত্তমে পরিণত হয়েছে। ১৮৩২ সনের শেষ সংস্করণে বিশেষ কোন পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা হয়নি।

বাইবেলের বাংলা অনুবাদের ভাষাকে আক্ষরিক করার প্রযত্নে কেরী প্রথম থেকেই তৎসম শব্দের প্রয়োগে সচেতন ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও অনুবাদের প্রাথমিক পর্যায়েই বাংলা সাধুভাষা ও জনগণের মুখেরভাষার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান তাঁকে বিভ্রান্ত করে এবং তিনি ক্রমশ সংস্কৃত ভাষার দিকে আকৃষ্ট হন।

মনে হয় ধর্মগ্রন্থরূপে বাইবেলের গাম্ভীর্য ও পবিত্রতাকে যথাযথ রক্ষা করার জন্য কেরী সুচিন্তিত ভাবেই সংস্কৃত বহুল ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন—"Carey made frequent use of Sanskrit words and compounds. It must be assumed that he did so deliberately because on his view, dignity of such words and compounds accorded with the dignity of the Biblical language"[১৩]

কেরী যখন বাইবেলের বাংলা অনুবাদ শুরু করেন তখনও তাঁর বাংলাভাষার জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। প্রথমত অনুবাদে বেশ কিছু দেশজ শব্দ এবং চলতি বুলিও প্রযুক্ত হয়েছে, যা ধর্মগ্রন্থের মর্যাদার সঙ্গে সমাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অবশ্য তার অনেকটাই কেরীর ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অমনোযোগের ফল।[১৪]

যাইহোক বাংলা বাইবেলের আড়ষ্ট, কৃত্রিম ভাষা কখনই বাংলাভাষার মূলস্রোতে মিশে যায়নি। এই বিশেষ ধরণের ভাষা দেশীয় খ্রিস্টান সমাজের ধর্মচারণের ভাষারূপেই এখনও বিদ্যমান।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। "It is customary to attribute the authorship of the entire Bengali Bible to Carey but from the report of the work given by him.....we find that in the first version, Fountatin and Thomas helped him much. Fountain translated I and 2 Kings, Joshua, Judges, Ruth 1 and 2 Samuel and two Chronicles : while Thomas undertook Matthew, Mark (ii-x) Luke and James. All the rest was Carey's own as well as the whole correction."
De. S.K. প্রাগুক্ত, p-107 (Foot Note)

২। ১৭৯৩ সনের জুলাইমাসে কেরী ফুলারকে লিখেছেন".......almost all the Pentateuch and the New Testament are now completed."
Carey E, প্রাগুক্ত, p-195

৩। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মার্চের ওয়ার্ডের জার্নাল। পিরিওডিকাল এ্যাকাউন্টসে উদ্ধৃত।

৪। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৩০৪

৫। সজনীকুমার দাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৯

৬। শক্তিব্রত ঘোষ, প্রগুক্ত, পৃ-৮৪

৭। আখ্যাপত্রটি এইরূপ—
"ধর্ম্মপুস্তক....মোশার ব্যবস্থা /তর্জ্জমা হইল ঙেব্রি ভাষা হইতে শ্রীরামপুরে ছাপা হইল/১৮০১

৮। সজনীকান্ত দাস নানা চিঠিপত্র আলোচনা করে দেখিয়েছেন গ্রন্থটি ১৮০২ সনের আগে প্রকাশিত হয়নি।
সজনীকান্তদাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৫
সুশীলকুমার দেও তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে বলেছেন ওল্ডটেস্টামেন্ট ১৮০২-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছাপা হয়েছিল। p-107

৯। আখ্যাপত্রে ১৮০০ সন উল্লিখিতথাকলেও সজনীকান্তদাস তাঁরগ্রন্থে আখ্যাপত্রের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় গ্রন্থটি ১৮০১ সনে মুদ্রিত হয়েছিল। সুশীল কুমার দেও পুস্তকটির তারিখ নির্দেশ করছেন ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮০১।

১০। যৎকরণক, তৎকরণক -হিতোপদেশ, পৃ-৫৩
সুখকরণক, প্রবোধচন্দ্রিকা, পৃ-২৮৬
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, কলকাতা, ১৯৪৩

১১। কেরীর বাইবেলের বাংলা অনুবাদে ভাষাবৈশিষ্ট্য যথাযথ রক্ষিত হয়নি, অনেকের মতো ইয়েট্স্ একথা বিশ্বাস করতেন। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬৭

১২। "The last sheet of the Pentateuch will be printed next week, and we are about to print the last volume but one of the Testaments including Job and Solomon'song. One hundred copies of the Psalms and Issiah have been ordered by the College at Calcutta."
সজনীকান্তদাসের প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ-১৩৬

১৩। Das Sisir Kumar, Early Bengali prose:
Carey to Vidyasagar. 1966, p-61

১৪। তদেব, p-63.

(খ) বাংলা ব্যাকরণ

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে কেরীর বাংলা ব্যাকরণ A Grammar of the Bengalee Language প্রকাশিত হয়েছিল।[১] কিন্তু গ্রন্থটির প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল বেশ কয়েকবছর আগেই। উত্তরবঙ্গে মদনাবাটিতে অবস্থান কালেই কেরী ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এই ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৭৯৫ সনের ডিসেম্বরে মিঃ পীয়ার্সকে লেখা এক চিঠিতে কেরী জানিয়েছেন যে বাংলা ভাষা বেশ কঠিন, অন্তত যে ভাষায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরা কথা বলেন, আর সাধারণ মানুষ ফারসি, হিন্দুস্থানী, পোর্তুগীজ শব্দমিশ্রিত এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে।[১ক] কেরীর ধারণা ছিল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কথিত বাংলাই শুদ্ধ বাংলা। এই বাংলাভাষাকে আয়ত্ত করার জন্য তিনি একটি শব্দ সম্ভার সংকলনে ও ব্যাকরণ রচনায় মনোনিবেশ করেন। শ্রীযুক্ত পীয়ার্সকে লিখিত উল্লিখিত পত্র থেকে কেরীর বাংলাভাষায় সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনার সংবাদটিও জানা যায়—"I have been trying to compose a compendious grammar of the language which I send you, together with a few pages of Mahabharata with a translation which I wrote for my own exercise in Bengalee"[২]

এই ব্যাকরণ রচনায় কেরী হ্যালহেডের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন, যদিও শব্দরূপ ও ধাতুরূপের ব্যাপারে হ্যালহেডের সঙ্গে তাঁর কিছু পার্থক্য ছিল।[৩]

কেরীর বাংলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ সনে শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত হয়। এরমধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনার কাজে কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং কেরী বাংলা ও সংস্কৃতবিভাগের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সংস্পর্শে এসেছেন, সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অধিকতর অধিকারও জন্মেছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কেরী লিখেছেন—"Since the first edition of this work was published, the writer has had an opportunity of obtaining a more accurate knowledge of this language" ফলে বাংলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় একটি নতুন গ্রন্থে পর্যবসিত হয়েছে। কেরী নিজেই এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"The result of his application to it he has endeavoured to give in the following pages, which [on account of the variations from the former edition] may be esteemed a new work"[৪] এই দ্বিতীয় সংস্করণটি মূলত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল।

বাংলা ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণ ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে এবং চতুর্থ সংস্করণ ১৮১৮

খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে, উইলিয়ম কেরীর মৃত্যুর পর। বাংলা ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণ সাধারণভাবে দ্বিতীয় সংস্করণেরই অনুরূপ, তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে অধ্যায়ের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, কিছু কিছু উদাহরণের পরিবর্তন এবং অনেক নতুন উদাহরণের সংযোজনও লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ।

উত্তরবঙ্গে অবস্থানকালেই কেরী জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কাছে সংস্কৃতশিক্ষা শুরু করেন। সেই সূত্রে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রচিত সংক্ষিপ্ত বাংলা ব্যাকরণে কিছু কিছু সংস্কৃত প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।[৫] বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণে কেরী 'গুণ' 'ব্রিদ্ধি' ইত্যাদি সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।[৬] হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বর প্রভৃতি সংস্কৃত পরিভাষা বাংলা ব্যাকরণে সাধারণভাবেই গৃহীত হয়েছে। কেরী হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর প্রভৃতির পারস্পরিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র উল্লেখ করেছেন—"The short vowels are called হ্রস্ব and the long one দীর্ঘ. These are often changed one for another by two rules in the Moogdhabooda....."[৭]

বাংলা কারকের আলোচনাতেও কেরী সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন—The cases of Bengalee nouns are seven.....which answering to the Sungskrito cases I have placed the same order."[৮]

ঐ পুস্তকেরই অন্যত্র কেরী বলেছেন সংস্কৃত বৈয়াকরণরা সমাসবদ্ধ পদরচনার জন্য কতকগুলি বিশেষ সূত্র রচনা করেছেন, কেরীর বাংলা ব্যাকরণেও তার ছায়াপাত ঘটেছে।[৯] সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণেও তিনি সমাসকে দ্বন্দ্ব, প্রভৃতি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

যদিও কেরী বারংবার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উল্লেখ করেছেন তবুও তিনি বাংলা ব্যাকরণই রচনা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সংস্কৃতমনস্কতা তখনও কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেনি। বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের রচনা কালে বাংলা বানান বিশেষত তৎসম শব্দের বানান সম্বন্ধে কেরী যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না—ব্রিদ্ধি (পৃ-১৯), প্রীয়তর, প্রীয়তম (পৃ৩৭) প্রভৃতি প্রয়োগই তার প্রমাণ।

কেরীর বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের সংস্কৃত প্রবণতা সম্পর্কে ডঃ এম. এ. কাইউম মন্তব্য করেছেন"........Carey nevertheless incorporated in his grammar several sections from his translation of the Mugdhabodha, i.e. though not believing in Sanskritisation as a doctrine like Halhed, he nevertheless contributed to it."[১০]

বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণেই কেরী সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনুসরণ করে কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধণ্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্ণয় করেছিলেন। স্বরবর্ণের

মধ্যে দীর্ঘ ঋকার এবং দীর্ঘ ৯ কারকে স্থান দিয়েছিলেন। যদিও তিনি জানতেন 'ক্ষ' 'ক' ও 'ষ' এই দুই বর্ণের যোগফল তবুও বাংলা ব্যাকরণের ধারাকে অনুসরণ করে 'ক্ষ' 'Kheeo' কে বাংলা বর্ণমালায় স্থান দিয়েছিলেন। প্রথম সংস্করণে সংস্কৃতের অনুসরণ করলেও তা কোথাও স্বভাবকে অতিক্রম করে যায়নি।

কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা অনেক অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করেছেন। এই সংস্করণে তিনি বর্ণগুলির অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ ইত্যাদি পরিচয় প্রদান করেন এবং বর্ণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। এটি সংস্কৃত প্রবণতারই ফল।

দ্বিতীয় সংস্করণে কেরী কিছু কিছু অশুদ্ধ রূপ সংশোধন করেছেন; যেমন প্রথম সংস্করণে পুংলিঙ্গ শব্দের উদাহরণরূপে উদাহৃত 'বিড়ালা', 'মৃগা' প্রভৃতি অশুদ্ধ শব্দ দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হয়। প্রথম সংস্করণে স্থৈর্য্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে 'তা' প্রত্যয় যোগ করে কেরী 'সৌন্দর্য্যতা' 'স্থৈর্য্যতা' প্রভৃতি শব্দ গঠন করেন, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ রচনাকালে উল্লিখিত শব্দগুলির অশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সচেতন হন, দ্বিতীয় সংস্করণে কেরী নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন— "We frequently meet with such words as 'ধৈর্য্যতা' paticnce, 'সৌন্দর্য্যতা' beauty itself etc. but this form though common must be esteemed a corruption arising from an affectation of learning among ignorant"[১১]

বাক্যের গঠন বা Syntax সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কেরী লিখেছেন বাংলা বাক্য কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া অনুসারে গঠিত হয়—"Furthermore a rule is added to the syntax section demonstrating the proper word order in Bengalee Sentences, i.e agent object verb"[১২]

ব্যাকরণটির দ্বিতীয় সংস্করণে কেরী বিভিন্ন ধরণের প্রচুর তৎসমপদ ব্যবহার করেছেন, বাংলা ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় না এমন কিছু শব্দও লক্ষিত হয়, যেমন 'নববধ্বাগমন' (পৃ ২৪) হবির্ভোক্তা (পৃ-২৮), অপচ্ছয়ন, (পৃ-২৭) ইত্যাদি। শব্দগুলি সন্ধির দৃষ্টান্ত রূপে উল্লিখিতহয়েছে। পরবর্তী কালে কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধানে এইধরণের প্রচুর শব্দ সংকলিত হয়েছে।

কেরীর বাংলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে—যেমন অবগীর্য, অপ্রাণিবাচক, জাতিবাচক, নিমিত্তার্থ, প্রত্যাহার ইত্যাদি। এ ছাড়া সন্ধি, সমাস, কারক;কর্তা, কর্ম প্রভৃতি কারকের বিভিন্ন নাম; দ্বন্দ্ব, দ্বিগু প্রভৃতি সমাসের নাম সংস্কৃত পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত হলেও, খুব স্বাভাবিক কারণেই এগুলি বাংলা ব্যাকরণে গৃহীত হয়েছে।

সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে বাংলা ব্যাকরণ রচনার সূচনায় কেরী বিশ্বাস

করতেন যে বাংলাভাষায় কিছু পরমিাণে আরবি, ফারসি প্রমুখ বিদেশী শব্দের ব্যবহার একান্ত স্বাভাবিক এবং বিদেশী শব্দের অন্তর্ভূক্তি ও আত্মীকরণ ভাষাকে সমৃদ্ধতর করে। বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কেরী লিখেছেন—"This is called pure Bengalee; but the multitudes of words originally Persian or Arabic are constantly employed in conversation which perhaps ought to be considered as enriching rather than corrupting the language"[১৩]

কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাতে কেরী লিখেছেন "The Bengalee may be considered as mere nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India, for though it contains many words of Persian and Arabic origin, yet the far greater number are Sungskrit."[১৪]

এখানে কেরী বাংলাভাষার উপকরণরূপে আরবি, ফারসি শব্দাবলীকে গ্রহণ করলেও ঐ শব্দ সম্ভার বাংলাভাষাকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে সে ব্যাপারে তিনি নীরব। সংস্কৃত বা তৎসম উপকরণই তাঁর সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অথচ ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণে আরবি, ফারসি শব্দভাণ্ডার বাংলাভাষাকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন উচ্চারণ করেছেন।

কেরীর A Grammar of Bengalee Language এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান চার বৎসর। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে কেরী তাঁরই রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন কোন বিষয়ের আলোচনায় অত্যন্ত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন—গুণ, বৃদ্ধি প্রভৃতির আলোচনায়। কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয়েছে—"The changes of i to e, u to o, r to ar and l to al are called goon...."[১৫] আর কেরীর বাংলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণে 'গুণ' এর সংজ্ঞা প্রায় একই ভাষায় প্রদত্ত হয়েছে—"The change of i to e, u to o, r to ar and l to al is called goon"[১৬] কেরী তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃতভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বাচস্পতির মতো বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে তখন তাঁর নিয়ত সাহচর্য। সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় এঁদের সহায়তার বিষয় কেরী সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করেছেন।[১৭] এই পরিবেশে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সংস্কৃতমনস্কতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং তারই প্রভাব বাংলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণে লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে ডঃ কাইউম মন্তব্য করেছেন— "This remodelling of C.B.G. II is in accordance with C.S.G. indicates a considerable degree of Sanskritisation[১৮]

কেরীর বাংলা ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয়

সংস্করণ ও তৃতীয় সংস্করণের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তৃতীয় সংস্করণে কয়েকটি অধ্যায় পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং কিছু কিছু সংযোজন করা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে সংস্কৃতায়ণের লক্ষ্যে কেরী আরও অগ্রসর হয়েছেন।[১৯] বাংলা ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণে কেরী সন্ধির জন্য একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধির সঙ্গে বিসর্গ সন্ধির উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সন্ধি প্রসঙ্গে কেরী 'প্রত্যাহার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'প্রত্যাহার' রচনার ব্যাপারটি সহজবোধ্য করার জন্য কেরী মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ থেকে মাহেশ্বর সূত্র উদ্ধার করেছেন—"To simplify the rules for permutation of letters, the alphabet is thrown into an artificial forms as follows—

অ ই উ ঋ ৯ ক্	এ ও ঙ্ ঐ ঔ চ্
হ য ব র ল	ঞ ণ ন ঙ ম
ঝ ঢ ধ ঘ ভ	জ ড দ গ ব
খ ফ ছ ঠ হ	চ ট ত ক প

পাদ টীকায় কেরী বলেছেন—" The ক্ ঙ্ and চ্ of the first line are put for the sake of pronouncing the samaharas, but must not be reckoned among the letters."

"Any letters in this scheme, including all the intermediate ones, are called সমাহার or প্রত্যাহার viz, collection "[২০] বস্তুত পক্ষে বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যাহার সন্ধিপ্রক্রিয়ায় প্রয়োজন হয় না। মাহেশ্বর সূত্রের উল্লেখ ও প্রত্যাহারের রচনা কেরীর অতিরিক্ত সংস্কৃতমনস্কতারই পরিচয় দেয় কেরী প্রত্যাহারের ব্যাপারটি বুঝিয়েও দিয়েছেন—"Where any two of the letters are mentioned the mediate ones are included, Example অ-চ্ is all the vowels, ই-চ্ all the vowels except অ-আ, the long vowels being included in the similar short ones" দ্বিতীয় সংস্করণে বর্ণের আলোচনার সঙ্গেই সন্ধি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে সম্পূর্ণ দশম অধ্যায়টি সন্ধির জন্য নিবেদিত হয়েছে।

এই সংস্করণে Formation of words বা শব্দের গঠন সম্পর্কে কেরী অধিকতর সংস্কৃতনিষ্ঠ। কেরী প্রচুর তৎসম শব্দের উদাহরণ দিয়েছেন এবং শব্দের গঠন বিশ্লেষণে সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের আশ্রয় নিয়েছেন। বিশেষ্যের গঠন প্রসঙ্গ কেরী লিখেছেন—"Many substantives are found by the affixe য, these being feminine in Sungskrita must receive the feminine increment আ, exam: ক্রিয়া a work, শয্যা a bed, বিদ্যা science"[২১] এই প্রসঙ্গে কেরী স্মরণ করিয়ে

দিয়েছেন 'আ' প্রত্যয় যুক্ত কিছু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়, যেমন—দিদৃক্ষা, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি।[২২]

বিশেষণের গঠন প্রসঙ্গেও কেরী সংস্কৃত প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়েছেন—"In the Sungskrita Language many other affixes are used to form adjectives of the class and the works thus formed are often used in Bengalee language, those of the most frequent occurences are—ইল, শ, র, ইন, ইক, আলু, শালিন্, and উল exam : পিচ্ছিল slippery, লোমশ hairy, মধুর sweet, মলিন filthy, মায়িক delucive, দয়ালু compassonate, ধৈর্য্যশালী patient, বাতুল hypochondriac" [২৩] এমন কি অনেকস্থলে বাংলা শব্দরূপের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতের অনুগামী ইন্ ভাগান্ত শব্দের রূপ প্রসঙ্গে কেরীর এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে—"The final long vowel of the words becomes short when the word is declined—exam: আজ্ঞাকারী a commander, আজ্ঞাকারিতে by a commander.[২৪]

সংস্কৃতে ইন্‌ভাগান্ত শব্দগুলির প্রথমার একবচন দীর্ঘ ঈকারান্ত হয়; কিন্তু অন্যান্য বিভক্তিতে প্রায়ক্ষেত্রে হ্রস্ব ইকার হয়।[২৫]

বাংলা ব্যাকরণের এই সংস্করণে কেরী, সম্বোধনে 'ভো', 'হে' ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন।

যদিও বাংলায় বিশেষণের লিঙ্গান্তর ঘটে না, কিন্তু কেরী বিশেষণের লিঙ্গপরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন—"A visheshuna must be the same gender with visheshya, যুবা পুরুষ, যুবতী স্ত্রী"[২৬] এই রকম আরও উদাহরণ কেরী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন—'পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন'। সংস্কৃতমনস্ক কেরী সর্বনাম শব্দেরও তিনটি লিঙ্গ স্বীকার করেছেন—"...pronouns have masculine, feninine and neuter gender [২৭] এ ক্ষেত্রেও তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুসরণ করেছেন।

ক্রিয়া পদের আলোচনায় কেরীর সংস্কৃতনিষ্ঠ মনোভাব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে, আলোচ্য তৃতীয় সংস্করণে তিনি লিখেছেন—"the Bengalee verbs with a few exceptions are formed from Sungskrit dhatoos or roots."

এমনকি তদ্ভব ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেও তিনি মূল সংস্কৃতধাতু অনুসন্ধান করেছেন, যেমন কর্, ধর্ ইত্যাদি ধাতুর পরিবর্তে তিনি 'কৃ' 'ধৃ' ইত্যাদি ধাতু নির্দেশ করেছেন।[২৮] অথবা বাংলা থাক্ ধাতুর মূল অনুসন্ধান করেছেন সংস্কৃত 'স্থা' ধাতুতে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেরী তাঁর বাংলা-ইংরেজি অভিধানে সংস্কৃতধাতুর একটি দীর্ঘ তালিকা সংযোজন করেছেন, ঐ অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রথম সংস্করণ অসম্পূর্ণ ছিল), ও বাংলা ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণ একই বৎসরে (১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে)

প্রকাশিত হয়।

কেরীর সংস্কৃতমনস্কতা এতদূর প্রসারিত ছিল যে, এমনকি বাংলা উচ্চারণ পদ্ধতিও তাঁর অভিপ্রেত ছিলনা। বাংলা উচ্চারণে বর্গীয় 'ব' ও অন্ত্যস্থ 'ব' এর মধ্যে কোন পার্থক্য রক্ষা করা হয় না। অন্ত্যস্থ 'য'ও বর্গীয় 'জ' এর মতোই উচ্চারিত হয়। কিন্তু কেরী অন্ত্যস্থ 'ব' ও অন্ত্যস্থ 'য' এর মূল উচ্চারণ রক্ষার পক্ষাপাতী ছিলেন। 'শ', 'ষ' ও 'স'- এরও সংস্কৃতানুগ যথাযথ উচ্চারণ বাংলাভাষায় হয় না। কেরী এই সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণ রচনার সময়েই কেরী সমাস, উপসর্গ ইত্যাদির আলোচনায় বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই অনুসরণ বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যাপার, একে সংস্কৃতায়ণ বা Sanskritisation বলা চলে না। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডঃ কাইউম মন্তব্য করেছেন—"Carey nevertheless incorporated in his grammar several section from his translation of Mugdhbadhha" কিন্তু "It would be wrong to state that by 1801 Carey was totally committed to Sanskritisation."[২৯]

কিন্তু সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কেরীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁর মন সংস্কৃতের অনুগামী হয়ে উঠে। কালের অগ্রগতির সঙ্গে এই সংস্কৃতানুগত্য সংস্কৃতনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয়। তাই তিনি বাংলা ব্যাকরণ রচনা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেন।—"A very large portion of the words in the Bengalee language are formed from the Sanskrita roots with which, and the manner of forming words from them, every student of the Bengalee and other languages derived from that sources ought to be well acquainted."[৩০] এবং সংস্কৃতজ্ঞ কেরী সুনিশ্চিত বিধান দেন যে বাংলা শব্দ সম্ভারের সমৃদ্ধতর জ্ঞান সংস্কৃত ভাষার কৃদন্ত, উণাদি প্রভৃতি প্রত্যয় নির্ভর—Those who wish to become better acquainted with the etymolgy of Bengalee words will do well to study carefully the Chapter of কৃদন্ত and উনাদি affixes of the Sungskrita grammar."[৩১]

কেরীর ব্যাকরণের চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ মাত্র, সুতরাং সেই সংস্করণগুলিতে উত্তরোত্তর সংস্কৃতায়ণের পরিচয় অন্বেষণ বৃথা।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। উইলিয়ম কেরীর বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—A/ GRAMMAR/OF BENGALEE LANGUAGE/ BY W. CAREY/PRINTED AT THE MISSION PRESS/SERAMPORE. 1801.

১ক। Periodical Accounts, Vol I, P-222

২. তদেব, p-222

৩। "Much merit is due to Mr. Halhed, except whose work, no grammar of this language has hitherto appeared. I have made some distinctions........"
Carey W, A Grammar of Bengalee Language. Serampore, 1801. Ist edition. preface IV.

৪। Carey. W, A Grammar of Bengalee Language, Serampore 1805. 2nd Edition. Preface IV

৫। Qayyum. M.A., A Critical Study of the Early Bengali Grammars Halhed to Haughton, Asiatic Society, Bangladesh. Dhaka 1982. p-136

৬। Carey W , প্রাগুক্ত, p-19

৭। তদেব, p-19

৮। তদেব, p-21

৯। তদেব, p-82

১০। Qayyum.M.A, প্রাগুক্ত, p-137

১১। Carey. W, Bengalee Grammar. (2nd ed) p-56

১২। Carey W , প্রাগুক্ত, p-159

১৩। Carey. W, Bengalee Grammar. (Ist ed), Preface III

১৪। Carey W, তদেব,

১৫। Carey W, A Grammar of Sungskrit Language, Serampore. 1806. p-16

১৬। Carey. W, Bengalee Grammar. (2nd ed) p-22

১৭। Carey W, A Grammar of Sungskrit Language, Preface.

১৮। Qayyum.M.A , প্রাগুক্ত, p-165

১৯। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কেরীর বাংলা ব্যাকরণের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের তুলনায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় একটি নতুন বই। তৃতীয় সংস্করণেও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র। সুতরাং চতুর্থ বা পঞ্চম সংস্করণের পাঠ তৃতীয় সংস্কণের পাঠ রূপে গণ্য করা যায়।

২০। Carey. W, Bengalee Grammar. (5th ed) p-97

২১। Carey W, প্রাগুক্ত, p-72

২২। তদেব, p-72

২৩। তদেব, p-40

২৪। তদেব, p-23

২৫। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ্‌রা বাংলা ব্যাকরণে কর্তা কর্ম ইত্যাদি কারককে প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদি ক্রমে নির্দ্দিষ্ট বিভক্তিগুলিতে সাজাতে চাননি। তাঁরা বিভক্তির চিহ্নগুলি মাত্র উল্লেখ করতে চেয়েছেন। কিন্তু কেরী সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সরল ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, কলকাতা ১৯৫৬, পৃ-১১১

২৬। Carey W , প্রাগুক্ত, p-153

২৭। তদেব, p-26

২৮। নির্মল দাশ , বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, কলকাতা ১৩৯৪, পৃ-১২৪

২৯। Qayyum.M.A , প্রাগুক্ত, p-137

৩০। Carey W , প্রাগুক্ত, p-70

৩১। তদেব, p-131

(গ) কথপোকথন

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—Dialouges. গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরকম—Dialouges/Intended/to facilitate the acquiring/of/The Bengalee Language./Serampore,/Printed at the Mission Press 1801.

গ্রন্থটি Colloquies নামেও পরিচিত। পুস্তকটির ভিতরের পৃষ্ঠায় কথোপকথন নামটি পাওয়া যায় এই কথোপকথন নামটিই প্রসিদ্ধ এবং বহুল প্রচলিত। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৬ সনে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদের মৌখিক ভাষা শেখানোর জন্য রচিত হয়; এটি কেরীর বাংলা ব্যাকরণের পরিপূরক গ্রন্থ।

গ্রন্থের বিবরণ ঃ

Dialogues বা কথোপকথন ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়—বাঁদিকের পৃষ্ঠায় বাংলা ও ডানদিকের পৃষ্ঠায় ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়। কথোপকথনে মোট একত্রিশটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলির বিষয় বস্তু 'চাকর ভাড়াকরণ' অর্থাৎ সাহেব ও তাঁর পরিচর খানসামা প্রভৃতির কথাবার্তা, 'স্ত্রীলোকের কথোপকথন', 'যাজক ও যজমান', 'মাইয়া কন্দল', 'জমিদার রাইয়ত', 'তিতরিয়া কথা' ইত্যাদি। সুশীল কুমার দে এই কথোপকথনগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।[১] কথোপকথনগুলি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মৌখিক ভাষা হওয়ায় স্বভাবতই তাদের ভাষারীতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভূমিকায় কেরী নিজেই ভাষারীতির এই পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন সাহেবের সঙ্গে খানসামা প্রভৃতির কথাবার্তায় আরবি, ফারসি, পোর্তুগীজ শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে।[২] আবার কোথাও কোথাও গম্ভীর ভাষারীতির অবতারণা হয়েছে—"From the thirty first to fortieth pages are instances of grave stile."

কেরী আরও লক্ষ্য করেছেন স্ত্রীলোকদের কথোপকথনের ভাষা পুরুষদের থেকে ভিন্ন।[৩]

বইটিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ স্থান পাওয়ায় সমাজের এক সর্বাঙ্গীন চরিত্র ফুটে উঠেছে, কেরী বলেছেন "I believe the imitation to be so exact that they will not only assist the student, but furnish a considerable idea of the domestic econony of the country."[৪]

এই গ্রন্থের তথাকথিত নিম্নবর্ণের, জেলে, মজুর অথবা দরিদ্র স্ত্রীলোকদের সংলাপ পরবর্তী যুগের টেকচাঁদ ঠাকুর ও দীনবন্ধু মিত্রের ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন কোন সংলাপের মধ্যে একধরণের নাটকীয়তা বর্তমান, যা বাংলা নাটকের গূঢ় বীজকে সূচনা করে।[৫]

লেখক প্রসঙ্গে ঃ

সজনীকান্ত দাস লিখেছেন কথোপকথন পুস্তকের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে কেরীর নাম উল্লিখিত হয়নি,[৬] তবে ভূমিকায় কেরীর স্বাক্ষর ছিল। কেরী নিজেই ভূমিকায় বলেছেন—"I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural stile of the persons supposed to be speakers." কথোপকথনগুলি সম্বন্ধে কেরীর মৃত্যুর পর এশিয়াটিক জার্নালে কেরীর ঘনিষ্ঠ জনৈক ব্যক্তি লিখেছিলেন—"These are composed originally by a clever native."[৭]

এইসব উক্তি থেকে মনে হয় কেরী গ্রন্থটি রচনা করেননি;তিনি গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেছিলেন। গ্রন্থটির সম্পাদক ও সংকলকও তিনি। তিনি গ্রন্থটির অনুবাদকও। ভূমিকায় কেরী লিখেছেন তিনি অধ্যায়গুলির আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, কারণ এই ধরণের বাংলার আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব নয়।[৮]

সুতরাং এশিয়াটিক জার্নালে যে 'clever native'-এর কথা বলা হয়েছে তাঁরা কে বা কারা;যাঁরা এই কথোপকথনগুলি সংকলন করেছেন? অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন এই sensible native মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।[৯]

পুস্তকের প্রথম দিকে সাহেবের জীবনযাত্রা—'চাকর ভাড়াকরণ', 'সাহেব ও মুনসি', 'পরামর্শ', 'যাত্রা' ইত্যাদি যে অধ্যায়গুলি আছে, সেগুলির লেখক উইলিয়ম কেরী হতে পারেন। য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের জীবনযাত্রার এত খুঁটিনাটি বিষয় কোন দেশীয় ব্যক্তির পক্ষে নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব নয়। বিশেষত কোন কোন অনুচ্ছেদে কেরীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে, যেমন কেপে আটক থাকা বা ঝড়ের মুখে পড়া ইত্যাদি। হয়তো কেরী নিজের অভিজ্ঞতা এবং য়ুরোপীয় ব্যক্তির জীবন যাত্রা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখের কাছে বর্ণনা করেছিলেন তাঁরা সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন অথবা হয়তো কেরী ইংরেজি ভাষায় এই অংশগুলি আগে রচনা করেছিলেন, পরে বাংলায় অনুবাদ করা হয়, তবু প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রথমত মৃত্যুঞ্জয় ইংরেজি জানতেন না, যে তিনি কেরীর লিখিত ইংরেজি অংশগুলি বাংলায় অনুবাদ করবেন। দ্বিতীয়ত সংলাপে আরবি, ফারসি শব্দের আধিক্য এতবেশি[১০] এবং বাক্য বিন্যাস ইংরেজি ধরণের[১১] যে

এগুলি মৃত্যুঞ্জয়ের লেখনী প্রসূত মনে হয় না। 'এখন আমি শুই যাইয়া' বা 'যে আজ্ঞা শয়ন করুন যাইয়া' প্রভৃতি বাক্যবিন্যাস বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয়ের নয়। বিশেষত কেরীর উক্তিতে 'sensible native'- এর বহুবচন ব্যবহার এ ব্যাপারে আরও গোল বাধায়।

সাহেবের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি কি তবে রামরাম বসু রচনা করেছিলেন? কিন্তু লেখাগুলি এত জীবন্ত এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ এত স্পষ্ট যে আমাদের মনে হয় এগুলি কেরীরই রচনা। অবশ্য বাইবেলের বাংলা অনুবাদের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার পার্থক্য কম নয় এবং এত অল্প সময়ে ভাষার এত উন্নতি কি কেরীর পক্ষে সম্ভব ছিল!

এ ব্যাপারে আমাদের মনে রাখতে হবে কেরী দীর্ঘকাল গ্রামবাংলায় বাস করেছেন, সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। গ্রামের সেই সব মানুষের ইংরেজি জানার প্রশ্নই ছিল না। কেরী তাঁর সংস্কৃতভাষণে বলেছেন—এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা তিনি জানেন এবং বাংলাভাষা প্রায় তাঁর মাতৃভাষা।[১২] তাছাড়া কেরী বাইবেলের বাংলা অনুবাদ করেছেন একজন ধর্মযাজকের সততা ও নিষ্ঠার অনুপ্রেরণায়, যেখানে আক্ষরিক অনুবাদ ছিল একান্ত অভিপ্রেত। হিব্রু, গ্রিক বা ইংরেজিভাষার বাক্যবিন্যাসকে তিনি সেখানে যথাযথ অনুসরণ করেছেন, সুতরাং সে রচনা আড়ষ্ট হতে বাধ্য, বাংলাভাষার সহজ সাবলীল অন্বয় সেখানে আশা করা যায় না, আর অনুবাদ সম্বন্ধে কেরীর স্বচ্ছদৃষ্টি ছিল, তিনি জানতেন অনুবাদ শব্দের পরিবর্তে শব্দের উপস্থাপনা মাত্র নয়।[১৩] এইসব দিক বিবেচনা করলে আমরা অনুমান করতে পারি সাহেবের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি উইলিয়ম কেরীর রচনা।

সংস্কৃত প্রবণতা ঃ

সজনীকান্ত দাস বলেছেন "দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সকল পরবর্তী সংস্করণে কেরী কথোপকথনের ভাষাকে স্থানে স্থানে সংস্কৃত ঘেঁষা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন।"[১৪] কথোপকথনের প্রথমদিকের অধ্যায়গুলি যদি কেরীর রচনা হয়, তবে বিভিন্ন সংস্করণের এই অধ্যায়গুলির পর্যালোচনা করলে সংস্কৃত প্রবণতার পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে।

'চাকর ভাড়াকরণ' অধ্যায়ের

—"তুমি কেটা। তোমার বাড়ী কোথায়"।

—"সাহেব আমার নাম রমজান, আমার বাড়ী কলকাতায়" প্রথম সংস্করণের ইত্যাদি অংশ পরবর্তী সংস্করণে সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে, 'বাড়ী' পরবর্তী সংস্করণগুলিতে লিখিত হয়েছে 'বাটী', কেটা > কেডা হয়েছে, যদিও এটি সংস্কৃত প্রবণতা নয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদের 'তৎকথা' অংশে প্রথম সংস্করণের "সাহেব, আবশ্যিকি, চাকর, এই কয়জন" ইত্যাদি উক্তির 'আবশ্যিকি' পদটি সংশোধিত হয়ে 'আবশ্যক'

এই গ্রন্থের তথাকথিত নিম্নবর্ণের, জেলে, মজুর অথবা দরিদ্র স্ত্রীলোকদের সংলাপ পরবর্তী যুগের টেকচাঁদ ঠাকুর ও দীনবন্ধু মিত্রের ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন কোন সংলাপের মধ্যে একধরণের নাটকীয়তা বর্তমান, যা বাংলা নাটকের গূঢ় বীজকে সূচনা করে।[৫]

লেখক প্রসঙ্গে ঃ

সজনীকান্ত দাস লিখেছেন কথোপকথন পুস্তকের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে কেরীর নাম উল্লিখিত হয়নি,[৬] তবে ভূমিকায় কেরীর স্বাক্ষর ছিল। কেরী নিজেই ভূমিকায় বলেছেন—"I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural stile of the persons supposed to be speakers." কথোপকথনগুলি সম্বন্ধে কেরীর মৃত্যুর পর এশিয়াটিক জার্নালে কেরীর ঘনিষ্ঠ জনৈক ব্যক্তি লিখেছিলেন—"These are composed originally by a clever native."[৭]

এইসব উক্তি থেকে মনে হয় কেরী গ্রন্থটি রচনা করেননি;তিনি গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেছিলেন। গ্রন্থটির সম্পাদক ও সংকলকও তিনি। তিনি গ্রন্থটির অনুবাদকও। ভূমিকায় কেরী লিখেছেন তিনি অধ্যায়গুলির আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, কারণ এই ধরণের বাংলার আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব নয়।[৮]

সুতরাং এশিয়াটিক জার্নালে যে 'clever native'-এর কথা বলা হয়েছে তাঁরা কে বা কারা;যাঁরা এই কথোপকথনগুলি সংকলন করেছেন? অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন এই sensible native মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।[৯]

পুস্তকের প্রথম দিকে সাহেবের জীবনযাত্রা—'চাকর ভাড়াকরণ', 'সাহেব ও মুনসি', 'পরামর্শ', 'যাত্রা' ইত্যাদি যে অধ্যায়গুলি আছে, সেগুলির লেখক উইলিয়ম কেরী হতে পারেন। য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের জীবনযাত্রার এত খুঁটিনাটি বিষয় কোন দেশীয় ব্যক্তির পক্ষে নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব নয়। বিশেষত কোন কোন অনুচ্ছেদে কেরীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে, যেমন কেপে আটক থাকা বা ঝড়ের মুখে পড়া ইত্যাদি। হয়তো কেরী নিজের অভিজ্ঞতা এবং য়ুরোপীয় ব্যক্তির জীবন যাত্রা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখের কাছে বর্ণনা করেছিলেন তাঁরা সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন অথবা হয়তো কেরী ইংরেজি ভাষায় এই অংশগুলি আগে রচনা করেছিলেন, পরে বাংলায় অনুবাদ করা হয়, তবু প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রথমত মৃত্যুঞ্জয় ইংরেজি জানতেন না, যে তিনি কেরীর লিখিত ইংরেজি অংশগুলি বাংলায় অনুবাদ করবেন। দ্বিতীয়ত সংলাপে আরবি, ফারসি শব্দের আধিক্য এতবেশি[১০] এবং বাক্য বিন্যাস ইংরেজি ধরণের[১১] যে

এগুলি মৃত্যুঞ্জয়ের লেখনী প্রসূত মনে হয় না। 'এখন আমি শুই যাইয়া' বা 'যে আজ্ঞা শয়ন করুন যাইয়া' প্রভৃতি বাক্যবিন্যাস বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয়ের নয়। বিশেষত কেরীর উক্তিতে 'sensible native'- এর বহুবচন ব্যবহার এ ব্যাপারে আরও গোল বাধায়।

সাহেবের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি কি তবে রামরাম বসু রচনা করেছিলেন ? কিন্তু লেখাগুলি এত জীবন্ত এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ এত স্পষ্ট যে আমাদের মনে হয় এগুলি কেরীরই রচনা। অবশ্য বাইবেলের বাংলা অনুবাদের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার পার্থক্য কম নয় এবং এত অল্প সময়ে ভাষার এত উন্নতি কি কেরীর পক্ষে সম্ভব ছিল!

এ ব্যাপারে আমাদের মনে রাখতে হবে কেরী দীর্ঘকাল গ্রামবাংলায় বাস করেছেন, সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। গ্রামের সেই সব মানুষের ইংরেজি জানার প্রশ্নই ছিল না। কেরী তাঁর সংস্কৃতভাষণে বলেছেন—এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা তিনি জানেন এবং বাংলাভাষা প্রায় তাঁর মাতৃভাষা।[১২] তাছাড়া কেরী বাইবেলের বাংলা অনুবাদ করেছেন একজন ধর্মযাজকের সততা ও নিষ্ঠার অনুপ্রেরণায়, যেখানে আক্ষরিক অনুবাদ ছিল একান্ত অভিপ্রেত। হিব্রু, গ্রিক বা ইংরেজিভাষার বাক্যবিন্যাসকে তিনি সেখানে যথাযথ অনুসরণ করেছেন, সুতরাং সে রচনা আড়ষ্ট হতে বাধ্য, বাংলাভাষার সহজ সাবলীল অন্বয় সেখানে আশা করা যায় না, আর অনুবাদ সম্বন্ধে কেরীর স্বচ্ছদৃষ্টি ছিল, তিনি জানতেন অনুবাদ শব্দের পরিবর্তে শব্দের উপস্থাপনা মাত্র নয়।[১৩] এইসব দিক বিবেচনা করলে আমরা অনুমান করতে পারি সাহেবের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি উইলিয়ম কেরীর রচনা।

সংস্কৃত প্রবণতা ঃ

সজনীকান্ত দাস বলেছেন "দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সকল পরবর্তী সংস্করণে কেরী কথোপকথনের ভাষাকে স্থানে স্থানে সংস্কৃত ঘেঁষা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন।"[১৪] কথোপকথনের প্রথমদিকের অধ্যায়গুলি যদি কেরীর রচনা হয়, তবে বিভিন্ন সংস্করণের এই অধ্যায়গুলির পর্যালোচনা করলে সংস্কৃত প্রবণতার পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে।

'চাকর ভাড়াকরণ' অধ্যায়ের

—"তুমি কেটা। তোমার বাড়ী কোথায়"।

—"সাহেব আমার নাম রমজান, আমার বাড়ী কলকাতায়" প্রথম সংস্করণের ইত্যাদি অংশ পরবর্তী সংস্করণে সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে, 'বাড়ী' পরবর্তী সংস্করণগুলিতে লিখিত হয়েছে 'বাটী', কেটা > কেডা হয়েছে, যদিও এটি সংস্কৃত প্রবণতা নয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদের 'তৎকথা' অংশে প্রথম সংস্করণের "সাহেব, আবশ্যিকি, চাকর, এই কয়জন" ইত্যাদি উক্তির 'আবশ্যিকি' পদটি সংশোধিত হয়ে 'আবশ্যক'

হয়েছে। ঐ অনুচ্ছেদেরই "খানসামা এসব চাকর কি ২ কাজ করে" অংশের 'এসব' পদটি পরিবর্তিত হয়েছে 'এসকল' পদে।

'সাহেবের হুকুম' অনুচ্ছেদে "নাপিত ডাকহ ক্ষৌর হইব" উক্তির 'ক্ষৌর' পদটি সংশোধিত হয়েছে 'ক্ষৌরী' পদে। ঐ অনুচ্ছেদেই "নাপিত কোথায় আমি চুল বন্ধাইব" এই উক্তির 'বন্ধাইব' এই উৎকট শব্দটি পরবর্তী সংস্করণে "কাটিব" শব্দে পরিণত হয়েছে, যদিও এটি সংস্কৃত প্রবণতার উদাহরণ নয়।

১৮১৮ সনের সংস্করণে 'পরামর্শ' অধ্যায়ের কায > কর্ম হয়েছে। 'সাহেব ও মুনসি'র কথোপকনে মেহেরবাণী > অনুগ্রহ এবং কাযকাম > কার্য্যকর্ম্ম-তে পরিবর্তিত হয়েছে। 'যাত্রা' অধ্যায়ে 'বাতাসের কারণ' পরিবর্তিত হয়েছে 'বাতাস প্রযুক্ত'তে।

এইসব পরিবর্তন সংস্কৃত প্রবণতার খুব উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নয়। তবে সাহেব ও তাঁর কর্মচারীদের কথোপকথনের মধ্যে 'আপনশক্তিমত', 'তপ্ত', 'মার্জ্জন', 'বিজ্ঞলোক', 'দেশীয় রাজকার্য', 'উৎপন্নমতি', 'বুদ্ধিমন্ত', 'সময়ানুযায়ি', 'সূপকার', 'উত্তমব্যঞ্জন' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দগুচ্ছের ব্যবহার সংস্কৃতের প্রতি আকর্ষণের পরিচয় দেয়।

১৮১৮ সনের সংস্করণে কিছু কিছু শব্দের বানানও সংশোধিত হয়েছে, যেমন বিসম > বিষম; প্রবর্ত্ত > প্রবৃত্ত, গর্পসর্প > গল্পসল্প প্রভৃতি। কিছু কিছু আরবি, ফারসি শব্দকেও পরবর্তী সংস্করণে শুদ্ধরূপ দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।[১৫]

তবে তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বাক্যের গঠনে পরিবর্তন; ইংরেজি ধরণের বাক্য গঠনকে যথাসম্ভব বাংলা অন্বয়ের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যথা— "হে ভাই তুমি বস এখানে" > "হে ভাই তুমি এখানে বস" অথবা "আমি দেখি নাই তোমাকে" > "আমি তোমাকে দেখি নাই", "কোথা পাইয়াছ এ দিব্য ফল" > "এ দিব্য ফল কোথা পাইয়াছ"।

তৎসম প্রাধান্য ঃ

'ভদ্রলোক২ প্রাচীন২', 'ঘটকালি' বা 'যাজক-যজমান' ইত্যাদি অধ্যায়ে স্বভাবতই তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি, সেই ভাষার কিছু কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে— "বাটীর মঙ্গল সকলেই প্রাণে২ কুশলে আছে" (ভদ্রলোক২ প্রাচীন২); "বসুজা মহাশয় হে তোমার কন্যার সম্বন্ধ অমুক গ্রামের গৌরহরি ঘোষের পুত্রের সহিত কর্তব্য তাহারা জাত্যাংশেও যেমন আর অন্নযোগও স্বচ্ছন্দ আছে" (ঘটকালি); "গুরুদশা লোকের দুঃসময়েই হয় ইহার আর বিদশা নাই ..... তোমার বিষয় বিভোগ সমস্তই আমার জ্ঞাতসারে আছে ..... তোমার আকাশপাতাল নাম আছে প্রতুল না করিতে পারিলে অখ্যাতি।" (যাজক-যজমান)।

কোন কোন অধ্যায়ে সংস্কৃত প্রবাদ বাক্যও উদ্ধৃত হয়েছে, তবে অশুদ্ধ আকারে,

যেমন—"সে অদৃষ্টাধীন নিয়তঃ কেন বাধ্যতে।" (ভদ্রলোক২ প্রাচীন২)

কথোপকথন পুস্তকে, বিশেষত প্রথম সংস্করণে অশুদ্ধ বানানের বাহুল্য আছে, বাক্যের গঠন নির্দোষ নয়, ভাষারীতিতে সাধু ও চলিতভাষার মিশ্রণও দেখা যায়। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও কথোপকথন এক যুগান্তকারী গ্রন্থ। স্ত্রীলোক, পুরুষ, সাধারণ ভদ্রলোক, সাহেব ও তাঁর পরিচরবর্গ, জমিদার, মজুর, জেলে সকলের মুখের বুলিই এখানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সাধুভাষা ও চলিতভাষার পৃথক ভঙ্গী এই পুস্তকেই প্রথম সচেতনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সমাজসচেতনতা, জীবন্তভাষা, সংলাপের নাটকীয়তা ইত্যাদি সামগ্রিক বিচারে বইটি সেকালের পক্ষে একটি অভাবনীয় রচনা, বাংলা সাহিত্যের একটি দুর্লভ রত্ন। এই গ্রন্থ রচনায় কেরী সংস্কৃত ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন কিনা, হলে কতটা হয়েছেন ইত্যাদি ব্যাপার এই পুস্তকের প্রসঙ্গে নিতান্তই অর্থহীন মনে হয়।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। "The colliquies may be conveniently arranged thus under different heads of subjects : (1) Conversation relating to every-day-life of middle class country gentlemen. (2) Talks about land, its cultivation, farming, produce, rent etc. (3) Talks about business matters, e.g. between a debtor and his creditor etc. (4) Conversation "both in friendly and contentious style" between women of various types, their going to the market etc. (5) General talks about eating, journeying, taking counsel etc. (6) Conversation among lower classes of people e.g. labourers, fishermen, beggars etc.", De Sushil Kumar প্রাগুক্ত, p. 138-39।

অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগ খুব সুচিন্তিত নয়, য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি একটি শ্রেণী হতে পারে এবং পঞ্চম সংখ্যক বিভাগটি সাহেবের জীবনযাত্রারই অন্তর্গত।

২। "A Khansama or a Sirkar talking to an European and vice-versa generally intermixes his language with words derived from Arabic or Persian and some few corrupted English and Portuguese words", Carey W, Dialogues. (1st edition) Serampure 1801, Preface IV.

৩। "Women speak a language considerably differing from that of the men" 'তদেব' Preface IV.

৪। তদেব, Preface IV.

৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪৪

৬। সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩১।

৭। সজনীকান্তদাসের প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ-১৩২।

৮। "I have only added very free translation, leaving it to him to account for every word, by making stridely literal one."
Carey W, প্রাগুক্ত, Preface IV.

৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কথোপকথনের গ্রন্থ কর্তৃত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং শেষপর্যন্ত অনুমান করেছেন পুস্তকটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ প্রাগুক্ত, পৃ-৭৩৯-৭৪২।

১০। কথোপকথনের 'চাকর ভাড়াকরণ' অধ্যায় থেকে কতকগুলি শব্দ উদাহৃত হল। শব্দগুলি ইতস্তত সংগৃহীত— খানসামা, খেদমতগার, লওয়াজেমা, বাবুরচি, খানা, মেজ ইত্যাদি। কেরী সাটক্লিফকে একটি চিঠিতে (৯ই আগস্ট ১৭৯৪) লিখেছেন— "........ and the Hindustanee spoken by the Musselmans and lower Hindoos. This last is a mixture of Bengalee and Persian." অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে য়ুরোপীয়রা পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন পোর্তুগীজ ভাষায় এবং পরিচারক প্রভৃতি নিম্নবর্গের ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশ্রভাষায়।

১১। শিশিরকুমার দাস কথোপকথনের কিছু কিছু বাক্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সেগুলি ইংরেজি বাক্যগঠন প্রণালী (S.V.O) অনুসরণ করেছে।
Das Sisir Kumar, প্রাগুক্ত, pp. 72-73.

১২। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের Public Disputation অনুষ্ঠানে প্রদত্ত উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত ভাষণ। (পূর্বে উদ্ধৃত)

১৩। (the translation) "is not in exchange of a number of words for an equal number in other language, but in transfusing into one precisely the idea expressed in another. This is a matter of such importance that without it the very nature of a translation is misunderstood."
Seventh Memoir respecting translation, p. 25.

১৪। সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩১।

১৫। কথোপকথনের প্রথম সংস্করণের কয়েকটি আরবি, ফারসি শব্দ তৃতীয় সংস্করণে সংশোধিত হয়েছে, যেমন— শেলাম > সেলাম, লওয়াজেমা > লওয়াজিমা, খেদমতগার > খিদমতগার, বাবুরচি > বাবরচি, আ্যবদার > আবদর প্রভৃতি।
দৃষ্টান্তগুলি ইতস্তত সংগৃহীত।

(ঘ) ইতিহাসমালা

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস থেকে ইতিহাসমালা প্রকাশিত হয়। ইতিহাসমালা আখ্যানের সংকলন; এই পুস্তকে ১৫০টি উপাখ্যান সংকলিত হয়েছে। ইতিহাসমালার আখ্যাপত্রটি এইরূপ—"ইতিহাসমালা or/ A COLLECTION/ OF/ STORIES/ IN/ THE BENGALEE LANGUAGE/ COLLECTED FROM VARIOUS SOURCES/ BY W. CAREY. D.D./TEACHER OF THE SUNGSKRIT, BENGALEE AND MAHRATTA LANGUAGES/ IN THE COLLEGE OF FORT WILLIAM/ SERAMPORE PRINTED AT THE MISSION PRESS /1812."[১]

কেরীর লিখিত বা সংকলিত সমস্ত পুস্তকেই ভূমিকা থাকে, কিন্তু এই গ্রন্থে কোন ভূমিকা নেই। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় গ্রন্থটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ছিল না। রেভারেণ্ড লঙ বাংলা গ্রন্থের যে তালিকা রচনা করেন, সেই তালিকায় এই গ্রন্থটি অন্তভূর্ক্ত হয়নি। এমনকি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকের তালিকার মধ্যেও এই পুস্তকটির নাম নেই। গ্রন্থটির অল্পকয়েকটি মাত্র প্রতিলিপি (copy) পাওয়া গেছে। কিন্তু গ্রন্থটির উল্লেখ বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

লেখক সমস্যা ঃ

উইলিয়ম কেরী কেন গ্রন্থটির ভূমিকা রচনা করেননি, কেন গ্রন্থটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তক রূপে গৃহীত হয়নি, প্রকৃত লেখক বা সংকলক কে বা কারা, কেরী স্বয়ং গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন কিনা, তিনি সম্পাদনা করেছিলেন অথবা সম্পাদকদের পরামর্শদাতা মাত্র, ইত্যাদি নানা ব্যাপারে সজনীকান্ত দাস, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কাহিনীর উৎস ঃ

১৮০১ সনে প্রকাশিত ম্যাথুর মঙ্গলসমাচার, "মঙ্গলসমাচার মাতিউ রচিত" এর তুলনায় ইতিহাসমালার ভাষা খুবই সাবলীল, অন্বয়ের আড়ষ্টতা প্রায় নেই, ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ঘেঁষা, গ্রন্থটি কেরীর সংকলিত অথবা তাঁর পরামর্শক্রমে রচিত যাই

হোকনা কেন[২] রচনাটিতে সংস্কৃতমনস্কতা খুবই প্রকট। কাহিনীগুলির অনেকগুলিরই উৎস পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বত্রিশসিংহাসন, বেতালপঞ্চবিংশতি, পুরুষপরীক্ষা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ। তবে কাহিনীগুলি সংক্ষিপ্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তিতও করা হয়েছে। যেমন পঞ্চতন্ত্রের সিংহ ও শশকের কাহিনীটি, আলোচ্য পুস্তকের ৮৪ সংখ্যক কাহিনীটিতে "কূপে ব্যাঘ্রের প্রতিবিম্ব" নামান্তর লাভ করেছে। প্রথম কাহিনীটি "রাক্ষসীর ধাঁধা, পণ্ডিতের সমাধান" নানা আকারে সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা' বা 'বত্রিশসিংহাসন' গ্রন্থে এই ধরণের পিশাচ, রাক্ষস বা রাক্ষসীর প্রদত্ত সমস্যা পূরণের বহু গল্প সংকলিত হয়েছে। মনে হয় এই ধরণের কাহিনী ভারতীয় কথাকোবিদদের খুবই প্রিয় বিষয় ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থে রাক্ষসীর প্রদত্ত সমস্যা ও কবি কালিদাসের সেই সমস্যাপূরণের কাহিনীটি খুব সুবিন্যস্তরূপে পরিবেষন করা হয়েছে।[৩] আচার্য সুকুমার সেন ইতিহাসমালা গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন।[৪] ফাদার দ্যতিয়েন কর্তৃক সম্পাদিত ও পুনঃ প্রকাশিত এই গ্রন্থটির লোককথার সম্পদ সুকুমার সেনকে গ্রন্থটি অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত করে।[৫] গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি কাহিনীগুলির উৎস নির্দ্দেশ করেছেন।[৬]

সংস্কৃতশ্লোক ঃ

ইতিহাসমালার বিভিন্ন আখ্যানে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, যেমন ১২ সংখ্যক গল্পে রাজকন্যা রাজপুত্রকে নিষেধ করেছেন তাঁকে স্পর্শ করতে, কারণ স্পর্শ করলে রাজপুত্রের মস্তক ছিন্ন হবে। রাজপুত্র নিষেধ অগ্রাহ্য করেন এবং শ্লোকের অর্ধাংশ উচ্চারণ করে রাজকুমারীকে স্পর্শ করা মাত্র রাজকুমারের মস্তক ছিন্ন হয়। কাহিনীটি অনুসরণ করে দেখা যায় মহাকবি কালিদাস শ্লোকের পাদপূরণ করার পর রাজকুমারের ছিন্নমস্তক জোড়া লাগে এবং রাজপুত্র প্রাণ পান। সমগ্র শ্লোকটি এই—

"যুস্মৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি শিরোমদীয়ং যদি যাতি যাতু।
লূনামি নূনং জনকাত্মজায়ৈ দশাননেনাপি দশাননানি।।"

শ্লোকটির অর্থ— "হে খঞ্জননয়নে তোমার কারণে আমার মস্তক যায় যদি যাক, জনকের আত্মজা সীতার জন্য দশানন রাবণ তাঁর দশটি মস্তকই কেটেছিল।"

১০৯ সংখ্যক কাহিনীতে রূপগোস্বামী সনাতন গোস্বামীর মোহভঙ্গ করার জন্য 'য রী র লা ই র ন য়" এই কয়টি অক্ষরের সংকেত প্রেরণ করেন। সেই অক্ষরগুলি অবলম্বন করে নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচিত হয়—

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং ন সদিদং জগদিত্যধারয়।।"

অর্থাৎ "যদুপতি যে কৃষ্ণ তাঁর মথুরাপুরী কোথায় গেল? রঘুপতিরামের উত্তরকোশল অযোধ্যা কোথায় গেল? এই বিবেচনা করে মনস্থির কর, জগৎ অনিত্য তা অবধারণ কর।"

আরও কতকগুলি সংস্কৃত সূক্তি বা প্রবচন উদ্ধৃত হয়েছে, যেমন—৮৭ সংখ্যক গল্পে "আহারোঽপি মনুষ্যাণাং জন্মনাসহজায়তে"; ৪৪ সংখ্যক গল্পে "ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্" এবং ১৪২ সংখ্যক গল্পে "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।" ৩৩ সংখ্যক গল্পের নামকরণই হয়েছে সংস্কৃতে "নরানাং মাতুলক্রমঃ"।

সংস্কৃত প্রবচন :

বহুসংখ্যক শ্লোক ও প্রবচনের অর্থও কাহিনীর মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে যেমন, ১৪ সংখ্যক গল্পে—"শঠেতে শঠতা করিবে—"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"; এই মন্তব্যটি ১১০ সংখ্যক কাহিনীতেও পাওয়া যায়।

"বিষবৃক্ষও যদি রোপণ করে তবে তাহার ছেদনে ব্যক্তি অসমর্থ হয়" উক্তিটি ৪৮ সংখ্যক কাহিনীতে স্থান পেয়েছে, উক্তিটির সংস্কৃত মূল বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্যস্বয়ং ছেতুমসাম্প্রতম্"।

"অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বঞ্চ ন মুঞ্চতি' প্রবাদ বাক্যটির অর্থ স্থান পেয়েছে ৯২ সংখ্যক গল্পে—"এক্ষণে সন্ন্যাসী হইয়াছি কিন্তু আমার স্বভাব যায় না যেমন অঙ্গার সাতবার ধৌত করিলেও তাহার কালিমা কখনও যায় না।" কাহিনীতে 'শতধৌতেন' 'সাতবার ধৌত করিলেও'তে পর্যবসিত হয়েছে।

৯৮ সংখ্যক কাহিনীর 'বুদ্ধি যাহার বল তাহার' ইত্যাদি নীতিবাক্যটি "বুদ্ধি র্যস্য বলং তস্য' ইত্যাদি শ্লোকাংশের অনুবাদ। মহাকবি ভারবির "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্" ইত্যাদি শ্লোকার্ধের তাৎপর্য এই গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন ৫৬ সংখ্যক আখ্যানে—"সে শ্লোকার্ধ এই যে, কোন কর্ম বিবেচনা না করিয়া অকস্মাৎ করিবেনা। যদ্যপি হঠাৎ কোন কর্ম কর, তবে সে বিপদ্যুক্ত হয়।"

৬২ সংখ্যক কাহিনীটিতে সম্পূর্ণ শ্লোকটিরই অনুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে—"এক মন্ত্রী তাঁহাকে কহিল হে মহারাজ বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম করা উপযুক্ত নয়। অবিবেচনা বিপত্তিকারণ—ইহা বিবেচনা করিয়া যিনি কর্ম করেন, তাঁহার নিকট সম্পত্তি স্বয়ং আগমন করেন, যেহেতু সম্পত্তি গুণানুবন্ধা হইয়াছেন।" আবার ১২৯ সংখ্যক আখ্যানে শ্লোকের বিনিময়ে ধনার্জনের চেষ্টা করা হয়েছে—"সে লিপি এই, সহসা কোন কর্ম করা উপযুক্ত নয়। সহসা কর্ম করিলে দায়গ্রস্ত হইতে হয় ও পরামর্শ করিয়া যে কার্য করে, তাহা ত্বরায়

সিদ্ধ হয়।”

এছাড়া বহুকাহিনীতে বিদ্যার প্রশস্তি করা হয়েছে এবং সেই উক্তিগুলি প্রায়ই চাণক্য-নীতি-শাস্ত্রের বিদ্যার প্রশস্তির অনুরূপ।[৭]

অলঙ্কারশাস্ত্রের শ্লোক ঃ

ইতিহাসমালায় সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে আলোচিত—

“ভ্রম ধার্ম্মিকঃ বিশ্বস্তঃ স শ্বা অদ্য মারিতস্তেন।
গোদাবরীকচ্ছকুঞ্জবাসিনা দৃপ্তসিংহেন”।।

ইত্যাদি শ্লোকটিকে অবলম্বন করে একটি কাহিনী রচিত হয়েছে—[৮] ‘লাবণ্যবতীর উদ্যানে ব্রাহ্মণের পুষ্পচয়ন’ (নং ৩৯)। যদিও শ্লোকটি যে প্রসঙ্গে অলঙ্কার-শাস্ত্রে উদ্ধৃত হয়ে থাকে, কাহিনীকার সেই প্রসঙ্গের পরিবর্তন করে একটি নতুন গল্প রচনা করেছেন, কিন্তু শ্লোকটির মূলানুগ অনুবাদ কাহিনীতে সংযুক্ত হয়েছে—‘হে ধার্মিক, স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ কর। সে কুকুর মরিয়াছে। গোলা নদীর নিকটে বনে এক বলবান সিংহ আছে, সেই সিংহ আসিয়া কুকুরকে মারিল।’ বলাবাহুল্য শ্লোকের এই অনুবাদ লাবণ্যবতীর গল্পটির সঙ্গে সুন্দরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, একটুও অপ্রাসঙ্গিক হয়নি।

বর্ণনা ঃ

ইতিহাস মালার আখ্যানগুলি যদিও সংক্ষিপ্ত তবু কোন কোন কাহিনীতে সংক্ষিপ্ততার অবসরেই বর্ণনার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন উল্লিখিত লাবণ্যবতীর কাহিনীতেই পুষ্পোদ্যানের বর্ণনা—“সেই লাবণ্যবতী আত্মগৃহ সমীপে এক পুষ্পোদ্যান করিয়াছিল, তাহাতে চম্পক-কুরুবক-কদম্ব-কেতক-অশোক-মালতী-জাতী-যুথী-সেবতী-করবীর-নাগকেশর-বকুল-তমালাদি নানাপুষ্প প্রকাশিত হইয়া সকলদিক আমোদিত করে ও ভ্রমরেরদের গুনগুন শব্দেতে কোকিলের কুহুকুহু রবেতে লোকেরদের অত্যন্ত মনোরঞ্জন হয়।”[৯] বলা বাহুল্য এ বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ণনার অনুরূপ এবং এই ভাষা সংস্কৃত ভাষার মতোই সমাস বহুল। ‘রাক্ষসের উদরে রাজা’ কাহিনীতেও (৬৩) রাজার রাজোচিত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে—“ধনমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য বদান্য দীনশরণ্য প্রজাপালনতৎপর করুণাসাগর বীরসিংহ নাম রাজা নদীতীরে দামিনীবাস নগরে বসতি করিতেন। একদিন রাজা প্রভাত সময়ে অত্যুন্নত মাতঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া কোটি কোটি গজ-বাজি-রথ-রথী-অতিরথী-অধরথী ইত্যাদি নানাপ্রকার সৈন্যেতে পরিবৃত হইয়া মৃগয়াতে গমন করিয়া কতি কতি নদ-নদী-নগর-গিরি-গহণ ভ্রমণ করিয়া নিজরাজ্য হইতে অন্য রাজার রাজ্যেতে উপস্থিত হইলেন।” এখানে একাধিক বিশেষণ ব্যবহারে রাজার গুণাবলী

সুস্পষ্ট হয়েছে; অসমপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ বর্ণনায় গতি এনেছে এবং সমাসবদ্ধপদ বর্ণনার ভাষারীতিকে দৃঢ়বদ্ধ করেছে। এসবই সংস্কৃতভাষা ও শৈলীর অনুসরণ। ইতিহাসমালার বিভিন্ন কাহিনীতে এই ধরণের সমাসবহুল রচনারীতি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

বিশেষণের লিঙ্গান্তর ঃ

কাহিনীগুলির অনেকক্ষেত্রেই স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যপদের বিশেষণটিও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন 'উর্বরাভূমি', 'মর্মপীড়া অসহ্যা', 'স্ত্রী অন্ধা', 'দয়া উপস্থিতা', 'বাটী উত্তমা', 'সম্পত্তি গুণানুবন্ধা' ''ক্ষমতা বহুকালস্থায়িনী' এবং 'সর্বজন মনোহারিণী' ইত্যাদি। স্পষ্টতই ব্যবহারগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মকে অনুসরণ করেছে—বিশেষ্য যে লিঙ্গ যে বিভক্তি ও যে বচনে প্রযুক্ত হবে বিশেষণও সেই লিঙ্গ, সেই বিভক্তি ও সেই বচন গ্রহণ করবে।

কিন্তু কেবলমাত্র তৎসমশব্দের ক্ষেত্রে নয় অন্যত্রও কোন কোন ক্ষেত্রে এই রীতিটির প্রয়োগ ঘাটছে, যেমন—''হে স্ত্রীলোক, তুমি নির্বোধা';অথবা তাহাকে 'চিরাকানী পরাইয়া'। এখানে ছিন্নবস্ত্র অর্থে 'চিরাকানী' পদ ব্যবহৃত হয়েছে। 'কানি' শব্দটি দেশজ, তৎসম বিশেষণটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে;যদিও দুটি শব্দই সমার্থক। বাংলা বানানের বিশৃঙ্খল অবস্থা যে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দেও সম্পূর্ণ সুস্থিত হয়নি 'চিরাকনি' পদের পরিবর্তে 'চিরাকানী' পদের ব্যবহারই তার প্রমাণ।

অপ্রচলিত শব্দ

ইতিহাসমালার এমন বহুশব্দ লক্ষ্য করা যায় যেগুলি বাংলাভাষায় অপ্রচলিত— 'ব্যালগ্রাহি', 'নিশীশ্বর', 'ধূরীণ', 'স্বতাসম্পদীভূত', 'রাত্রিঞ্চর', 'দণ্ড', 'অপ্রহিতোজ্জত্ব' ইত্যাদি। শব্দগুলি এখানে ইতস্তভাবে গৃহীত হয়েছে মাত্র, তন্নিষ্ঠ অন্বেষণ এইরকম বহুশব্দের তালিকা রচনা করতে সাহায্য করবে।

সন্ধি ঃ

বাংলাভাষায় সাধাণত অপ্রচলিত কিছু সন্ধিও অপ্রচলিত শব্দ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, যেমন—'অস্থ্যবশিষ্ট' (অস্থি + অবশিষ্ট), বহূপকারী (বহু + উপকারী), 'সল্লোক' (সৎ + লোক), 'নদ্যুত্তীর্ণ' (নদী + উত্তীর্ণ);'সুখ্যাত্যাপন্ন' (সুখ্যাতি + আপন্ন) ইত্যাদি। বস্তুত বাংলাভাষায় এইসব পদ সন্ধি বিযুক্ত অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয়; সন্ধি করায় পদগুলি শ্রুতিমাধুর্যের অন্তরায় হয়েছে।

মূলশব্দ ঃ

কিছু কিছু পদ সংস্কৃত প্রয়োগকে যথাযথ অনুসরণ করেছে, যেমন—‘পঞ্চত্বপ্রাপ্ত’, ‘ভক্তিবশাৎ’ ইত্যাদি। কোন কোন সমাসবদ্ধপদ সাদৃশ্যগুণকে প্রকাশ করেছে, যেমন—‘কালান্তকসমোপম’; বলাবাহুল্য শব্দটি সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতানুসারী।

ইতিহাসমালার যর্থাথ লেখক কে, এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা না হলেও একথা বলা যায় যে উইলিয়ম কেরীর নামে প্রচলিত এই পুস্তকটিতে সংস্কৃতের অনুসরণ অত্যন্ত প্রকট। গ্রন্থটির ভাষায় অন্বয়ের আড়ষ্টতা যেমন প্রায় অনুপস্থিত, ভাষার সাবলীলতা যেমন স্বপ্রকাশ, তেমনি সংস্কৃতের অতি অনুসরণও অতিমাত্রায় প্রকট; উপরের উদাহরণগুলিতেই তা প্রকাশিত হয়েছে। উইলিয়ম কেরী যদি গ্রন্থটির পরিকল্পনায় কেবলমাত্র পরামর্শদাতাই হয়ে থাকেন, তাহলেও তাঁর সংস্কৃতমনস্কতা, সজনীকান্ত দাস যাকে ‘সংস্কৃতায়ণ’ বলেছেন তা এই পুস্তকে স্বতঃপ্রকাশ, পরবর্তী বাংলা-ইংরেজি অভিধানে যা পরিপূর্ণরূপ লাভ করেছে।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। ইতিহাসমালা গ্রন্থটি ফাদার দ্যতিয়েনের সম্পাদনায় দীর্ঘকাল পরে পুনঃপ্রকাশিত হয়। প্রকাশনার স্থান কলকাতা; তারিখ উল্লিখিত হয়নি।

২। ফাদার দ্যতিয়েন অনুমান করেছেন ইতিহাসমালা গ্রন্থটি ‘কেরীসাহেবের মুন্সী’ রামরাম বসুর সামগ্রিক সহায়তায় কেরী রচনা করেছিলেন অথবা গ্রন্থের লেখক রামরাম বসু স্বয়ং (ভূমিকা-পৃ-৩১)। কিন্তু ইতিহাসমালার কাহিনীগুলিতে নানা লেখকের রচনার ছাপ খুবই স্পষ্ট। কয়েকটি কাহিনীর রচনারীতির সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনারীতির সাদৃশ্য খুবই প্রকট।

৩। ইতিহাসমালার প্রথম আখ্যানটি একটু ভিন্ন ও বিস্তৃতরূপে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকায় পাওয়া যায়।
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৭।

৪। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ—W. Carey/Itihasmala/A Collection of Bengali Tales and Fables/Translated by/Sukumar Sen/With Introduction, Appendix and notes.

৫। Sen Sukumer. প্রাগুক্ত Introduction, p. 3.

৬। তদেব, pp 3-4

৭। চাণক্যনীতি শাস্ত্রের প্রথম পাঁচটি ও ৭৩ সংখ্যক শ্লোকে বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রশংসা করা হয়েছে। সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পাদক)ঃ চাণক্য-নীতি-শাস্ত্রম্ কলকাতা ১৯৯০।

৮। মূল শ্লোকটি প্রাকৃত ভাষায় রচিত—
“ভম ধম্মিঅ বীসথো সো সুণহো অজ্জ মারিঅ দেণ।
গোলাবরীকচ্ছকুঞ্জবাসিনা দরীঅ সিহেন।।”

"হে ধার্মিক নিশ্চিন্তে ভ্রমণ কর (অর্থাৎ নিশ্চিন্তে ভ্রমণ কর না), কারণ যে কুকুরকে তুমি ভয় পেতে তাকে দৃপ্ত সিংহ মেরে ফেলেছে।"

বিধিমুখে নিষেধের ব্যঞ্জনারূপে শ্লোকটি অলঙ্কারশাস্ত্রে উদ্ধৃত হয়। সাহিত্যদর্পণকারের মতে এখানে বিপরীত লক্ষণা হয়নি।

হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, (সম্পাদক), সাহিত্যদর্পণ (৫ম সংস্করণ) কলকাতা ১৯৮১, পৃ-২২৬। শ্লোকটি ধ্বন্যালোক গ্রন্থেও উদ্ধৃত হয়েছে।

৯। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অনূদিত দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা বা বত্রিশসিংহাসন পুস্তকে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। "সেই কৃষক সস্যক্ষেত্রে চতুর্দিগে পরিখা করিয়া শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যুতী জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষরোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন।"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, প্রাগুক্ত, পৃ-২।

(ঙ) বাংলা-ইংরেজি অভিধান

কেরীর পূর্ববর্তী অভিধানকার ঃ

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধানের প্রথমখণ্ডের প্রথম সংস্করণ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার অনেক আগে মনোএল-দা-আপ্‌সুম্পসাঁও এর শব্দকোষ সংকলিত হয়।[১] মনোএল বাংলা-পোর্তুগীজ ও পোর্তুগীজ-বাংলা দুই অংশে শব্দ সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৭৪৩ সনে লিসবনে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি রোমান হরফে রচিত। মনে হয় মনোএল নিজের ও সহকর্মী অন্যান্য পোর্তুগীজ যাজকদের ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্যই এই শব্দকোষ সংকলন করেন।

বিদেশী অভিধানকারদের অন্যতম ওগুস্ত্যাঁ ওঁসার পরিচয় কেবলমাত্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকেই পাওয়া যায়।[২] সজনীকান্ত দাস আপজনের 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি'র উল্লেখ করেছেন, গ্রন্থটি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৩]

কেরীর পূর্ববর্তী সর্বাধিক খ্যাতিমান অভিধানকার এইচ. পি. ফর্স্টার। তাঁর শব্দকোষ ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় ফর্স্টার তাঁর গ্রন্থের দুটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করেছেন শব্দসংকলন ও ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা।[৪] কেরী ফর্স্টারের অভিধানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[৫]

কেরীর অভিধান

কেরীই প্রথম বাংলাভাষায় পাশ্চাত্য ধরণের সম্পূর্ণ নিঁখুত অভিধান সংকলন করেন। ভারতীয় কোষগ্রন্থগুলির বিন্যাস সাধারণত বিষয়ভিত্তিক আর পাশ্চাত্য সংকলকদের অভিধান বর্ণানুক্রমিক। কেরীর পূর্ববতী সকল বিদেশীকোষকারই দ্বিভাষিক কোষ রচনা করেছিলেন। তাঁদের প্রয়োজন ছিল তাৎক্ষণিক, ইংরেজ কর্মচারিদের সহজে স্বল্প সময়ে বাংলা শব্দরাজির সঙ্গে পরিচিত করা।[৬] কিন্তু দ্বিভাষিক শব্দসংকলন কেরীর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর নিজের প্রয়োজন ছিল বাংলাভাষার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া, যা ছিল ধর্মপ্রচারের কাজে একান্ত আবশ্যক। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলাভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার পর ছাত্রদের প্রয়োজনে এই অভিধান সংকলন আরও জরুরী হয়ে উঠে।

উত্তরবঙ্গে অবস্থানকালেই তিনি এই শব্দসংকলনের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৭৯৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর কেরী লিখেছিলেন—"I have also begun to write a dictionary of the language, but it will be a work of time."

অবশ্য সজনীকান্তদাস বলেছেন কেরী ১৭৯৪ সনে দেবহাটায় অবস্থানকালেই নিজের প্রয়োজনে একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ প্রস্তুত করেছিলেন।[৭]

১৮১১ সনের ১০ই ডিসেম্বর রাইল্যাণ্ডকে লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় যে কেরীর অভিধানের কিছু অংশ মুদ্রিত হয়েছে—"I am now printing a dictionary of the Bengalee, which will be pretty large." অবশ্য ১৭৯৭ সনেই তিনি রাইল্যাণ্ডকে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছেন যে তিনি ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত এই তিন ভাষায় একটি অভিধান সংকলন করছেন, কিন্তু এই ত্রিভাষিক অভিধান সংকলনের পরিকল্পনা বোধ হয় কার্যকর হয়নি।[৮]

অভিধানের প্রথম সংস্করণ ঃ

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধানের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয়। অনুমান করা যায় এই অভিধানে কেবল বাংলা বর্ণমালার প্রথম বর্ণ অকারাদ্য শব্দগুলিই স্থান পেয়েছিল, কারণ পূর্বোক্ত পত্রেই কেরী রাইল্যাণ্ডকে লিখেছেন—".......a dictionary which will be pretty large, for I have got to page 256 quarto, and am not near through the first letter." সংকলনটির বৃহদাকার সম্বন্ধে কেরীপুত্র ফেলিক্সও মন্তব্য করেছিলেন। কেরীর মৃত্যুর পর এশিয়াটিক জার্নালে ফেলিক্সের এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত হয়েছিল—"......that the first letter of the alphabet, forming the Sanskrit and Greek privative prefix had been injudiciously multiplied by examples."[৯] গ্রন্থটির বিশালাকার ধারণ করার অন্যতম কারণ ছিল বড় হরফে ছাপা। মনে হয় গ্রন্থটির মুদ্রণ সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল, পরে ছোট অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হয় এবং ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয়। অভিধানটির দুটি খণ্ড—প্রথম খণ্ডে সমস্ত স্বরবর্ণাদ্য শব্দ ও দ্বিতীয়খণ্ডে ব্যঞ্জনবর্ণাদ্য শব্দ সংকলিত হয়েছিল। দুটি খণ্ডে অভিধানটির শব্দসংখ্যা ছিল পঁচাশিহাজার। দ্বিতীয়খণ্ড ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

কেরীর অভিধানের বৈশিষ্ট্য ঃ

বস্তুতঃপক্ষে কেরীই বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ অভিধানকার। তাঁর অভিধানে কেবলমাত্র বাংলাশব্দ ও তার ইংরেজি অর্থই সংকলিত হয়নি, শব্দের ব্যুৎপত্তির বিষয়টিও উপস্থাপিত হয়েছিল। শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ণয়, শব্দের বিভিন্ন অর্থ, কোন কোন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রয়োগও তাঁর অভিধানে স্থান পেয়েছিল। শব্দের উচ্চারণও কেরী

অনেকসময় ইংরেজি উচ্চারণ সহকারে নির্দেশ করেছেন, কেননা অভিধান সংকলনের পাশ্চাত্যরীতি অনুসারে শব্দের উচ্চারণ নির্ণয় একান্ত প্রয়োজন এবং যে ছাত্রদের জন্য কেরী এই অভিধান সংকলন করেছিলেন তাদের পক্ষে এটি অত্যন্ত উপযোগী ছিল।

কেরীর এই বাংলা-ইংরেজি অভিধানের ভূমিকাটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন উত্তভারতের প্রায় কুড়িটি ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। দক্ষিণভারতের ভাষাগুলির উৎস সংস্কৃত নয়, তথাপি তামিল প্রভৃতি দক্ষিণভারতীয় ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বহুল অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বাংলাভাষা সম্বন্ধে কেরী বলেছেন বাংলাভাষার শব্দসম্ভারের তিনচতুর্থাংশই সংস্কৃতভাষা থেকে গৃহীত; অবশিষ্ট শব্দগুলির মূলও কোনও না কোনও প্রকারে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ বাংলাভাষার তিনচতুর্থাংশ শব্দ তৎসম, অবশিষ্ট তদ্ভব। অবশ্য আরবি, ফারসি ও পোর্তুগীজ ইত্যাদি বিদেশী শব্দ যে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে কেরী সে কথা স্বীকার করেন।

এই গ্রন্থেই কেরী আবার বলেছেন বাংলাভাষার দশভাগের নয়ভাগ শব্দই সংস্কৃত।[১০] কিন্তু কেবলমাত্র শব্দ সম্ভার নয়, অন্যদিক থেকেও কেরীর সংস্কৃতপ্রবণতা বাংলাভাষার এই অভিধানে প্রকাশিত হয়েছে।

এই অভিধানে কেরী বাংলা উচ্চারণের ত্রুটীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলাভাষায় বর্গীয় 'ব' এবং অন্ত্যস্থ 'ব'-এর উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই। কেরী তাঁর অভিধানে আদ্য বকার যুক্ত শব্দগুলি এবং অন্ত্যস্থ বকারাদ্য শব্দগুলি একই সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করেছেন। কিন্তু উচ্চারণের এই বিচ্যুতি তিনি কখনই সমর্থন করেননি।[১১] তাঁর সংস্কৃত ঘনিষ্ঠতাই এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

স্বভাবতই সংকলনের প্রথমেই 'অ' এই আদ্যক্ষর স্থান পেয়েছে। 'অ'-এর পরবর্তী শব্দ 'অংশ'। 'অংশ' শব্দযোগে সমাসবদ্ধ 'অংশকরণ', 'অংশকর্তা' ইত্যাদি ঊনপঞ্চাশটি শব্দ সংকলিত হয়েছে। অকার আদ্যক্ষরযুক্ত শব্দের জন্য কেরী অভিধানের ২৩৩টি পাতা ব্যয় করেছেন।

এই অভিধানে সংস্কৃতনিষ্ঠ কেরী 'ঋকারাদি', 'ঋকারান্ত', '৯কার', '৯কারাদি', '৯ কারান্ত' প্রভৃতি শব্দকে স্থান দিয়েছেন।[১২] বাংলাভাষায় ঋকার, ৯কার এবং ৡ কারের ব্যবহার নেই। প্রাচীন বাংলা অভিধানগুলি ঋকার, ৯কার এবং ৡ কারের বর্ণপরিচয়, উচ্চারণস্থান, এবং বর্ণগুলির অর্থ নির্দেশ করেছেন।[১৩] আধুনিক বাংলা অভিধানে ৯কারের উল্লেখ মাত্র আছে[১৩]—"ঋ,৯ যথাক্রমে অষ্টম ও নবম স্বরবর্ণ। এই বর্ণদ্বয়ের ব্যবহার বাংলাভাষায় নাই।"[১৪] এখানে ৡ কারের উল্লেখ মাত্র করা হয়নি। পানিণীয় ব্যাকরণ অবশ্য ৯কারের দীর্ঘত্ব স্বীকার করে না।[১৫]

কেরী বাংলাভাষাকে শব্দসম্পদপূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর মতে সমাসবদ্ধ শব্দের সামর্থই বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। সুতরাং বাংলা-ইংরেজি

অভিধানে কেরী প্রচুর পরিমাণে সমাসবদ্ধ পদ সংযোজিত করেছেন। 'অতি' এই উপসর্গের সঙ্গে সংযুক্ত পদ স্থান পেয়েছে প্রায় আঠারো পৃষ্ঠা ব্যাপী, মাঝে দুটি পৃষ্ঠায় অবশ্য 'অতিথি' ও 'অতিথি' শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ পদ স্থান পেয়েছে।

'প্রতি' এই উপসর্গযুক্ত সমাসনিষ্পন্ন পদ অভিধানের দশটি পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। প্রতিটি পৃষ্ঠায় দুটি স্তম্ভ আছে এবং প্রতিটি স্তম্ভে গড়ে আঠারোটি শব্দ স্থান পেয়েছে। কেরী দেখিয়েছেন 'প্রতি' উপসর্গটি যদিও অব্যয়পদ, তথাপি কখনও কখনও ক্রিয়াবিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়। কেরী 'প্রতি' উপসর্গের ল্যাটিন প্রতিশব্দটিও অভিধানে সংযোজিত করেছেন।[১৬]

কেরীর অভিধানে সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দই বিশেষভাবে সংকলিত হয়েছে, 'প্রতি' এই উপসর্গযুক্ত পদও তার ব্যতিক্রম নয়। 'প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত', 'প্রতিদাপন', 'প্রতিদাপনীয়' ইত্যাদি শব্দ বাংলাভাষায় ব্যবহৃত হয় না। 'প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত' শব্দটির অর্থ কেরী নির্ণয় করেছেন এইভাবে—"প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত (from প্রতিতন্ত্র acknowledged by one, and সিদ্ধান্ত a conclusion) a conclusion adopted by one of two disputants, a sentiment maintained by one of the disputants in an argument." কেরী এখানে সমাসবদ্ধ শব্দটির অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

আবার 'এতৎ' এই সংস্কৃত সর্বনাম শব্দের সঙ্গে যুক্ত বহু সমাসবদ্ধ শব্দ সংকলিত হয়েছে; অভিধানের ৪১৪ পৃষ্ঠা থেকে ৪৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, এক্ষেত্রেও দুটি স্তম্ভে গড়ে আঠারোটি শব্দ আছে। অধিকাংশ সমাসবদ্ধশব্দই তিনটি শব্দের সহযোগে গঠিত, যেমন- 'এতৎক্লেশবৃদ্ধি', 'এতৎপরাজয়ব্যাঘাতক', ইত্যাদি। কখনও কখনও চারিটি শব্দের সংযোগে সমস্তপদ গঠিত হয়েছে—'এতৎক্লেশবৃদ্ধিজনিত', 'এতৎক্লেশবৃদ্ধিধ্বংসী' ইত্যাদি। 'এতৎ' শব্দের সঙ্গে সন্ধি হওয়ায় 'এতদ্' যুক্ত শব্দের সংখ্যাও কম নয়। একটি শব্দ আছে—'এতদ্রোষহেতুক'। কেরী অর্থ করেছেন—"(from এতদ্রোষ this anger and হেতু a cause) caused by or arising from this anger."

সাধারণত 'এতৎ' এই শব্দের পর কথন কীর্তি, ইত্যাদি শব্দের সমাস হয়েছে। পরে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শব্দগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমস্তপদ গঠিত হয়েছে, যেমন—'জনিত', 'জন্য', 'জাত', 'নিমিত্তক', 'নিমিত্তে', 'প্রযুক্ত', 'বিনা', 'ব্যতিরিক্ত', 'ব্যতিরেক', 'ব্যতিরেকে', 'হেতুক', 'আকাঙক্ষা', 'আকাঙক্ষী', 'অভিলাষ', 'অভিলাষী', 'ধ্বংস', 'ধ্বংসক', 'ধ্বংসী' 'নাশ', 'নাশক', 'নিবর্ত্তক', 'নিবৃত্তি', ইত্যাদি। এই বিপুল পরিমাণ সমাসবদ্ধ পদসংকলনের কারণ কেরী ছাত্রদের সহায়তার জন্য প্রচুর দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। এবিষয়ে ফেলিক্স কেরী যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন—"The doctor, however, acted from the best motive on an anxiety to

supply his pupils with a ready resolution of primary difficulties."[১৭]

'এতচ্ছাস্ত্রোল্লঙ্ঘন', 'এতদ্বিরোধান্বেষক', 'এতৎপ্রতিজ্ঞাভঞ্জক', বা 'এতৎপরাজয়ব্যাঘাতক' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ বাংলাভাষায় দৃষ্ট হয় না।

এই সব সমাসবদ্ধ শব্দ অনেকক্ষেত্রেই শ্রবণসুখকর নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্ণপীড়াদায়কও, যেমন 'এতৎকর্ম্মোদ্রেক' অথবা 'এতৎকৃপেচ্ছুক' বা 'এতত্তত্ত্ব' অথবা 'এতচ্ছিশুধ্বংসক'। সমাসবদ্ধ পদরচনায় সন্ধি একটি একান্ত কর্তব্য প্রক্রিয়া এবং উল্লিখিত শব্দগুলিতে কর্ম্ম+উদ্রেক;কৃপা + ইচ্ছুক, এতৎ + তত্ত্ব, এতৎ + শিশু + ধ্বংসক ইত্যাদি সন্ধি প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত 'কর্ম্মোদ্রেক', 'কৃপেচ্ছুক', 'এতত্তত্ত্ব', 'এতচ্ছিশুধ্বংসক' প্রভৃতি শব্দে মাধুর্যের হানি ঘটেছে।

কেবলমাত্র ছাত্রদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য নয়, সংস্কৃতমনস্কতার অতিরেক এইসব শব্দ সৃজনে কেরীকে প্ররোচিত করেছে। এই সব শব্দ কেরী কেবলমাত্র সংকলন করেননি, গঠনও করেছেন; জনিত, জন্য, জাত, নিমিত্তক ইত্যাদি শব্দান্তযুক্ত বিপুল শব্দরাজিই তার প্রমাণ।

জোড়কলম শব্দঃ

কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃতঘনিষ্ঠ অত্যুৎসাহী কেরী দেশজ শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গের জোড়কলম শব্দ সংযোজন করেছেন, যেমন—'অতিবাগড়া' (from অতি prep, and বাগড়া an obstruction), a great impediment, a great hinderence" (p. 39). এখানে 'বাগড়া' এই দেশজ শব্দের সঙ্গে 'অতি' এই সংস্কৃত উপসর্গ যোগে 'অতিবাগড়া' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এইরকম আরও জোড়কলম শব্দ 'দোকর' (from দুই two, and কৃ to do) repeated; 'কাঁটাবিশিষ্ট', 'কাঁটাময়', 'কাঁটারহিত' (p. 27), খড়িটীকরণ (p. 111), 'গলাধরণ' (p. 150) প্রভৃতি।

বানান ও উচ্চারণের শুদ্ধতা ঃ

বানানের বিশুদ্ধি রক্ষা অভিধানকারের অন্যতম দায়িত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল[১৮] কেরী তাঁর অভিধানে সেই অরাজকতা থেকে বাংলা বানানকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অভিধানে তৎসম শব্দের সংকলনকে প্রাধান্য দিয়ে বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। এমনকি তদ্ভব শব্দের বানানকেও তিনি যথা সম্ভব মূল তৎসম বানানের অনুসারী রাখার চেষ্টা করেছেন।[১৯] বাংলা শব্দের উচ্চারণ অনেকক্ষেত্রেই সংস্কৃত উচ্চারণকে অনুসরণ করে না। সংস্কৃতভাষার প্রতি উইলিয়ম কেরীর গভীর আকর্ষণের ফলে তিনি বাংলা অভিধানেও সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষার প্রতি সজাগ ছিলেন। বাংলা উচ্চারণরীতি অনুসরণ

করে কেরী বাংলা অভিধানে আদ্য বর্গীয় বযুক্ত এবং আদি অন্তস্থ বযুক্ত শব্দকে একই 'ব' শিরোনামে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সংস্কৃতনিষ্ঠমন এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করেনি। তাই তিনি অন্তস্থ বকার ও বর্গীয় বকারের পার্থক্য সুনির্দ্দিষ্ট করার জন্য অন্তস্থ ব-এর মধ্য স্থলে একটি বিন্দুর অবস্থান ঘটিয়েছেন।[২০]

ধাতু ও ক্রিয়া ঃ

কেরীর সংস্কৃতপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, যে সমস্ত ক্রিয়াকে তিনি সংস্কৃতের বিকৃতি মনে করেছেন সেই সব ক্রিয়ার ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রেও সংস্কৃত ধাতুর সাদৃশ্যটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন।[২১]

আর সংস্কৃতপ্রীতির এই মানসিকতা থেকেই বাংলা অভিধানে তিনি সংস্কৃতধাতুর একটি বিশাল তালিকা সংযুক্ত করেছেন এবং যে ধাতুগুলি বাংলাভাষায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে তারকা চিহ্নিত করেছেন—"A list of the dhatoos or Sungskrita roots is prefixed to the volume, and those which are used as the foundation of words in the Bengalee Language are distinguished by an asterick"[২২] এই ধাতুর তালিকা এগার পৃষ্ঠা থেকে পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার অর্ধাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিটি পৃষ্ঠা দুটি স্তম্ভে বিভক্ত এবং প্রতিটি স্তম্ভে গড়ে পঁচিশটি ধাতু স্থান পেয়েছে। যদিও পুস্তকটি বাংলা-ইংরেজি অভিধান, তবু ধাতুর অর্থ সংস্কৃত শব্দেই নির্দেশ করা হয়েছে, যেমন—"√সে-ক্ষিত্যাং", "√বেক্-শঙ্কায়াং" ইত্যাদি। কেরী লিখেছেন—"The total number of dhatoos is one thousand seven hundred and fiftyfour."[২৩] এই দীর্ঘতালিকা সংযোগের স্বপক্ষে তিনি কিছু যুক্তিও উপস্থাপিত করেছেন, যেহেতু বাংলাভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত তাই তিনি সংস্কৃত ধাতুর একটি সম্পূর্ণ তালিকা এই গ্রন্থে সন্নিবেশ কর্তব্য মনে করেছেন—"Almost nine-tenth of the words in the Bengalee language are pure Sungskrita, or such as are evidently derived from that source, and as that language is almost entirely derived from certain radicals called dhatoos, it has been thought proper to begin this work with a complete list of dhatoo."[২৪]

একান্তভাবে সংস্কৃতপ্রীতির দ্বারা পরিচালিত না হলে কেরী কখনই বাংলা অভিধানে এই বিপুলসংখ্যক ধাতুর একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট করতেন না। বিশেষত যে ধাতুগুলি বাংলাভাষায় বহুল ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে তো তিনি তারকা চিহ্নিত করেছেনই, কেবলমাত্র সেই ধাতুগুলির একটি তালিকা বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ ছিল।

শুধু ধাতু নয়, ধাতুর 'অনুবন্ধে'রও একটি তালিকার সমাবেশ আলোচ্য অভিধানে ঘটেছে। 'অনুবন্ধ' সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক নাম। অনুবন্ধ শব্দটির ব্যাখ্যা

প্রসঙ্গে কেরী বলেছেন—সংস্কৃত ধাতুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অক্ষর ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়, এইগুলিই অনুবন্ধ। গণপাঠে এই অনুবন্ধগুলি ধাতুর সঙ্গে সন্ধির দ্বারা সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। অভিধানে কেরী অনুবন্ধগুলিকে ধাতুর থেকে পৃথকভাবে দেখিয়েছেন—ধাতু ও অনুবন্ধের মধ্যে একটি ড্যাশের(—)ব্যবধান আছে—".....and each unoobundha is expressed in its proper character, separated from the dhatoo by a dash".[২৫] এই অনুবন্ধগুলির প্রয়োগ কেরী ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপন করেছেন—"আ-Dhatoos with this Unoobundha admit the optional insertion of ইন্ before the affixes ক্ত and ক্তবতু or their substitutes viz, before affixes of the passive and first indefinite participle" কেরীর অভিধানে অনুবন্ধের তালিকাটি একটি সারণীর আকারে প্রদর্শিত হয়েছে—

Root	Unoobundha	Meaning
অভি	ত,ক	পদে লক্ষণি this word is used in the sense of paging, marking.
অর্থ	ত,ক,উ	যাচনে, asking.
অন্ধ	ত,ক	দৃকক্ষয়ে, losing sight

এইভাবে কেরী অনুবন্ধের দীর্ঘতালিকা দিয়েছেন। আর বাংলা শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ বা শব্দ সমষ্টির সাহায্যে ধাতু ও অনুবন্ধের ব্যাখ্যা করেছেন। সংস্কৃতমনস্কতার অতিরেকের ফলে তিনি বিবেচনা করেননি যে বাংলা-ইংরেজি অভিধানে এই তালিকা ও সারণী বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে না।

বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক অভিধান রচনায় পাশ্চাত্যরীতি অবলম্বন করায় কেরী যেমন পথিকৃৎ,[২৬] তাঁর সংস্কৃতনিষ্ঠ মনটিও তেমনই এই গ্রন্থে বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়েছে। আলোচ্য অভিধান সম্পর্কে অধ্যাপক উইলসন মন্তব্য করেছেন—".......must have added materially to the trouble of compiler, at the sametime it evinces a careful research, his conscientious exactitude and his unwearied industry."[২৭]

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। মনোএল-দা-আসসুম্পসাঁও-এর পুস্তকটির নাম Vocabulario em Idioma Bengalla Portugez. মনোএল সম্পর্কে পূর্ববর্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

২। শক্তিব্রত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৯।

৩। সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০।

৪। শক্তিব্রত ঘোষ এই সম্বন্ধে তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পৃ-১৯৪।
এই প্রসঙ্গে H.P. Forster এর পুস্তকের (A Vocabulary in two parts English and Bengali and vice-versa. Calcutta. 1799) ভূমিকাও দ্রষ্টব্য।

৫। ফর্স্টারের পুস্তকে প্রদত্ত গ্রাহকদের তালিকায় কোলব্রুক, গিলখ্রিস্ট প্রভৃতির সঙ্গে উইলিয়ম কেরীর নামও পাওয়া যায়।

৬। অবশ্য আপজন লিখেছেন তাঁর গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য বাঙালিদের ইংরেজিভাষায় শিক্ষিত করা। আখ্যাপত্রেই আপজন ঘোষণা করেছেন—"......very useful to teach the Natives English."

৭। "এই সময়েই তিনি নিজের সুবিধার জন্য নিজেই বাংলাভাষার একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও একটি ব্যাকরণ প্রস্তুত করেছিলেন।"
সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৫।

৮। "I am forming a dictionary Shanskrit Bengalee and English, in which I mean to include all the words of common use."
Perodical Accounts Vol. I, p. 377.

৯। সজনীকান্ত দাসের প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ-১৪৭।

১০। Carey William, A Dictionary of the Bengalee Language,
Serampore 1898, p. 9

১১। তদেব, . Preface IX.

১২। তদেব, p. 385

১৩। "ঋ - ১। অষ্টম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান মূৰ্দ্ধা; শিব, বাক্যারম্ভ। সং, পু। ২। অদিতি দিতি, গতি, রক্ষা, স্মৃতি। সং, স্ত্রী। ৩। ভয়। ব্য।"
" ঌ —নবম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত ; পৰ্ব্বত, সং পু। ২। দেবমাতা, অদিতি। পৃথিবী। সং।"
"ৡ- ১। দশম স্বরবর্ণ , ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত। সং, পু। ২। দেবনারী, মাতৃ বিশেষে, সং; স্ত্রী।
সুবল চন্দ্রমিত্র, সরল ছাত্রবোধ অভিধান। কলকাতা ১৯১২। পৃ-২৮৩। .

১৪। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলক), সংসদ বাঙ্গালা অভিধান। বিংশতিতম মুদ্রণ, কলকাতা ১৯৯৬। পৃ-১১২।

১৫। মৎপ্রণীত "মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও বাংলা বর্ণমালা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। শৈলী—প্রাগুক্ত।

১৬। উইলিয়ম কেরীর প্রাগুক্ত অভিধান, p. 873

১৭। সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৭।

১৮। "When the modern literary style was established for prose (and when printing was introduced) a rigid adherence to the correct orthography for Sanskrit

words naturally came in and brought in a needed uniformity for tatsama words in the place of chaos which reigned before.''

Chattopadhyay Sunitikumar, ODBL. Vol. I. Rupa, Calcutta-1985, p. 227.

১৯। রাজ্ঞী > রাণী, কর্ণ > কাণ ইত্যাদি। শক্তিব্রত ঘোষের প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ-২২৬।

২০। কেরীর প্রাগুক্ত অভিধান, Preface VII.

২১। তদেব,

২২। তদেব,

২৩। তদেব, p. 88.

২৪। তদেব, p. 9.

২৫। তদেব, p. 9.

২৬। কেরীর অভিধান প্রকাশের অনেক আগেই আপজন ও ফর্স্টারের শব্দকোষ প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ১৭৯৩ ও ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগারিক মোহন প্রসাদ ঠাকুর ও একটি অভিধান সংকলন করেন। ১৮১১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বইটির প্রশংসা করা হয়।

মোহন প্রসাদের গ্রন্থটি খুবই ক্ষীণকায়। আর অন্য পুস্তকগুলি কোষগ্রন্থ জাতীয়; পাশ্চাত্য ধরণের অভিধানের যথার্থ চরিত্র প্রথম কেরীর অভিধানেই পাওয়া যায়। তাছাড়া কেরীর অভিধান ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও তার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছিল ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দেই।

২৭। Carey E, প্রাগুক্ত, p. 600.

অষ্টম অধ্যায়

কেরীর সংস্কৃত উত্তরাধিকার

উইলিয়ম ওয়ার্ড

শ্রীরামপুরমিশনের বিখ্যাত ত্রয়ীর অপর দুইজন জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ডও সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। জোশুয়া মার্শম্যান সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। কেরীকৃত বাইবেলের সংস্কৃত তর্জমা মূল পুস্তকের সঙ্গে মেলানোর কাজে তিনি উইলিয়ম কেরীকে সাহায্য করেছিলেন। রামায়ণের সংস্কৃত অনুবাদেও মার্শম্যান ছিলেন সহকারী অনুবাদক। শ্রীরামপুর কলেজের নির্দেশিকা পুস্তিকা রচনায় বিশেষত সংস্কৃত শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয়রূপে গণ্য করার ব্যাপারে মার্শম্যানের বিশেষভূমিকা ছিল।

উইলিয়ম ওয়ার্ড বাংলা জানতেন[১] এমনকি জনক্লার্ক মার্শম্যানের মতে চলতি বাংলাও অনেক য়ুরোপীয়ের তুলনায় ভালই আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক দুই একটি পুস্তিকা ছাড়া তাঁর বাংলা রচনা বিশেষ পাওয়া যায় না। তিনি দুই খণ্ডে "A VIEW OF HISTORY, LITERATURE AND MYTHOLOGY/OF THE HINDOOS/INCLUDING/THEIR MANNARS AND CUSTOMS/AND/TRANSLATION FROM THEIR PRINCIPAL WORKS" নামে পুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থের দুটি খণ্ড শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২] এই পুস্তকে ভারতীয় সমাজ, সাহিত্য, আচার ব্যবহার, এক কথায় ভারতীয়দের সম্বন্ধে একটি সর্বাঙ্গীন আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীকালে গ্রন্থটি চারি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে মুদ্রিত হয়। এই চারিটি পুস্তক আবার অংশে, অংশগুলি অধ্যায়ে এবং অধ্যায়গুলি কোন কোন ক্ষেত্রে পর্বে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ড বা Ist Vol-এর বিষয় ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতীয় সমাজ। দ্বিতীয়খণ্ডে ওয়ার্ড ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, বিভিন্ন দর্শনের অনুবাদও করেছেন। আমরা ওয়ার্ডের-করা বেদান্তদর্শনের অনুবাদের কিছু নমুনা নিবেদন করলাম—"The first is he who depends upon works, and the later is

he who depends on wisdom. From hence it will be manifest that to obtain emancipation, works and devine wisdom must be united"[৩] পরে ওয়ার্ড দেখিয়েছেন শঙ্করাচার্য কিভাবে এই মতের সমালোচনা করেছেন। দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে ওয়ার্ড বিভিন্ন ভারতীয় আস্তিক্য দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থের তালিকা সংযোজনা করেছেন।

পুস্তকের তৃতীয়খণ্ডে হিন্দুদের উপাস্য দেবদেবীর বিবরণ, বিভিন্ন দেব এবং বিভিন্ন দেবীর পরিচয় পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে, ওয়ার্ড দেবদেবীদের অর্চনার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন।

এই গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডে হিন্দুদের দেবমন্দির, দেববিগ্রহ, পুরোহিততন্ত্র ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এই খণ্ডে হিন্দুধর্ম ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইত্যাদি অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনের আলোচনাও ওয়ার্ড করেছেন। গ্রিক ও ভারতীয়দর্শনের তুলনামূলক আলোচনাতেও ওয়ার্ডের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত ওয়ার্ডের এই গ্রন্থের বিষয়কে মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়—(১) প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ইতিহাস, (২) হিন্দুধর্ম দর্শন পুরাণ প্রভৃতি, (৩) ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক পরিচয়, (৪) কৃষিশিল্প অর্থ, (৫) ব্যক্তিগত ও সমাজজীবন, (৬) শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

এই গ্রন্থের আলোচনায় ওয়ার্ড সবসময় কালানুক্রম বজায় রাখেননি;প্রাচীন কালের কোন বিষয়ের আলোচনার মধ্যে সমকালীন সেই ধরণের কোন সমস্যা আলোচনার অন্তভূর্ক্ত হয়েছে, যেমন প্রথমখণ্ডে হরিশচন্দ্র, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির বিবরণ থেকে হঠাৎই মুসলমান শাসনের সামান্য উল্লেখ করেই নবাব সিরাজুদ্দৌলা, তাঁর নানা অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা, পলাশীর যুদ্ধ, ইংরেজের জয় ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ওয়াঁড আস্তিক্যদর্শন ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শন এবং ভারতীয় সমাজের ব্যাখ্যা করেছেন একজন নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান ধর্মযাজকের মানসিকতায়। তাছাড়া তিনি সংস্কৃতভাষা ভালভাবে জানতেন না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাহায্যে দুরূহ দর্শনাদি গ্রন্থ পাঠ করেছেন। পণ্ডিতেরা সকলেই বিদ্যাবুদ্ধিতে মৃত্যুঞ্জয়ের সমকক্ষ ছিলেন না। সুতরাং ওয়ার্ড অনেক সময়েই হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি। অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং খ্রিস্টধর্মের গোঁড়ামি থেকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য তিনি করেছেন তা অনেকসময় ঔদ্ধত্যের পরিচয় মনে হতে পারে।[৪] তবে এই গ্রন্থে তিনি প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন;এটি তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। যদিও তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়েছিলেন, তবু তাঁর নিজের কৃতিত্ব কিছু কম নয়। একজন বিদেশীর পক্ষে ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান আহরণ কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। অবশ্যই এ বিষয় উইলিয়ম কেরীই ছিলেন ওয়ার্ডের প্রেরণাদাতা।

তবে এই গ্রন্থে তিনি সর্বাঙ্গীন সুবিচার করতে পারেননি এবং একজন বিধর্মী বিদেশীর পক্ষে তা অস্বাভাবিক নয়।

বিভিন্ন দিক থেকে উইলিয়ম ওয়ার্ড, উইলিয়ম কেরীর অনুগামী হলেও উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃতমনস্কতা ওয়ার্ডকে তেমনভাবে স্পর্শ করেনি। সংস্কৃত-জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উইলিয়ম কেরীর যে শ্রদ্ধা ছিল, ওয়ার্ডের মধ্যে তার কথঞ্চিৎ ন্যূনতা আছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবই হয়তো তার কারণ।

ওয়ার্ড তেমন কোন বাংলাগ্রন্থ রচনা করেননি, সুতরাং ভাষারীতিতে সংস্কৃতমনস্কতার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সংস্কৃতঘনিষ্ঠ কেরীর উত্তরসূরীরূপে ওয়ার্ডের অবস্থান একই সরলরেখায় নয়।

ফেলিক্স কেরী

উইলিয়ম কেরীর গভীর সংস্কৃতমনস্কতা শ্রীরামপুর মিশনের অন্যান্য সদস্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য উইলিয়ম কেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্স কেরী (১৭৮৬-১৮২২)। ভারতবর্ষে আগমনের কিছুদিনের মধ্যেই কেরী ইচ্ছাপ্রকাশ করেন যে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত করবেন—"I fully intended to devote my eldest son to the study of Shanskrit, my 2nd to Persian and my 3rd Chinese."[৫] কেরীর এই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল, ফেলিক্স সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হয়েছিলেন। বাংলাভাষাও ফেলিক্স খুব ভাল জানতেন। তিনি বাঙালিদের মতো সাবলীলভাবে বাংলা বলতে পারতেন এবং সমকালীন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিতই তাঁর মতো বাংলা জানতেন না।[৬] সংস্কৃতজ্ঞরূপেও তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়েছিল। পিতা উইলিয়ম কেরীর মতোই ভাষাশিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মদেশে ধর্মপ্রচারণার কালে তিনি ব্রহ্মদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করেন, পালিভাষাতেও তাঁর যথেষ্ঠ অধিকার ছিল। কিন্তু বাংলা ছিল তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা[৭] এবং সংস্কৃতভাষায় অসামান্য অধিকার।

পিতার বাইবেল তর্জমার কাজে ফেলিক্স ছিলেন অন্যতম সহায়ক। বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ ও প্রুফদেখার কাজে ফেলিক্স বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। এই ব্যাপারে উইলিয়ম কেরী নিজেই বলেছেন—"he examines Shanskrit proofs having studied that language."[৮]

ফেলিক্সের দীর্ঘকালের সহচর জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান বিভিন্ন প্রসঙ্গে ফেলিক্সের সংস্কৃত জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন—শ্রীরামপুরমিশনের ইতিহাসে ফেলিক্স প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"He was master of the Sanskrit language, and familiar with the principles of Oriental philosophy."[৯]

ছাপাখানায় এবং বাইবেল তর্জমার কাজে ফেলিক্সের বাংলা ও সংস্কৃতজ্ঞান শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে ছিল অপরিহার্য—"..........he will be able to supply Mr. Ward's place in the case of necessity, and that his complete knowledge of Sanskrit and Bengalee would render him a valuable assistance in the translations."[১০] ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে ফেলিক্স ব্রহ্মদেশীয়ভাষা ও পালিভাষা শেখেন। তিনি পালিভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করেন গ্রন্থটিতে সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদও সংযোজিত হয়।[১১] পিতা উইলিয়ম কেরী পুত্রের হৃদয়ে সংস্কৃত ভাষাপ্রীতির যে বীজ বপন করেছিলেন তা সর্বাংশে পুষ্পিত হয়েছিল।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ফেলিক্স বাংলাভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি প্রায় সবই অনুবাদ গ্রন্থ। গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাস অনুসরণে ফেলিক্স রচনা করেন "ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়"। পুস্তকটি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটি সাধারণে সমাদর লাভ করেনি। লিটারারি গেজেটে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বইটির বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। সমাচার দর্পণ ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি এই সমালোচনার উত্তর দেন।[১২] সমাচার দর্পণ অবশ্য স্বীকার করেন যে সমাসবাহুল্য এবং সংস্কৃতানুসারী ভাষা ব্যবহারের আতিশয্যই বইটির জনপ্রিয়তার পথে অন্তরায় হয়—"সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃতবাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং অনেকের অগ্রাহ্য হইল।"[১৩]

ফেলিক্সের আরেকটি গ্রন্থ 'যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ' John Bunyan-এর Pilgrim's Progress গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ—" প্রথমভাগে যাত্রির স্বীয় অগ্রেসরণ বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগ তাহার পরিবারের অগ্রেসরণ বিবরণ।" প্রথমখণ্ডটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ।

বিদ্যাহারাবলী ঃ

ফেলিক্স কেরীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ "বিদ্যাহারাবলী"। ইংরেজি এনসাইক্লোপিডিয়ার অনুকরণে ফেলিক্স একটি বাংলা বিদ্যাকোষ রচনার পরিকল্পনা করেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুন সমাচার দর্পণে এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।[১৪] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পঞ্চম সংস্করণ অবলম্বনে ফেলিক্স প্রথমে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা রচনা করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতা প্রথমেই তাঁকে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা রচনার প্ররোচিত করে। প্রতিমাসে একটি করে বিদ্যাহারাবলী মোট চোদ্দটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি খণ্ডের মূল্য ছিল দুটাকা পরে খণ্ডগুলি একত্র গ্রথিত হয়ে সম্পূর্ণরূপ পায়। ব্যবচ্ছেদবিদ্যার সূচী ইত্যাদি সহ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩৮, মূল্যধার্য হয় ২৮ টাকা।

ব্যবচ্ছেদবিদ্যা পুস্তকটি তিনভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলির নাম কাণ্ড। কাণ্ডগুলি অধ্যায়ে এবং অধ্যায়গুলি পর্বে বিভক্ত। প্রথমভাগে অস্থিবিদ্যা, দ্বিতীয়ভাগে তুল্যাতুল্য ব্যবচ্ছেদবিদ্যা এবং তৃতীয় অংশে ব্যবচ্ছেদবিদ্যোৎপত্তিকরণ আলোচিত হয়েছে। এই অংশে 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যাভিধান' নামে একটি পরিভাষার সংকলন সংযোজিত হয়েছে।

বিদ্যাহারাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ স্মৃতিশাস্ত্র। আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে দ্বিতীয় গ্রন্থের দ্বিতীয়কাণ্ড স্মৃতিশাস্ত্র।[১৫] স্মৃতিশাস্ত্রের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। উপযুক্ত সংখ্যায় গ্রাহক না পাওয়ায় বিদ্যাহারাবলীর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।[১৬]

অনেকের মতে ফেলিক্স কেরী জনম্যাকের ইংরেজিতে লিখিত রসায়ন বিদ্যার গ্রন্থ 'কিমিয়াবিদ্যাসার' নামে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।[১৭] কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। ফেলিক্সের সহকর্মী ও বন্ধু জনক্লার্ক মার্শম্যানের পুস্তকে এবং ফ্রেণ্ড-অফ-ইণ্ডিয়া ইত্যাদি পত্রিকায়[১৮] ফেলিক্স কেরীর যে মূল্যায়ণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করে পরবর্তী সমালোচকরা ফেলিক্সের বাংলাভাষা জ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, কিন্তু প্রায় সকলেই ফেলিক্সের অতিরিক্ত সংস্কৃত প্রবণতা ও সেই কারণে ভাষার কথঞ্চিৎ দুর্বোধ্যতার উল্লেখও করেছেন।

সংস্কৃত প্রবণতা ঃ

উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃতমনস্কতা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাঁর ভাষাকে সমাসবহুল সংস্কৃতানুসারী করে তুলেছিল। এই সংস্কৃত প্রবণতা বিদ্যাহারাবলীর দুটি গ্রন্থে বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান। ব্যবচ্ছেদবিদ্যার আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি ফেলিক্সকে পুস্তক রচনায় সাহায্য করেছিলেন এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার পুস্তকের ভাষা সংশোধন করেছিলেন—"শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক ভাষা বিবেচিত এবং শ্রী কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি কর্তৃক সাহায্যীকৃত।" পিতা উইলিয়ম কেরীও তর্জমার ভাষা বিবেচনা করেছিলেন।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের বাহুল্যের জন্য এবং সম্ভবত অপ্রচলিত পরিভাষা ব্যবহারের জন্য লেখককে কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সংস্কৃতমনস্ক ফেলিক্স দুটি সংস্কৃত শ্লোকে তার উত্তর দিয়েছিলেন।

> "গ্রন্থেনির্ণীতমত্রামররভসজটাবিশ্বকোযেষু দৃষ্টৈঃ।
> শিষ্টৈঃ প্রাচীনশব্দৈঃ সকলজনমুদেহস্থ্যাদিশারীরতত্ত্বং।।
> যৎ কোষানাপ্তনামা পরমপি রচিতৈঃ কেবলযৌগিকৈস্তৎ।
> যুস্মাভির্ব্বেদ্যমুদ্যৎসুবিমলমতিভিঃ সাধুসন্ধানপূর্ব্বং।।
> দ্রক্ষ্যন্ত্যস্মিন্নবদ্যং কমপি যদি পদন্যাসমেবাপ্যবোধ্যং।
> সদ্যোবোধ্যং প্রসিদ্ধং বিদধতু ভবতাং সম্মতং সম্মতঞ্চেৎ।।

কিন্তেতদ্বচম্যদ্যবশ্যং পদগতবিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা বিশেষং।
কুর্ব্বীরংস্তেন মাঞ্চাপরমপি পরমানন্দসন্দোহযুক্তং।।"

"অর্থাৎ অমর, রভস, জটাধর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে যে সকল প্রাচীন শিষ্টশব্দ দেখা যায়, সকলের আনন্দ বিধানার্থ এই গ্রন্থে সেইসকল শব্দের সাহায্যে অস্থ্যাদি শরীরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। আর যে সকল শব্দ কোষসমূহে পাওয়া যাইবে না, তাহাদিগকে কেবল যৌগিক ও সাধু শব্দ সকলের মিলনদ্বারা রচিত বলিয়া উদীয়মান সুবিমল বুদ্ধিশালী আপনারা জানিবেন।

এই গ্রন্থে যদি কোনও পদন্যাসকে অবোধ্য ও নিন্দনীয় দর্শন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই পদকে আপনাদের সজ্জনগণের সম্মত প্রসিদ্ধ ও বোধযোগ্যরূপে পরিবর্তিত করিবেন। কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে সেই পদগত বিষয় ও তাহার বিশেষ জানাইয়া তদ্বারা আমাকে ও অন্যান্যকে অবশ্যই পরমানন্দিত করিবেন।"[১৯] এমনকি পাঠক সাধারণের এই দৃষ্টি আকর্ষণের প্রস্তাবটিও সংস্কৃতে রচিত—" সর্ব্বজ্ঞাপনার্থক-শ্লোকদ্বয়মিদং।"

বিদ্যাহারাবলীর ভাষা ঃ

বিদ্যাহারাবলীর দুটি গ্রন্থেরই ভাষারীতি সংস্কৃতানুসারিণী। অবশ্য ভাষার গাম্ভীর্য সর্বদা বিষয়ের গাম্ভীর্যের উপর নির্ভরশীল। ফেলিক্স কেরীর ভাষার কাঠিন্য সম্পর্কে যাঁরা সমালোচনা করেছিলেন, ফেলিক্স তাঁদের প্রত্যুত্তর দেন—"তদ্বিষয়ে উত্তর করি যে তাবদবিদ্যাগ্রন্থ কঠিন অতএব সহজভাষায় তর্জমা প্রায় হয় না। অপর ইহাও বিবেচনা করুন যে বহ্বভ্যাসব্যতিরিক্ত কোন এক বিদ্যাজ্ঞ হওয়া যায় না এবং যাঁহারা অভ্যাস করেন তাঁহাদের মধ্যে সকলেই পরিপক্ক হন না....."[২০]

বিদ্যাহারাবলীর দ্বিতীয়গ্রন্থ স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষাও তৎসমশব্দবাহুল্যে অনায়াসবোধ্য নয়। এক্ষেত্রেও ভাষা বিষয়কেই অনুসরণ করেছে। স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হল—

"ব্যবস্থানির্মাণ নিদর্শন

৫২।। দ্বিতীয়তঃ।। উক্ত ব্যবস্থা নির্মাণ বিষয়ে মান নাই। প্রধান ২ নিয়ম ব্যাখ্যা করি। প্রথমতঃ শোধক ব্যবস্থা নির্মাণ বিষয়ে বিষয়ত্রয়বিবেচনাই পুরাতন ব্যবস্থা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে অমঙ্গল এবং তৎশোধন অর্থাৎ ব্যবস্থানির্মাণ সময়ে সে ব্যবস্থা কিমত ছিল এবং সামান্য ব্যবস্থা নিবারণে অসমর্থ এমত কি ২ অমঙ্গল ও তদমঙ্গলনিবারণার্থে মহাসভ্যেরা কি২ শোধনোপায় করিয়াছেন অপর বিচারকর্তাদের কার্য্য এই যে তাঁহারা ঐ ব্যবস্থা হইতে উৎপন্ন অমঙ্গলনিবারকত্বরূপে এবং তচ্ছোধকত্বরূপে পুরাতন ব্যবস্থার অর্থ দেন।"[২১]

ফেলিক্স কেরীর রচনায় সংস্কৃত ভাষারীতির কয়েকটি নিয়ম অত্যন্ত প্রকটভাবে দৃষ্ট হয়। প্রথমত বাংলাভাষায় ব্যবহৃত হয় না এমনকিছু সন্ধি তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়, যেমন—'পলায়নোদ্যুক্ত' (যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ, পৃ-ত); 'পূর্ব্বরীত্যানুসারে' (তদেব, পৃ-৩) 'ইতোমধ্যে' (তদেব, পৃ-৪); 'তদুত্তরাধিকারী' (স্মৃতিশাস্ত্র, পৃ-৪৮); 'তচ্ছোধকত্বরূপে' (তদেব, পৃ-৬৩); 'পুষ্টিকরাংশোৎপত্তি' (তদেব, পৃ-২); 'বহ্বাভ্যাসব্যতিরিক্ত' (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা-ভূমিকা); 'অত্যাহ্লাদবিষয়' (তদেব, ভূমিকা) ইত্যাদি। সন্ধিদ্বারাগঠিত শব্দগুলি বাংলাভাষায় শুধু অপ্রচলিত নয়, শ্রুতিকটুও।

সমকালীন এবং পরবর্তী সমালোচকেরা অনেকেই ফেলিক্সের রচনায় সমাসবাহুল্যের অভিযোগ করেছেন। সংস্কৃতভাষানুযায়ী ভাষারীতিতে সমাসবাহুল্য একান্তই স্বাভাবিক। আমরা ইতস্তত কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত করছি—"তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদিগ্রন্থাবলী" (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা-ভূমিকা); "তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদিবর্দ্ধনার্থে" (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা-ভূমিকা); "নূতনসদ্রীত্যবলম্বনের" (যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ, পৃ-৫); 'ভাব্যভাবনাপ্রযুক্ত' (যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ, পৃ-৪); 'অত্যসহ্যভারবদ্বিষয়' (যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ, পৃ-২০৫); 'পাপকর্ত্তৃকস্থমানব্যবস্থা' (স্মৃতিশাস্ত্র, পৃ-৫৩); 'তৎকলস্বভাবাধীন' (স্মৃতিশাস্ত্র, পৃ-১); 'নিত্যাহ্লাদামোদস্বভাব' (ব্রিটিনদেশীয় বিবরণ, পৃ-২২৯); 'মর্য্যাদাধরহওনোপযুক্তপাত্র' (ব্রিটিনদেশীয়বিবরণ, পৃ-২২৯) ইত্যাদি।

সংস্কৃতভাষানুযায়ী বিশেষণপদেরও লিঙ্গান্তর প্রয়োগ ফেলিক্স কেরীর রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচিত যে কোন পুস্তকে এই বৈশিষ্ট্যের প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখা যায়—'উপযুক্ত সংজ্ঞা.....গৃহীতা' (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা-ভূমিকা), 'সংজ্ঞা অনুপযুক্তা' (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ভূমিকা); 'বিদ্যা সন্তোষজনিকা' (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা-ভূমিকা); 'প্রবেশকারিণী নাড়ী' (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা-ভূমিকা); "গমনকারিণীশিরা" (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা - ভূমিকা); 'রাত্রি উপস্থিতা' (যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ, পৃ-২); 'দুষ্টমতি বর্দ্ধিতা' (যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ, পৃ-২০৫); 'ব্যবস্থা প্রকাশিতা' (স্মৃতিশাস্ত্র, পৃ-৫৪) ইত্যাদি। এমনকি ফেলিক্স ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যপদের বিশেষণে ক্লীবলিঙ্গই ব্যবহার করেছেন, যেমন—'বলবৎ প্রমাণ' (স্মৃতিশাস্ত্র, পৃ-৪২)।

ফেলিক্স তাঁর রচনায় এমন কতকগুলি তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলির প্রয়োগ বাংলাভাষায় বিরল যেমন—'প্রজ্ঞ' জ্ঞানী অর্থে, (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা); 'গ্রাহ্য'—গ্রহণযোগ্য অর্থে (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা); 'পারস্ক'—সক্ষম, সমর্থ, যিনি পারেন এই অর্থে (ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা); 'মননার্হ'—মান্য অর্থে (স্মৃতিশাস্ত্র); 'সন্দেহ্য' সন্দেহের যোগ্য অর্থে (স্মৃতিশাস্ত্র); 'তদ্ধিত'—তাহার হিত, মঙ্গল অর্থে, (ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ) ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু শব্দ বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে অন্বিত হয়ে অপ্রচলিত অর্থ প্রকাশ

করেছে, যেমন, যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ গ্রন্থে—"কারাগারে যাইতে সসজ্জ নহি" (পৃ-৪)। এখানে 'সসজ্জ' পদ প্রস্তুত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ গ্রন্থের আখ্যাপত্রে 'অর্থসংগৃহীত' পদটির অর্থ—ব্যাখ্যাদি সংগ্রহ। অর্থ ও সংগ্রহ পদের সমাসে বাংলাভাষায় সাধারণত টাকাকড়ি সংগ্রহই বুঝায়।

সংস্কৃত ব্যাকরণের আরও কিছু কিছু নিয়ম ফেলিক্সের রচনায় অনুসরণ করা হয়েছে, যেমন—ইন্ ভাগান্ত শব্দ অন্য প্রত্যয়যুক্ত হলে অথবা সমস্তপদে পরিণত হলে হ্রস্বইকারান্ত রূপগ্রহণ করেছে;ইন্‌ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে ঈকারান্ত হয়, কিন্তু সমাসবদ্ধ হলে ও অন্য কয়েকটি স্থলে হ্রস্বইকারে পরিণত হয়। ফেলিক্স সেই নিয়ম অনুসরণ করেছেন, যেমন—'প্রতিবাসিরা' (যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ, পৃ-২৫); 'ব্যবহারানুষ্ঠায়িচলনে' (স্মৃতিশাস্ত্র, পৃ-৪৮);'ভূস্বামির', 'স্বস্বামির' (স্মৃতিশাস্ত্র, পৃ-৪৮); 'স্বাক্ষর কারিরদের'-(স্মৃতিশাস্ত্রের মলাটের ইস্তিহার)।

কোন কোন স্থলে বিদেশী শব্দেও এইধরণের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন, 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' গ্রন্থের আখ্যাপত্রে উল্লিখিত 'ফেলিক্স কেরি কর্তৃক'। এখানে 'কেরী' শব্দ নিশ্চয়ই ইন্‌ভাগান্ত নয়, কিন্তু সংস্কৃতঘনিষ্ঠ ফেলিক্স এখানেও সংস্কৃতের নিয়ম প্রয়োগ করেছেন।

ভারতীয়দর্শন সমূহে যে বিশিষ্ট রচনা পদ্ধতি পূর্বাপর প্রচলিত তার আভাসও ফেলিক্সের রচনায় অনেকাংশেই দৃশ্যমান। স্মৃতিশাস্ত্রের নিম্নলিখিত অংশ দার্শনিকভাষার নমুনারূপে পরিবেষণ করা যেতে পারে—"নিয়ম সংজ্ঞাতে সামান্যার্থেতে এবং বিশেষার্থেতে কার্য্যনিয়ম কহি এবং সাধারণরূপে তাহা সর্বপ্রকার কার্য্যবিষয়ে বিশেষতো জীববিশিষ্ট কিম্বা জীবরহিত কিম্বা জ্ঞানবিশিষ্ট কিম্বা জ্ঞানরহিত দ্রব্যের কার্য্যবিষয়ে সঙ্গত হয়....."[২২] ইত্যাদি।

অথবা—"কথিত জানপদব্যবস্থা এবং কাননব্যবস্থা অলিখিত ব্যবস্থার মধ্যে গণনা করা অযথার্থ বোধ হয়। যেহেতুক সে সকল ব্যবস্থা পণ্ডিতদের নানাব্যবস্থা গ্রন্থেতে ব্যবস্থারূপে চালিতা হইয়া বহুটীপ্পণীদ্বারা অতিপ্রমাণস্বরূপ স্থিরীকৃতা হইয়াছে।"[২৩]

কিন্তু ব্যবচ্ছেদবিদ্যার পরিভাষা নির্মাণেই ফেলিক্সের সংস্কৃতজ্ঞানের চরমপ্রকাশ ঘটেছে। ব্যবচ্ছেদবিদ্যা শিক্ষার জন্য ফেলিক্স যে পরিভাষা রচনা করেছিলেন তার কিছু নিদর্শন নিবেদিত হল—'কর্ণাগ্রবলয়স্থবৃহন্মাং', (মাং অর্থাৎ মাংসপেশী)। পরিভাষার তালিকায় ফেলিক্স মাংসপেশীকে সংক্ষেপে 'মাং' লিখেছেন। আরও এইরকম পরিভাষা—'অন্ত্রযুস্কগ্রন্থিসংলগ্নকুরণ্ড', 'জরায়ুপথব্যবধায়ক', 'দ্ব্যস্থিমধ্যবর্ত্তিবন্ধনী', 'কশেরুকামূলকণ্ঠযুক্তমাং', 'স্থনিকা', 'তূরীবলোগ্রযুক্তমাং', 'তম্বুল' ইত্যাদি।

এই পরিভাষাগুলি রচনায় ফেলিক্সকে অনেকক্ষেত্রেই সমাসের সাহায্য নিতে হয়েছে,

ফলে শব্দগুলির আকার কিঞ্চিৎ বিশাল এবং অপ্রচলিত। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ফেলিক্স এব্যাপারে পথিকৃৎ, সুতরাং তাঁর নিরীক্ষার ফল সবসময় আশানুরূপ না হতেও পারে। কিন্তু সংস্কৃতভাষা তথা তৎসম শব্দকে অবলম্বন করে ফেলিক্স এমন অনেক পরিভাষা রচনা করেছেন যা বর্তমানকালেও বাংলাভাষায় লিখিত শারীরবিদ্যাগ্রন্থে প্রচলিত, যেমন—'করোটি , 'ক্ষুদ্রান্ত্র', 'হৃদপিণ্ড', 'পার্ষ্ণী', 'রোগান্তদিবস', 'ভ্রূণবেষ্ঠ', 'মজ্জারস', 'ললাটাস্থি' 'চক্ষুকোটর', 'জীববিদ্যা' ইত্যাদি।[২৪]

সজনীকান্তদাস বিদ্যাহারাবলীর তথা ব্যবচ্ছেদবিদ্যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন—"বিষয়ের দুর্বোধ্যতা ও দুরূহতা বিবেচনা করিলে ফেলিক্স যে ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই।"[২৫]

ফেলিক্সের ভাষার দুর্বোধ্যতা ও দুরূহতা[২৬] সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়; নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ—"পরে একগুঁইয়া তিরস্কার করিয়া কহিল তুই তোর পুস্তককে লইয়া যা আমাদের সহিত ফিরিয়া যাবি কিনা বল। খ্রীষ্টীয়ান কহিল আমি যাইব না, কেননা লাঙ্গলে হাত দিয়াছি।"

উইলিয়ম কেরী পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে ভারতীয়ভাষায় তর্জমা করতে আগ্রহী ছিলেন, ফেলিক্স কেরী পিতার সেই স্বপ্নকে সফল করেছেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচনায় তিনিই পথিকৃৎ।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

বিদ্যোৎসাহিতায় উইলিয়ম কেরীর অন্যতম উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যানের সুযোগ্য পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭)। শ্রীরামপুরমিশন বিদ্যালয়েই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের মতোই তিনি চিনাভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃতভাষাও তিনি যত্নসহকারে শিখেছিলেন। জর্জ স্মিথ জন মার্শম্যান সম্পর্কে বলেছেন—"In all these he became an expert oriental scholar, mastering Chinese and Persian."[২৭] উইলিয়ম কেরীর মতো তরুণ মার্শম্যানও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কাছে বাংলা ও সংস্কৃতভাষা শেখেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর জীবনীকার জে. জে. হিগিনবোথাম বলেছেন—".......he had read intelligently all the great Sanskrit poems."[২৮]

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইংরেজি ও বাংলায় বহুপুস্তক রচনা করেন। তাঁর ইংরেজি গ্রন্থগুলি অধিকাংশই আইনসংক্রান্ত গ্রন্থ এবং ইতিহাস পুস্তক। বাংলাভাষায় তিনি খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। তরুণ (জুনিয়র) মার্শম্যানের বাংলাপুস্তকের অনেকগুলিই তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ।

উইলিয়ম কেরী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রিয় ছাত্র জন মার্শম্যানের রচনায় সংস্কৃত

ভাষারীতির ছাপ প্রকট। উইলিয়ম কেরী ও ফেলিক্স কেরীর মতোই তাঁর রচনা তৎসমশব্দবহুল। পূর্বসূরীদের মতোই তিনি স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যপদের বিশেষণরূপে স্ত্রীলিঙ্গ পদ ব্যবহার করেছেন—"পৃথিবী প্রায় ছয়হাজার বৎসর নির্ম্মিতা হইয়াছে" অথবা "এই কিংবদন্তী সকল জাতি মধ্যেই লোকপরম্পরাসিদ্ধা আছে।"[২৯] এখানে পৃথিবীর বিশেষণ 'নির্ম্মিতা' এবং 'পরম্পরাসিদ্ধা' প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলি সংস্কৃত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দেয়।

সংস্কৃতে যুক্তি পরম্পরায় বক্তব্যকে প্রকাশ করার যে রীতি প্রচলিত জন ক্লার্কের রচনায় তার অনুসরণও পরিদৃশ্যমান—"যখন পৃথিবী হইতে কোন জিনিস উঠান যায় তাহাকে আকর্ষণের বিপরীতে উঠাইতে হয়। সে বস্তু যদি অতিবৃহৎ হয় তবে পৃথিবীর আকর্ষণে অধিকত্ব প্রযুক্ত অধিকভার বোধ হয়।"[৩০]

বঙ্গদেশে সংস্কৃতচর্চার প্রসার সম্পর্কেও জন ক্লার্ক মার্শম্যান খুবই সচেতন ছিলেন। বাংলা লিপিতে সংস্কৃত পুঁথি লেখা বঙ্গদেশের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গভূমিতেও সংস্কৃতভাষা দেবনাগরী লিপিতে লেখার প্রচলন ঘটে। কিন্তু সংস্কৃতচর্চার প্রসারের জন্য তরুণ মার্শম্যান পুনরায় বাংলা লিপি প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করেন—"অতএব আমাদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃতবিদ্বান সাহেব লোকেরা আশ্চর্য্যবোধ করেন তথাপি নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃতগ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে।"[৩১]

উইলিয়ম কেরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জন ক্লার্ক মার্শম্যান পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে দেশীয় ভাষায় রূপান্তরের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, আর সেই রচনার মাধ্যম হয়েছিল অনেকস্থলেই সংস্কৃতানুগ ভাষা।

উইলিয়ম ইয়েটস

উইলিয়ম ইয়েটস (১৭৯২-১৮৪৫) ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর সহায়করূপে শ্রীরামপুরে আসেন। কেরীর মতোই তাঁর ভাষা শিক্ষার প্রবণতা ছিল, তিনি গ্রিক ও ল্যাটিনভাষা জানতেন। কেরীর কাছে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতভাষা খুব ভালভাবে শেখেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল।

শ্রীরামপুরমিশনের সঙ্গে বিরোধের পর যে সব তরুণ বৈঠকখানায় নতুন ব্যাপটিস্টমিশন প্রতিষ্ঠা করেন ইয়েটস ছিলেন তাঁদের অন্যতম এবং বিদ্যায় বুদ্ধিতে সকলের সেরা।

ইয়েটসের ইংরেজিতে লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয় এবং দেশের শিক্ষিত সমাজে তিনি সংস্কৃতজ্ঞরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ইয়েটসের A Gram-

mar of the Sanskrit Language and Sanskrit Vocabulary গ্রন্থে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ভূমিকা সংযোজিত হয়।[৩২]

ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থরূপে তিনি হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি সংস্কৃতে বাইবেলের অনুবাদও করেছিলেন।[৩৩] তাঁর অন্যান্য বাংলাগ্রন্থগুলির মধ্যে নিউটেস্টামেন্টের বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র বাইবেলও তিনি অনুবাদ করেছিলেন।

এশিয়াটিক রিসার্চেসের বিংশতি খণ্ডে সংস্কৃতসাহিত্য সম্বন্ধে ইয়েটসের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর Essays on Sanskrit Alliterations এবং Review of the Naishadha Charita প্রবন্ধ দুটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এশিয়াটিক রিসার্চেসে প্রকাশিত প্রবন্ধ দুটি ইয়েটসের গভীর সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় দেয়। Review of the Naishadha Charita ইত্যাদি প্রবন্ধের সমালোচনায় একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। নৈষধচরিতের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইয়েটস ব্যাসদেব এবং কালিদাসের নাম উল্লেখ করেছেন। ব্যাসরচিত মহাভারত মহাকাব্যই নলোপাখ্যানের উৎস। ইয়েটস্ কালিদাস ও শ্রীহর্ষের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে—"It is to be remarked however that each poet aimed at an opposite extreme : the former labouring to reduce his narration into as small a campass as possible and the latter to expand and adorn it with a great varity of poetic composition"[৩৪] ইয়েটসের সমসাময়িককালে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন নলোদয়কাব্য কালিদাসেরই রচনা।[৩৫] ইয়েটস নলোদয় কাব্য সম্পাদনা করেন। নৈষধচরিতের সঙ্গে নলোদয়ের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন।

লেখক সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষের বর্ণনানিপুণতার উল্লেখ করেছেন। মহাকাব্যোচিত প্রকৃতিবর্ণনায় বিশেষত নারীর অনুপুঙ্খরূপবর্ণনায় ভাষার যে স্বাচ্ছন্দ্য ও লালিত্যের পরিচয় শ্রীহর্ষ দিয়েছেন ইয়েটস্ তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। শ্রীহর্ষের শৃঙ্গাররসাত্মক বর্ণনাও প্রশংসার দাবী রাখে। এই প্রসঙ্গে ইয়েটস অধ্যাপক কোলব্রুকের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"This poet with a degree of licentiousness, which is but too well accommodated in the taste of his countrymen, indulge in glowing description of sensual love."[৩৬]

ইয়েটস সংস্কৃতকাব্যের ছন্দ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[৩৭] নৈষধচরিত কাব্যের ছন্দ প্রসঙ্গে ইয়েটস লিখেছেন—"In order to form a correct estimate of the nature and value of this poem it is necessary that reader should have correct knowledge not only of the subject discussed, but of the different metres employed by the poet. The metres

used in the Naishada are numerous" ইয়েটসের মতে অলঙ্কারের ব্যবহারেও নৈষধকার বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। শ্রীহর্ষের সমগ্র কাব্যটিই অলঙ্কারে সমৃদ্ধ এবং জাগতিক এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর কাব্যে উপমানরূপে স্থান পায়নি। ইয়েটস মনে করেন বর্ণনার চারুত্ব ও ভাষার লালিত্যে শ্রীহর্ষ ল্যাটিনভাষার কবি ভার্জিলের সমকক্ষ।[৩৯] সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের কথা মনে রেখে ইয়েটস মূলশ্লোকগুলির অনুবাদও পরিবেষন করেছেন।[৪০]

এশিয়াটিক রিসার্চেসে প্রকাশিত অপর প্রবন্ধ Essay on Sanskrit Alliteration প্রবন্ধে ইয়েটস লক্ষ্য করেছেন যে সংস্কৃত সাহিত্যে অনুপ্রাস কেবলমাত্র বর্ণের পুনরাবৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়, অক্ষর, পদ এমনকি শ্লোকাংশেও প্রসারিত।[৪১] ইয়েটস নলোদয় কাব্য থেকে অনুপ্রাসের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, নলোদয়কাব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছন্দে অনুপ্রাসগুলি কিভাবে সজ্জিত হয়েছে তাও লক্ষ্য করেছেন। তিনি যমক অলঙ্কারকেও অনুপ্রাসের অন্তভূর্ক্ত করেছেন। 'অব্যপেত', 'ব্যপেত' ইত্যাদি ক্রমে যমকের অনেকগুলি বিভাগ এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। বিভাগগুলির আবার উপবিভাগ আছে। ইয়েটস সংস্কৃতভাষায় মূল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, শ্লোকগুলি ইংরেজিভাষায় তর্জমাও করেছেন। যমকের বিভিন্ন ভেদ উপস্থাপনে ইয়েটস আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শের তৃতীয় পরিচ্ছেদ অনুসরণ করেছেন। উদাহরণগুলিরও অনেকগুলিই দণ্ডীর কাব্যাদর্শ থেকে সংগৃহীত।[৪২] দণ্ডীকে অনুসরণ করে ইয়েটস "গোমুত্রিকা", "দুষ্কর", "সর্ব্বতোভদ্র" প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্যবন্ধের উদাহরণ দিয়েছেন।[৪৩] আচার্য দণ্ডী এইসব পদ্যবন্ধের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'চিত্র', আলোচনার সমাপ্তিতে বলেছেন "ইতি চিত্রচক্রম্"। ইয়েটস এই পদ্যবন্ধগুলির সচিত্র উদাহরণ দিয়েছেন।[৪৪] চৌত্রিশটি শ্লোকে রচিত একটি বৃক্ষাকৃতি পদ্যবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ ইয়েটস করেছেন। বলাবাহুল্য পদ্যবন্ধটির অনুবাদও বৃক্ষাকৃতি। এই 'বৃক্ষাকৃতি' তর্জমা রচনায় ইয়েটসের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের চরমপ্রকাশ।[৪৫] এই সচিত্র পদ্যবন্ধগুলির উদাহরণ কেবলমাত্র কাব্যাদর্শ নয়, সাহিত্যদর্পন, কাব্যপ্রকাশ ইত্যাদি অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ থেকেও সংগৃহীত হয়েছে। রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারকেও ইয়েটস বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন।[৪৬]

ইয়েটস সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন, সংস্কৃত ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করেছিলেন, সেই সঙ্গে ভারতীয় আস্তিক্যদর্শনও গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। তাই রামমোহনের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল।[৪৭]

ইয়েটস শ্রীরামপুর মিশন ত্যাগ করে কলকাতার বৈঠকখানায় নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাপটিস্ট মিশনে যোগদান করেছিলেন।[৪৮] কিন্তু কেরীর উত্তরসূরীদের মধ্যে তাঁরই সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ ছিল প্রবল এবং সংস্কৃতশাস্ত্রে অধিকারও ছিল সর্বাধিক।

অনুপ্রাস সম্পর্কিত প্রবন্ধের উপসংহারে ইয়েটস লিখেছেন—".....the natives of this country are by no means deficient in intellect. No nation has even penetrated to a greater extent in the arena of literature than the Hindus : and no other nation has even yet presented as equal variety of poetic compositions."[৪৮]

ভারতের অধিবাসী ও ভারতীয়শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত।

জন ম্যাক

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে ভারতীয়দের সুশিক্ষিত করার ইচ্ছা উইলিয়ম কেরী পোষণ করতেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে বিভিন্ন দেশীয়ভাষায় ও সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের জন্য বারংবার যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন এবং অনুবাদের কিছু কিছু প্রচেষ্টাও হয়েছে। এই ব্যাপারে কেরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহযোগী ছিলেন জন ম্যাক (১৭৯৭-১৮৪৫)।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মযাজক ম্যাক উইলিয়ম ওয়ার্ডের সঙ্গে শ্রীরামপুর আসেন। ওয়ার্ড স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য এবং মিশনের কাজেও স্বদেশে গিয়েছিলেন; প্রত্যাগমনের সময় জন ম্যাক তাঁর সঙ্গে আসেন। তিনি শ্রীরামপুর কলেজে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন।

ম্যাক গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কৃতবিদ্য ছিলেন, কিন্তু রসায়ন বিদ্যার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ পক্ষপাত। শ্রীরামপুর মিশনের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে এবং নিজের মতাদর্শানুসারে তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানই শ্রেয় মনে করতেন। তাই তিনি ছাত্রদের ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষাতেও পাঠদান করতেন। রসায়ন শাস্ত্রসম্বন্ধে তিনি বাংলাভাষায় বক্তৃতাও করতেন। এইসব বক্তৃতাকে অবলম্বন করে তাঁর গ্রন্থ 'কিমিয়াবিদ্যাসার' রচিত হয়। গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮৩৪ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের রচনাকাল ও প্রকাশকালের মধ্যে কয়েকবছরের ব্যবধান। এই তথ্য গ্রন্থের ভূমিকাতেই পাওয়া যায়।[৪৯]

গ্রন্থটি দ্বিভাষিক, পৃষ্ঠার একদিকে ইংরেজি, অপরদিকে বাংলা রচনা মুদ্রিত হয়েছে। বাংলা রচনা অবশ্য ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদ নয়। গ্রন্থটি বাংলায়-লেখা রসায়নবিদ্যার প্রথম গ্রন্থ।

যদিও গ্রন্থটি বিজ্ঞানবিষয়ক তবু ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থের প্রারম্ভে নির্ঘন্ট অংশেই ভাষায় যে সন্ধিকৃত পদ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি প্রায়ই সংস্কৃতভাষায় ব্যবহৃত হয়, যেমন—''তত্ত্বভাগের', 'তাবদ্বস্তু', 'গুণান্তরোৎপত্তি' ইত্যাদি।

রচনাকে সংহত করার প্রয়াসে বহুলপরিমাণে সমাসবদ্ধপদ প্রযুক্ত হয়েছে। তিন বা ততোধিক পদনিষ্পন্ন সমাসবদ্ধপদের ব্যবহার প্রায়ই লক্ষিত হয়, যেমন—"মহত্ত্বক্ষুদ্রত্বানুসারে", 'সংলগাকর্ষণশক্তি' ইত্যাদি। তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্ভব শব্দের সমাসও ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—'স্ফটিকহওনকালে'।

নির্ঘন্ট অংশেই, সংস্কৃত ব্যাকরণের 'চ্বি' প্রত্যয়ের প্রয়োগ লক্ষিত হয় —'বাস্পীভাব', 'অগ্নীভাব' ইত্যাদি। ণিজন্ত তব্য প্রত্যয়ও ব্যবহৃত হয়েছে—'কথয়িতব্য'। ইন্ ও অনট্ প্রত্যয়ান্ত কৃদন্তপদ এবং ত্ব, তা ইত্যাদি তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত পদও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী শব্দের প্রভাবে ইন্ ভাগান্ত পদের অন্ত্যস্বরের হ্রস্বত্বও লক্ষ্য করা যায়—'অতিদূরবর্ত্তি হইলেও', 'আকর্ষণকারিবস্তুতে' ইত্যাদি।

ক্বচিৎ স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণ পদটিও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—'সংলাগাকার্ষণশক্তি লুপ্তা', 'সংলাগাকর্ষণশক্তি অতিদুর্বলা' ইত্যাদি।

স্বাভাবিক কারণেই এই গ্রন্থটিতে তৎসম শব্দের প্রাধান্য, তবু 'বৈলক্ষণ্যমাত্র', 'করণেক্ষম' প্রভৃতি শব্দ পাঠকের মনকে উচ্চকিত করে।

কখনও কখনও বাক্যরীতিতে আস্তিক্যদর্শনের বাগ্‌ভঙ্গী অনুসৃত হয়েছে—"এবং ঐ উষ্ণতার ব্যতিক্রম কেবল পরমাণুর নিবিড়ত্বের দ্বারা হয় এবং নিবিড়ত্বের ব্যতিক্রম দ্রব্যাকৃতির ব্যতিক্রম প্রযুক্ত হয়।" (পৃ-২৩) অথবা "যেহেতুক বস্তু সকল যে যে মতানুসারে সংলীন হয় তাহা না জানিলে মূলবস্তু কিম্বা সঙ্কর বস্তুর গুণজানা অসাধ্য অতএব সেই ব্যবস্থা প্রথম কথয়িতব্য"।

রসায়নশাস্ত্র তখন বঙ্গদেশে একটি নতুন বিদ্যা, য়ুরোপেও তখন রসায়ন বিদ্যার শৈশবমাত্র সুতরাং রসায়নশাস্ত্রে পরিভাষা রচনায় ম্যাক কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি অবশ্য ইংরেজিভাষায় প্রচলিত পরিভাষাগুলিই বাংলালিপিতে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন[৫০] কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁকে সংস্কৃতভাষারও সাহায্য নিতে হয়। পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন—(১) তৎসম শব্দগুলিকে যথাযথ ব্যবহার, যেমন—'সংলগাকর্ষণ', 'গলন', 'দ্রব', 'অগ্নীভাব' ইত্যাদি। এই সবক্ষেত্রে মূল সংস্কৃতধাতু বা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত কৃৎ বা তদ্ধিতপ্রত্যয় যোগ করা হয়েছে।[৫১] (২) তৎসম ও বিদেশী শব্দের যোগে জোড়কলম শব্দ গঠন করেছেন যেমন— 'প্রথমাক্লিদ', পরমাক্লিদ' ইত্যাদি। (৩) সংস্কৃত উপসর্গের সঙ্গে বিদেশী শব্দের যোগ, যেমন—'প্রখ্লোরিকাম্ল', এখানে প্র উপসর্গের সঙ্গে শব্দটি যুক্ত হয়েছে। (৪) বিদেশী শব্দে সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ, যেমন—নৈত্রয়িক।[৫২] (৫) সমাসের সাহায্যে পরিভাষাগঠন, যেমন—'উপগন্ধক্লামণ'।[৫৩]

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'বাংলার প্রথম রসায়নগ্রন্থ' প্রবন্ধে জন ম্যাকের কৃত রসায়নবিদ্যার পরিভাষার একটি তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকাভুক্ত অনেকগুলি শব্দ

এখনও বিজ্ঞানের পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়, যেমন—"তাপ-temperature, পরমাণু-atom, চুম্বকীয়গুণ-magnetism, দ্রব-liquid, স্থিতিস্থাপকীয় শক্তি-elasticity, আকর-source" ইত্যাদি। আচার্য ত্রিবেদী প্রদত্ত-তালিকায় একশসাতাশটি শব্দ সংযোজনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণকরা যেতে পারে যে উইলিয়ম কেরীও বিজ্ঞানবিষয়ক, বিশেষত উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ক বহু পরিভাষা রচনা করেছিলেন।

কিমিয়াবিদ্যা একান্তভাবেই বিজ্ঞানবিষয়ক বিদ্যা। কিন্তু উইলিয়ম কেরী যে সংস্কৃতানুগভাষার পরিপোষকতা করতেন, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য জন ম্যাকের গ্রন্থে তার যথাযথ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

কেরীর ছাত্রদের সংস্কৃত চর্চা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃতবিভাগের ছাত্ররাও সংস্কৃত রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের Public Disputation অনুষ্ঠানে সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র Mr. C. Gowan সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির নাম "সংস্কৃতভাষাভ্যাসস্য ফলান্যেতানি।"[৫৪] সংস্কৃতভাষার প্রশংসায় লেখক বলেছেন—"এষৈবভাষা কুমারিকাখণ্ডীয়সাধুভাষা এবং কুমারিকাখণ্ডস্থানাং বেদাদিধর্মশাস্ত্রাণি বিদ্যাচক্রে যা যা বিদ্যাঃ সন্তি তদ্বা জ্ঞানানি চ অনয়ৈব ভাষয়া লিখিতানি সন্তীতি মনসি নিশ্চিত্য প্রিয়বিদ্যাকানামুপরি ভাষাভ্যাসোহয়মধিকারং কর্ত্তুং শক্নোতি।"[৫৫]

এই সংস্কৃতভাষাই কুমারিকাখণ্ডের (ভারতবর্ষের) সাধুভাষা। কুমারিকাখণ্ডে বেদাদিশাস্ত্র এবং অন্যান্য যে সমস্ত বিদ্যা আছে, সেগুলি সবই এই ভাষায় লিখিত।

উইলিয়ম কেরীর অনুসরণে Mr. Gowan লিখেছেন—বাংলা প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতভাষা থেকেই জাত—"হিন্দুস্থানীয়াবঙ্গীয়াদাক্ষিণাত্যা যা যা ভাষাস্তাসর্ব্বভাষা-সংস্কৃতভাষাসম্মিলতাঃ সন্তি।"[৫৬]

উপসংহারে লেখক মহতী আশা পোষণ করেছেন যে সমস্তবিদ্যাই সংস্কৃতভাষায় মহতীবৃদ্ধি লাভ করবে।

১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের Public Disputations-এ বাংলা বিভাগের বিষয় ছিল—"Asiatics are capable of as high a degree of civilization as the Europeans" এই বিতর্কে প্রস্তাবের পক্ষে প্রধান বক্তা ছিলেন W.B. Martin.[৫৭] প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলেছিলেন—"যে এক মহাপুরুষ জগতের কর্ত্তা আছেন সে সহজ অনুভব। কিন্তু অন্য যত অনুভব প্রত্যক্ষের দ্বারা যে মতে অনুভবের বাহুল্য হয় এবং স্মৃতিতে থাকে এবং যুক্ত হয় সেই মত আমাদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি এবং বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়। যদি গ্রীষ্মশীতের সে পরাক্রম যাহা অনেক লোকে বলে তবে অবশ্য সে ইন্দ্রিয় করণক বাহ্যবস্তুর সন্নিকর্ষ হয় এবং যাহার

দ্বারা মনের প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হয় সে ইন্দ্রিয়ের গ্রীষ্মশীতেতে হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিম্বা যে সামর্থ্যে অনুভূতের স্মৃতি এবং একত্রকরণ হয় যে সামর্থ্যের নাশ হয়।" এই ভাষা আড়ষ্ট, অন্বয় সাবলীল নয়, বাক্যের গঠনে ইংরেজিভাষার প্রভাব প্রবল। কিন্তু ভাষা তৎসম শব্দ বহুল এবং যুক্তি পরম্পরা রচনায় সংস্কৃতভাষাকে অনুসরণ করা হয়েছে— "অনুভব প্রত্যক্ষের দ্বারা যে মতে অনুভবের বাহুল্য হয় এবং স্মৃতিতে থাকে' অথবা 'ইন্দ্রিয় করণক বাহ্যবস্তুর সন্নিকর্ষ' ইত্যাদি অংশ সংস্কৃতভাষায় লিখিত দর্শন শাস্ত্রের ভাষার ইঙ্গিত বহন করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলাগদ্য রচনার প্রয়াসের প্রারম্ভিক কাল, বিদেশীরা তখনও বাংলা বাক্যগঠনের মূল ধাঁচটি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারেননি।[৫৮] অপরদিকে কেরীর ক্রমশ এই ধারণা জন্মেছিল যে সংস্কৃত বহুল ভাষাই খাঁটি বাংলাভাষা, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে স্বতই সে ধারণা সঞ্চারিত হয়েছিল।

কেরী নিজেই শুধু ক্রমশ সংস্কৃতমনস্ক হচ্ছিলেন না, তাঁর অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের রচনাতেও তাঁর প্রভাবে সংস্কৃতঘনিষ্ঠতা দানা বাঁধছিল।

অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

সংস্কৃতসাহিত্যের প্রতি উইলিয়ম কেরীর অনুরাগ ও আকর্ষণ মিশনের অন্যান্য সভ্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। উত্তরকালে কেবল শ্রীরামপুর মিশনের সদস্যরাই নন, কলকাতার শিক্ষিত খ্রিস্টান সমাজের অনেকেই সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। উইলিয়ম ইয়েটস তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।[৫৯]

বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতেও সংস্কৃত বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত The Calcutta Christian Observer[৬০] পত্রিকায় (নব পর্যায়) ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত সম্পর্কে একটি আলোচনা স্থান পায়। আলোচনার শিরোনাম—"Is Sanskrit to be included in the course of studies for the Hindus in Calcutta University ?" এই আলোচনায় নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে সংস্কৃতশিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকৃতহয় এবং আলোচক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষাদানের স্বপক্ষে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এই পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রকেই সংস্কৃতবিদ্যায় সুপণ্ডিত করার বা সংস্কৃতশিক্ষার জন্য সময়সাপেক্ষ বিশাল পাঠ্যসূচী প্রবর্তনেরও সুপারিশ করেননি। তাঁরা একটি বাস্তব, গ্রহণযোগ্য শিক্ষাসূচী গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন যাতে দেশীয় ব্যক্তিরা তাঁদের মাতৃভাষাকে শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন এবং ইংরেজিভাষায় কৃতবিদ্য পুরুষরাও তাঁদের মাতৃভাষার যথার্থমূল্য অনুধাবন করতে পারেন;কারণ সংস্কৃতই অধিকাংশ ভারতীয়ভাষার জননী।[৬১]

এই পত্রিকায় সংস্কৃতশিক্ষার বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করে সেগুলিকে নিপুণভাবে খণ্ডন করা হয়েছে—"The study of Sanskrit is objected to by various persons on the following grounds, 1st : It is a dead language. True, but so are Latin and Greek. The study of classics in England and in America is continued and even extended. ....."[৬২]

সংস্কৃত মৃত ভাষা, গ্রিক এবং ল্যাটিনও তাই। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ক্ল্যাসিক সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত আছে। ঐ প্রস্তাবে সংস্কৃতশিক্ষার সমর্থনে আরও বলা হয়েছে, সংস্কৃত মৃতকল্পভাষা হলেও হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্রই তার অবস্থিতি অনুভব করা যায়। বাংলা, হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত—"Though the Sanskrit is dead, yet it lives and all the languages from Cape Comorin to the Himalayas are derived from it, and constantly draw on it for terms. In the Bengalee for instance, nine-tenth of the words are of Sanskrit origin. The same may be said of Hindi and Mahratta".[৬৩]

তাছাড়া য়ুরোপীয় সুপণ্ডিতগণ সকলেই একমত যে, কোন মৃতভাষা ভাষাতত্ত্ব এবং আধুনিক ভাষাশিক্ষার প্রধান উপকরণ।[৬৪] সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, এটি সংস্কৃত পঠন পাঠনের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান আপত্তি।[৬৫] পঠন পাঠনের পুরাতন ধারা অনুসরণ করে সংস্কৃতবিদ্যা আয়ত্ত করা সময়সাপেক্ষ ও অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, একথা সত্য। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অবলম্বন করে য়ুরোপে গ্রিক প্রভৃতি ভাষা সহজেই শিক্ষা দেওয়া হয়, সংস্কৃতভাষাও সেইভাবেই শেখানো যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়ম জোন্সের মত উদ্ধৃত হয়েছে—"Sanskrit is of wonderful structure more perfect than Greek, more copious than Latin and more refined than either."[৬৬] সংস্কৃত গ্রিকভাষা অপেক্ষা যথাযথ (নিখুঁত), ল্যাটিন ভাষার তুলনায় অধিক শব্দসম্পদপূর্ণ এবং উভয় ভাষা অপেক্ষা পরিমার্জিত। য়ুরোপের বিভিন্নদেশে সংস্কৃতের প্রচলন এবং সংস্কৃত পঠন-পাঠনের জন্য যে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আলোচনায় তারও উল্লেখ করা হয়েছে।

পত্রিকাটিতে অত্যন্ত খেদের সঙ্গে বলা হয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজে ল্যাটিন শিক্ষাদানের জন্য প্রোফেসরের পদ আছে অথচ শিক্ষিত হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।[৬৭]

উইলিয়ম কেরীর মতকে অনুসরণ করেই যেন আলোচক বলেছেন—"35000 words in Bengalee are derived from about 500 Sanskrit roots. The

study of a few Sanskrit book would give the students such a key to the meaning of words, as would give them a high power of analysis in language." তিনি আরও মন্তব্য করেছেন—"Besides translations, in the choosing of the terms they would find themselves quite au fait for the Bengalee Language, by the connection with the Sanskrit, a wonderful pliability in forming compound words. The scientific terms can be rendered easily and intelligibly into Bengalee from its connection with Sanskrit."[৬৮]

লেখক আরও বলেছেন সংস্কৃতভাষাজ্ঞান বাংলাভাষার জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দান করে, যথাযথ অনুবাদের সামর্থকে সমৃদ্ধতর করে এবং সঠিক পরিভাষা প্রস্তুতের পথ প্রশস্ত করে।[৬৯] শ্রীরামপুর মিশনে উইলিয়ম কেরী এবং তাঁর সহকারীরা এই সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তব ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন। লেখকও অবশ্য কেরী, উইলকিন্স, ইয়েটস, প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং কলকাতার ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টান সমাজের এই মুখপত্রে সংস্কৃতকে প্রবেশিকা ও উপাধি পরীক্ষায় অন্যতম বিষয়রূপে তালিকাভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারেও তাঁরা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলেছেন—"What we propose for consideration is the following—That for the Entrance Examination in the University, Hindu students be examined in William's Sanskrit Grammar and Iswar Chandra's Sanskrit Readers. .... And for the Degree Examination, two books be required, such as an expurgated edition on Kalidas's poem on six Hindu seasons, and the Raghuvamsa, a poem which gives much information on various geographical points and subjects connected with the ancient state of Hindu Society, and is studded with gems of exquisite poetical beauties. This list of studies for Entrance could easily be gone through, without interfering with other studies, it is simply designed as a foundation which the student can build on afterwards as much or as little as he likes."

হ্যালহেড, জোন্স প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞের সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের প্রশস্তি, উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃত সম্পর্কিত গ্রন্থাদি এবং সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের সৌন্দর্য ও তার উপযোগিতা সম্বন্ধে মুগ্ধ মন্তব্য ও ধারাবাহিক প্রচার, সকলশ্রেণীর মানুষকে বিশেষভাবে

বিদেশী ধর্মযাজকদের সংস্কৃতভাষার মহিমা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। উপরে উক্ত প্রস্তাব তারই ফলশ্রুতি।

পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ওয়ার্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"having now made himself master of the language of natives". অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃ-৩৫১।

২। পরে গ্রন্থটি চারিখণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩। Ward William , History Literature and the Mythology of the Hindoos etc. 3rd Edition, Delhi 1990. Vol. II, p. 179.

৪। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃ-৩৫৪।

৫। Periodical Accounts, তৃতীয় অধ্যায়ে পাদটীকা দেওয়া হয়েছে।

৬। Marshman J.C., প্রাগুক্ত p. 266.

৭। Chatterjee S.K., Felix Carey, Calcutta, 1991, p. 81.

৮। উইলিয়ম কেরীর দিনপঞ্জী-ফেব্রুয়ারি-১১-১৮, ১৮০৭ খ্রিঃ।

৯। Marshman J.C., প্রাগুক্ত Vol. I pp. 412-414.

১০। ফেলিক্স কেরীর ব্রহ্মদেশ যাত্রার ব্যাপারে উইলিয়াম কেরী ও উইলিয়ম ওয়ার্ডের সমর্থন ছিল না। ফেলিক্স ছিলেন প্রেসের কাজে অপরিহার্য।
Marshman J.C., প্রাগুক্ত Vol. I, p. 298.

১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, সাহিত্যসাধক চরিতমালা-৮৮ (২য় মুদ্রণ) কলকাতা, ১৩৯৬, পৃ-৩০।

১২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড, কলকাতা-১৩৪৪, পৃ-৬০।

১৩। তদেব, পৃ-৬০।

১৪। তদেব, পৃ-৬৮।

১৫। বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ ইউরোপীয় সর্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্বেদ শিল্পবিদ্যাদি মূলগ্রন্থাবলী or BENGALEE ENCYCLOPAEDIA/Being/ A series of/Elementary Works on the Arts and Sciences/দ্বিতীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ড স্মৃতিশাস্ত্র/Book II Part II/Law/ দ্বিতীয় নম্বর No. II March 1821/Serampore/Printed at the Mission Press.

১৬। সাহিত্যসাধক চরিতমালা—প্রাগুক্ত, পৃ-৪২।

১৭। তদেব, পৃ-৫৪।

১৮। Marshman J.C, প্রাগুক্ত, p. 266.
ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ফেলিক্স কেরী সম্বন্ধে লিখেছেন—"Undoubtedly the best Bengali scholar among his courtymen, especially in his knowledge of the idioms and construction of that language." সাহিত্য সাধক চরিতমালা - (৮৮), থেকে উদ্ধৃত, পৃ-৫৫।

১৯। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচ্ছদেও শ্লোকদুটি মুদ্রিত দেখা যায়। শ্লোক দুটির অনুবাদ সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৮৮) থেকে গৃহীত।

২০। ফেলিক্স কেরী, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

২১। ফেলিক্স কেরী, স্মৃতিশাস্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩।

২২। তদেব, পৃ-৯।

২৩। তদেব, পৃ-৫৩।

২৪। ফেলিক্স কেরীর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা থেকে এই পরিভাষাগুলি ইতস্তত গৃহীত হয়েছে। ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যায় ফেলিক্স দুর্বোধ্য পরিভাষা ব্যবহার করেছেন এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়। তিনি এমন অনেক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন যা আয়ুর্বেদশাস্ত্র পরম্পরায় এখনও প্রচলিত।

২৫। সাহিত্যসাধক চরিতমালা, প্রাগুক্ত পৃ-৩৬।

২৬। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ফেলিক্সের বাংলাজ্ঞানের প্রশংসা করলেও তাঁর বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এনেছেন।

Marshman, J.C., প্রাগুক্ত, p. 266.

২৭। সজনীকান্তদাস, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৪।

২৮। সজনীকান্তদাসের প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ-২৩৬।

২৯। তদেব, পৃ-২৫৪।

৩০। 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার এই প্রবন্ধটি জন মার্শম্যানের রচনা অনুমিত হয়। দিগ্‌দর্শনের বিভিন্ন সংখ্যা একত্রে বাঁধাই হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। আখ্যাপ ত্র—"দিগ্‌দর্শন/ অথবা/ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ/ ইং এপ্রিল ১৮১৮ ..... মার্চ ১৮১৯/এবং/ ইং- জানুয়ারি সাং এপ্রিল ১৮২০/ Serampore "Printed at Mission Press 1822" ইংরেজি আখ্যাপত্র—DIGDARSHAN/OR THE/INDIAN YOUTH'S MAGAZINE/ FROM APRIL 1818 TO MARCH 1819/ AND FROM JANUARY TO APRIL/ SERAMPORE/PRINTED AT MISSION PRESS/1822."

৩১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা ঃ (২য় খণ্ড) প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৯।

৩২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬৫।

৩৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, (১-২ সংখ্যা ১৩৯২) মৎলিখিত "বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৪। Asiatic Researches, Vol. XX. p. 325.

৩৫। 'নলোদয়' প্রভৃতি কতকগুলি গুণহীন কাব্য কালিদাসের নামে প্রচলিত ছিল। A.B. Keith তাঁর গ্রন্থে এইসব গ্রন্থের গ্রন্থকর্তা কালিদাস নন, এইমত প্রকাশ করেছেন।

Keith. A.B., A History of Sanskrit Literature, London. Reprint 1956. p. 97.

৩৬। Asiatic Researches, Vol. XX, p. 324.

৩৭। ইয়েটস 'নৈষধচরিত' কাব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছন্দগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—বৃত্ত ও জাতি ছন্দ। বৃত্তছন্দকে আবার সমবৃত্ত ও অর্ধসমবৃত্তে বিভক্ত করেছেন। অবশ্য এই বিভাগ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রেরই অনুসরণ। সমবৃত্ত ছন্দগুলিকে আবার অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্

ক্রমে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল ইত্যাদি অল্পাক্ষর ছন্দের সঙ্গে শার্দূলবিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি 'দীর্ঘপদের' ছন্দেরও উদাহরণ দিয়েছেন।

৩৮। Asiatic Researches, Vol. XX. p. 321.

৩৯। তদেব, p. 337.

৪০। কোন কোন লেখক মন্তব্য করেছেন Review on Naishadacharita..... ইত্যাদি প্রবন্ধে ইয়েটস নৈষধচরিতের শ্লোকগুলি ইংরেজি গদ্যে তর্জমা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্লোকগুলির অনুবাদ পদ্যে রচিত। Asiatic Researches এর XX খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৪১। Asiatic Researches, Vol. XX. Reprint p. 135.

৪২। আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শের তৃতীয় পরিচ্ছেদের যমকের উদাহরণের ২৪, ২৯, ৩১, ৩৫, ৩৬ সংখ্যক শ্লোকগুলি ইয়েটসের প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৩। Dandin, Kavyadarsa (Ed-Rongacharya Raddisastri), Poona, 1970. pp. 148-149.

৪৪। Asiatic Researches Vol. XX, (Reprint) pp. 146-157.

৪৫। তদেব, p. 157.

৪৬। আচার্য রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার গ্রন্থের সম্পূর্ণ পঞ্চম অধ্যায়টি 'চিত্র' কাব্যের আলোচনায় নিবেদিত। রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার (সম্পাদক-বামদেব শুক্ল) বারাণসী-১৯৬৬।

৪৭। যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৯৬)।

৪৮। Asiatic Researches এ প্রকাশিত, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, p. 558-59.

৪৯। ম্যাক জন, কিমিয়াবিদ্যাসার, শ্রীরামপুর, ১৮৩৪ ভূমিকা।

৫০। তদেব, ভূমিকা।

৫১। তদেব, ভূমিকা।

৫২। তদেব, ভূমিকা।

৫৩। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ শব্দকথা (রামেন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড) কলকাতা ১৩৫৬ পৃ-১৯৯-২০৩।

৫৪। Primitiae Orientales, p. 83.

৫৫। তদেব, p. 83. পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অনুষ্ঠিত Public Disputation (এবং Declamation) গুলি উল্লিখিত হয়েছে।

৫৬। Primitiae Orientales, p.86.

৫৭। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে পঠিত প্রবন্ধগুলি এবং বিতর্কসভায় প্রস্তাবকের বক্তব্য প্রায়ই সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক উইলিয়ম কেরীর বক্তব্যকেই অনুসরণ করেছে। Primitiae Orientales এবং টমাস রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংক্রান্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৫৮। এখনও বিদেশীরা অনেকেই স্বচ্ছন্দভাবে বাংলা লিখতে পারেন না। এমনকি ফাদার দ্যতিয়েনের মতো বাংলাভাষায় অভিজ্ঞ লেখক ও লেখেন—"আমার অনুমিতি এই যে....."ইত্যাদি। কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ-৩১।

৫৯। উইলিয়ম কেরীই ছিলেন উইলিয়ম ইয়েটসের বাংলা ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষার গুরু।

৬০। The/ Calcutta/ Christian Observer /edited by/ Christian Ministers of Various Denominations/Vol. XXVI Old Series– Vol-XVI New Series/Established in June 1832/January to December/ 1855.

৬১। Christian Observer, প্রাগুক্ত, p. 383.

৬২। তদেব, p. 383.

৬৩। তদেব, p. 383.

৬৪। তদেব, p. 384.

৬৫। এ সম্পর্কে বিখ্যাত সংস্কৃতগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের ভূমিকাংশে বলা হয়েছে—"অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুঃ....." ইত্যাদি

৬৬। Christian Observer, প্রাগুক্ত, p. 384.

৬৭। তদেব, p. 384.

৬৮। তদেব, p. 385.

৬৯। তদেব, p. 385.

নবম অধ্যায়

উইলিয়ম কেরীর প্রাসঙ্গিকতা

এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে কেরীর রচিত এবং সম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনার মাধ্যমে আমরা কেরীর সংস্কৃতঘনিষ্ঠমনটিকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি ভারতে আগমনের পরেই কেরী ব্যাকরণ রচনা ও অভিধান সংকলনে ব্যাপৃত হন। কেরীর আগমনের কিছুকাল আগে পর্যন্ত অনেক য়ুরোপীয় মনে করতেন হিন্দুস্থানীই ভারতের প্রচলিত ভাষা, বাংলা একটি উপভাষা মাত্র। উত্তরবঙ্গে বাসকালে কেরী লক্ষ্য করেন বাংলাভাষার একটি সাধুরূপ আছে, যা কেবলমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিরাই অবধারণ করতে পারেন, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে তার ফারাক বিস্তর। কেরী লিখেছেন—"One of my great difficulties arises from the common people being so extremely ignorant of their own language and the various dialects which prevail in the country." নিজেরভাষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা এবং নানা উপভাষার উপস্থিতি কেরীকে বিভ্রান্ত করে, তাই তিনি লিখেছেন—"Though I can preach an hour with tolerable freedom so that all who speak the language well or write, can perfectly understand me, yet the labouring people can understand little." উচ্চশ্রেণীর ও তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের ভাষার এই পার্থক্য কেরীকে কথঞ্চিৎ বিভ্রান্ত করে, এবং তিনি সংস্কৃতভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন, যাকে তিনি বলেছেন সমস্ত ভারতীয়ভাষার জননী। আমরা দেখিয়েছি উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃতভাষার সঙ্গে পরিচয় ক্রমশ সংস্কৃতমনস্কতায় পর্যবসিত হয়। অন্যান্য কারণ থাকা সত্ত্বেও মূলত সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগবশেই তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারে যত্নবান হন। কেরীর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের সমাজ তাঁর এই প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিল। কিন্তু দুশো বছর অতিক্রম করে প্রশ্ন উঠতে পারে কেরীর সংস্কৃতমনস্কতার ও সংস্কৃত প্রসারের প্রচেষ্টার কোন প্রাসঙ্গিকতা কি আজ বিদ্যমান, উইলিয়ম কেরীর সংস্কৃতপ্রীতি কি আজ কেবলমাত্র ঐতিহাসিক দলিলে পর্যবসিত হয়ে যায়নি!

জাতীয় সংহতি

উইলিয়ম কেরীর মনের অবচেতনে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে জাতীয় সংহতির একটি নিবিড় সংযোগ ছিল; অবশ্য 'জাতীয় সংহতি' শব্দটির সঙ্গে কেরীর পরিচয় ছিল না। আজ আমরা যে অর্থে 'জাতীয় চেতনা', 'জাতীয় সংহতি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি উইলিয়ম কেরী সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, সেই সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশেও তার প্রয়োজন ছিল না। কেরীর সমসাময়িক কালে জাতীয় সংহতির একটি 'অমূর্তভাব'ও (abstract idea) বিদ্যামান ছিল না। খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলিকে জয় করে ব্রিটিস সাম্রাজ্যবাদ তখন সবে ভারতের বুকে গেড়ে বসছে। কিন্তু আজ যখন ভারতের সংহতি বিশেষভাবে বিপন্ন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যখন বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার, বিচ্ছিন্নতাবাদ যখন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তখন আমরা কেরীর সংস্কৃত ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারি।

আমরা জানি ভাষা জনগোষ্ঠীর অত্যন্ত সুদৃঢ় বন্ধন। একই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব অনুভব করেন এবং বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে পারেন। বহুভাষাবিদ্ উইলিয়ম কেরী দেখিয়েছেন সংস্কৃতভাষা কিভাবে একই সূত্রে ভারতবর্ষকে ধারণ করে আছে। সংস্কৃত অভিধানের ভূমিকায় কেরী বলেছেন সংস্কৃত অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার জননী। এক সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে কথোপকথনের সাধারণ ভাষা ছিল সংস্কৃত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে মতবিনিময় করতে পারতেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সংস্কৃতভাষায় কথোপকথনে সমর্থ, এই তথ্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। একই ভাষার বন্ধন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে পারে। সংস্কৃত একটি প্রাচীন 'মৃত' ভাষা, সুতরাং ব্যবহারযোগ্য নয়, এই আশঙ্কারও কোন কারণ নেই। এখনও ভারতে এমন গ্রাম আছে, যে গ্রামের সমস্ত মানুষ সংস্কৃতভাষায় কথা বলেন, সংস্কৃতই তাঁদের যোগাযোগের ভাষা। শুধু তাই নয়, আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত সংস্কৃতে সংবাদ পরিবেষন করা হয়।

কেরীর মতে উত্তরভারতের অন্তত কুড়িটি ভাষার শব্দভাণ্ডার কোন না কোনওভাবে সংস্কৃতের সঙ্গে সংপৃক্ত। তিনি আরও মনে করতেন যে বর্তমানে উত্তরভারতে প্রচলিত ভাষাগুলির অধিকাংশেরই উৎস সংস্কৃতভাষা।

সংস্কৃত অভিধানের ভূমিকায় কেরী আরও দেখিয়েছেন যে দক্ষিণভারতের 'তেলেঙ্গা', 'কর্ণাট', 'তামিল', 'মালয়াল' প্রভৃতি ভাষার শব্দভাণ্ডারের প্রায় অর্ধেক সংস্কৃতভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে গৃহীত। কেরী প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন কি উত্তরভারতে কি দক্ষিণভারতে সর্বত্রই প্রচলিত ভাষাগুলি সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

সম্পর্কিত। এইভাবে কেরী সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে সমগ্র ভারতে একটি ভাষাগত ঐক্য কল্পনা করেছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত গ্রন্থাদি সাধারণত আঞ্চলিক লিপিতেই লিখিত হত। পরে সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনায় সাধারণভাবে দেবনাগরী লিপি প্রচলিত হয়। কেরী বলেছেন সংস্কৃতভাষা এইভাবে দেবনাগরী লিপির সাহায্যেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে।

উইলিয়ম কেরী সংকলিত বহুভাষা-শব্দকোষও সংস্কৃতভাষার ব্যাপক প্রচলনের প্রতি একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই কোষগ্রন্থে মূল সংস্কৃত শব্দকে অবলম্বন করে ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম বিভিন্ন প্রান্তের বারোটি ভাষার প্রতিশব্দ সংকলিত হয়েছে। কোষগ্রন্থে অনেকক্ষেত্রেই উত্তরভারতের ভাষাগুলির প্রতিশব্দ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অভিন্ন এবং দক্ষিণভারতের তামিল প্রভৃতি ভাষার প্রতিশব্দগুলি সামান্য পৃথক। এই কোষগ্রন্থখানি প্রমাণ করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে উইলিয়ম কেরী কতখানি অবহিত ছিলেন। অভিন্ন শব্দ ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহিত করে, আমরা কল্পনা করতে পারি সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। অকারণ অনুরাগে নিজের 'মনের মাধুরী মিশায়ে' সংস্কৃতভাষার যে সম্পদের প্রতি কেরী উত্তরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আজ সেখানে আমরা জাতীয় ঐক্যের বীজ অনুসন্ধান করছি। এশিয়া ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ 'ধর্মহীন' (হিদেন) মানুষের জন্য উইলিয়ম কেরীর মন করুণায় আপ্লুত হত। এই 'ধর্মহীন' মানুষদের খ্রিস্টধর্মের আলোকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য তিনি চঞ্চল হয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই ভারতে আসেন। তখন খ্রিস্টান যাজক সুলভ রক্ষণশীলতায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটিকে, বিভিন্ন বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যবর্গের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে এবং তাঁর দিনপঞ্জীতে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদি এবং কখন কখন এদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কেও কেরীর কঠোর মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে এদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হতে থাকে। ফলে হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিদ্বেষী মনোভাব অনেকাংশে হ্রাস পায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের পর কোলব্রুকের মতো প্রাচ্যবিদ্যাবিদের সংস্পর্শে এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো পণ্ডিতের সাহচর্যে তাঁর মনোভাবের আরও পরিবর্তন ঘটে। তাঁর এই পরিবর্তিত মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশীলনী অংশে। ছাত্রদের পাঠাভ্যাসের জন্য যে অনুশীলনীগুলি ঐ পুস্তকে সংযোজিত হয়েছে, সেগুলি শ্রীমদ্ভাগবত, ঈশোপনিষৎ এবং কেরীকৃত বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত। এই অনুচ্ছেদগুলিতে বৈষ্ণব, বৈদান্তিক ও খ্রিস্টান সকলেই

নির্বিবাদে সহাবস্থান করছেন। একজন নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান ধর্মযাজকের এই সহনশীল মনোভাব অবশ্যই অনুকরণের যোগ্য। কেবলমাত্র বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ থেকেই কেরী অনুশীলনীর জন্য অনুচ্ছেদ সংযোজন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি।

বর্তমানকালে বহুক্ষেত্রেই ধর্মচর্চা ধর্মোন্মাদনায় পর্যবসিত হয় এবং ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে সেদিক থেকে কেরীর সংস্কৃতব্যাকরণে অনুশীলনী-সংযোগ একাধিকধর্মের সমাবেশে আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে মনোভাব কেরী পোষণ করতেন তাও কম শিক্ষণীয় নয়। প্রধানত দেশীয় খ্রিস্টানদের সুশিক্ষার জন্য শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের পরিচালকরা মনে করতেন, য়ুরোপীয় মিশনারিদের হিন্দু পণ্ডিতরা য়ুরোপীয় বলেই সম্মান করেন, খ্রিস্টীয়-ধর্মশ্রাস্ত্রে তাঁদের পারঙ্গমতার জন্য নয়। সুতরাং ধর্মপ্রচারণায় দেশীয় খ্রিস্টানদের সংস্কৃতভাষা ও হিন্দুদর্শনের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন, কারণ হিন্দুদর্শন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারে তাঁরা পদে পদে পরাজিত হবেন এবং খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনে সমর্থ হবেন না।

ভারতের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় ভারতীয়দর্শন ও সংস্কৃতভাষার চর্চা এখন আরও প্রয়োজন, কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও আস্তিক্যদর্শনের যথার্থ অর্থগ্রহণ ও বোধ ধর্মান্ধদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। শাস্ত্র সম্পর্কে ধর্মান্ধদের প্রচারের সত্যাসত্যকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে পারলেই তাদের যুক্তির অসারতাকে প্রতিপন্ন করা যাবে এবং তাকে প্রতিহত করা যাবে। উইলিয়ম কেরী ও তাঁর যাজক ভ্রাতৃবৃন্দ হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করে খ্রিস্টের মাহাত্ম্য প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কালের পরিবর্তনে তাঁদের উদ্ভাবিত সেই পদ্ধতিকে ভিন্নতরভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আস্তিক্যদর্শনের যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে ধর্মের গোঁড়ামিকে পর্যুদস্ত এবং একই সঙ্গে মৌলবাদীদের মোকাবিলা করা যেতে পারে।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ঃ

উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদরূপে উইলিয়ম কেরীর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ছিল। শ্রীরামপুর ও কলকাতার পার্শ্ববতী অঞ্চলের উদ্ভিদাদির যে তালিকা উইলিয়ম কেরী প্রণয়ন করেন, সেই তালিকাটি এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাদি Dr. Vogit-এর Hortus Suburbanium Calcuttaensis গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ঐ পুস্তকের তালিকা থেকে আমরা বহুবৃক্ষের সংস্কৃত নামের পরিচয় পাই, যেমন-(১) অপাঙ্গ, (২) অরস, (৩) অলটচন্দন, (৪) আকাশবল্লী, (৫) ককজঙঘা, (৬) কঞ্জলতা, (৭) কর্মরঙ্গ প্রভৃতি। পুস্তকে সংস্কৃত নামের বৃক্ষলতাদির ল্যাটিন নামও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই সংস্কৃত নামগুলি উদ্ভিদবিজ্ঞানের পরিভাষা রচনায় পথপ্রদর্শক হতে পারে। এইসব উদ্ভিদাদির নাম

অনেকক্ষেত্রেই বৈদ্যক শাস্ত্রের ভেষজবিদ্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর ইদানীং আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্বন্ধীয় নানা গবেষণার সূত্রপাতও হয়েছে। সেদিক থেকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সংক্রান্ত এই পরিভাষা খুবই মূল্যবান।

বাংলাভাষা প্রসঙ্গে ঃ

কেরী একবার বলেছিলেন "বঙ্গীয়ভাষা স্বদেশীয়ভাষাবৎ প্রায়ো ময়া কথিতা আসতে", বাংলাভাষা তিনি প্রায় মাতৃভাষার মতোই বলতে পারতেন। এই উক্তি থেকে বাংলাভাষার প্রতি তাঁর অসাধারণ প্রীতি ও বাংলাভাষায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায়, চিঠিপত্রে, দিনলিপিতে কেরী প্রায়ই বাংলাভাষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং সংস্কৃতভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার নিবিড় সম্পর্কটি উৎঘাটিত করেছেন। বাংলাভাষায় সাহিত্যগুণের সম্ভাবনার যে অঙ্কুর উইলিয়ম কেরী লক্ষ্য করেছিলেন, সেই অঙ্কুর আজ পত্রপুষ্পশোভিত, মহীরুহে পরিণত মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তারই ফল। বিদগ্ধ, বুদ্ধিজীবীমানুষরা বাংলাসাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে আসন দিয়েছেন। পণ্ডিতব্যক্তিরা কিন্তু এখনও অনুভব করেন যে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান বাংলাভাষার জ্ঞানকে পুষ্ট করে; উইলিয়ম কেরী দুশ বছর আগেই এই তত্ত্ব অনুধাবন করেছিলেন।

অনুবাদ প্রসঙ্গ ঃ

শ্রীরামপুর মিশনের বিখ্যাত ত্রয়ী এবং মিশনের প্রেসকে কেন্দ্র করে বাইবেল অনুবাদের সুবিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদের সঙ্গে বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কেবল অন্যভাষার অনুবাদে সাহায্য মাত্র নয়, বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদেরই সুবিশাল সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছিল, যার নিজস্ব ধারা আজও অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত।

সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ঃ

কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত অভিধান (অপ্রকাশিত), বাংলাব্যাকরণ ও বাংলা-ইংরেজি অভিধান, বাংলাভাষায় রচিত অথবা সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ সবই বাংলাভাষাকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পুষ্ট করেছে। একথা সত্য বিবিধ ব্যাকরণ-অভিধানাদি রচনা ও সংকলনে এবং অনুবাদ কর্মে উইলিয়ম কেরী দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য গ্রন্থে লিখেছেন—
"কেরীর কৃতিত্ব হইতেছে উদ্যোগে, সঙ্কলনে....." (পৃ-৭৩)।

সংস্কৃতশিক্ষা প্রসারে কেরীর প্রচেষ্টাকে তাঁর মিশনারী ভ্রাতৃবৃন্দ সর্বপ্রকার সাহায্য

করেছিলেন। কিন্তু এত বিচিত্রধরণের ও ব্যাপককর্মের পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধেই ন্যস্ত ছিল, সেখানেই তিনি মহান কর্মযোগী। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—

"সিধ্যন্তি কর্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যা ঃ।
সম্ভাবনাগুণমবেহি তমশ্বীরানাম্"
(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—সপ্তম অঙ্ক, শ্লোক সংখ্যা-৪)

অধীনস্থ ব্যক্তিরা যে মহৎকর্মে সাফল্যলাভ করে, সে কেবল প্রভুর মহিমাগুণেই সম্ভব। উইলিয়ম কেরী অবশ্য কখনই নিজেকে প্রভু বা কোন ব্যক্তিকে অধীনস্থ মনে করেননি। ঈশ্বরই নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান ধর্মযাজক কেরীর একমাত্র প্রভু তাঁর বিনীত স্বভাব সকল সহকর্মীকেই সহযোগী, ভাই, বন্ধুর বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ ঃ

উইলিয়ম কেরীর চিন্তায় ও কাজে এমন কিছু কিছু দিক প্রকাশিত হয়েছে যা তাঁর ভাবনাকে জাতীয়স্তরে সীমাবদ্ধ রাখেনি, আরও ঊর্ধ্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সংস্কৃতের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপনের অভিলাষ উইলিয়ম কেরী পোষণ করতেন; সে কাজে তিনি কিছুটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। সংস্কৃতভাষায় লিখিত বিভিন্ন পুঁথি সংগ্রহের জন্য নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে একসূত্রে বাঁধার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। শ্রীরামপুর কলেজের নির্দেশিকা পুস্তিকায় চিনাভাষার জন্য শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব লক্ষ্য করা যায়—"The native officers shall include a chief Sungskrita Pundita, a second Pundita and Moulavee eminently skilled in Arabic, a chief Persian Moonshi, a teacher of Chinese and such Pundits and teachers as shall be found requisite for various classes." বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর কলেজে চিনাভাষা শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল, জোশুয়া মার্শম্যান নিজে চিনাভাষা ভালভাবে শিখেছিলেন এবং চিনাভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কনফুসিয়সের দর্শন সম্পর্কে চিনাভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন। ১৮১৪ সনে চিনা-ভাষা-শিক্ষা-পদ্ধতি এবং ১৮৩৮ সনে চিনাভাষায় লিখিত অপর একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

উইলিয়ম কেরীর পরম আকাঙ্ক্ষা ছিল পূর্বএশিয়ায় প্রচলিত বিভিন্নভাষার সঙ্গে সংস্কৃত, আরবি ও চিনাভাষার সাহায্যে একটি সংযোগ সূত্র রচনা করা—"A knowledge of three languages Sungskrita, Arabic and Chinese lay the foundation of an acquaintance with nearly all the dialects of Eastern Asia." চিনাভাষার সাহায্যে ভারতের কিছু কিছু নষ্ট সম্পদকে উদ্ধার করাও তাঁর

অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ও চিনাভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কোন কোন সংস্কৃতগ্রন্থ কালক্রমে নানাকারণে নষ্ট হয়ে যায়। কেরী চিনা তর্জমা থেকে নষ্ট গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃতভাষায় পুনরনুবাদ করাতে চেয়েছিলেন। আধুনিককালে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই প্রচেষ্টায় অনেকখানি সফল হয়েছিলেন। সংস্কৃতের নষ্টভাণ্ডার উদ্ধারের কাজে কেরী শ্যাম ও ব্রহ্মদেশীয় ছাত্রদের অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন পূর্বএশিয়ার এইসব দেশের ছাত্ররা সহজেই চিনাভাষা শিখতে পারবেন এবং তাঁরা যদি একই সঙ্গে সংস্কৃতভাষাতেও ব্যুৎপন্ন হন, তবে চিনাভাষায় অনূদিত সংস্কৃত গ্রন্থকে পুনরায় সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত করা তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে। কেরী তাঁর বহুভাষা-কোষ-গ্রন্থে গ্রিক ও হিব্রু ভাষার শব্দাবলীও সংযোজনা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। তবে শ্রীরামপুর কলেজে গ্রিক ও ল্যাটিনভাষা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থকে সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত করার বাসনাও কেরীর ছিল। তিনি মনে করতেন সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় বুদ্ধি পরিপক্ক এবং মন পরিণত হয়। সেই পরিণত মন ও পরিপক্ক বুদ্ধি সহজেই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ। শ্রীরামপুর কলেজের নির্দেশিকা পুস্তিকায় এ সম্পর্কে অনুশাসনও ছিল।

এইভাবে সংস্কৃতভাষার সহযোগীরূপে আরবি ও ফারসি ভাষা এবং চিনাভাষা শিক্ষার বিধিবিধান নির্দ্দিষ্ট করে কেরী একদিকে যেমন পশ্চিম এশিয়া, অপরদিকে পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ নিবিড়তর করতে চেয়েছিলেন। আবার গ্রিক ও ল্যাটিনভাষা চর্চার সাহায্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকেও ভারতীয় ঐতিহ্যের নিকটবর্তী করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজিভাষায় লিখিত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পুস্তক সংস্কৃতভাষায় অনূদিত হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণতর করবে। ভাষা ও জ্ঞানচর্চার এই মহাসত্রে চিন, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অধিবাসী এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার মানুষও সমবেত হবেন।

উইলিয়ম কেরী এইভাবে সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে জাতীয়স্তরকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্তরে ভারতবর্ষকে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য আন্তর্জাতিকতা বর্তমান যুগে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে শব্দটি জানা উইলিয়ম কেরীর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। কিন্তু মনের গভীরে একধরণের বিশ্বনাগরিকত্ব তিনি অনুভব করতেন।

উইলিয়ম কেরী মনে করতেন ভারতবর্ষই তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ এবং বাংলাভাষা দ্বিতীয় মাতৃভাষা। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কলকাতায় আগমনের পর উইলিয়ম কেরী আর কখনও স্বদেশে পদার্পণ করেননি। তিনি নিজেই বলেছেন—"...... my heart is wedded to India." তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ ভারতবর্ষকে ভৌগলিক সীমারেখায়

আবদ্ধ না রেখে, সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব রচনার যে প্রয়াস তিনি করেছিলেন তাকে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মতো উইলিয়ম কেরীও ভারতবাসীর চিত্তে চিরদিন অম্লান থাকবেন—

"হেয়ার-কল্বিন-পামারশ্চ-কেরী-মার্শম্যানস্তথা।
পঞ্চগোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশকম্।।"

পরিশিষ্ট-১

অভিধান পরিচয়

অমরকোষ ঃ

অমরসিংহ রচিত নামলিঙ্গানুশাসন বা অমরকোষ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কোষগ্রন্থ। এই কোষগ্রন্থটি বহুপ্রচলিত। যদিও যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে নিঘন্টু অংশে বৈদিক শব্দাবলীর একটি তালিকা আছে, কিন্তু ক্ল্যাসিকালযুগের সংস্কৃত কোষগ্রন্থগুলির সঙ্গে তার পার্থক্যও আছে। অমরসিংহ সম্ভবত বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর সঠিক কালনির্ণয় করা যায়না, তবে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আগেই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল; কারণ ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি অমরকোষের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কোষগ্রন্থটি বিষয়ানুক্রমিকভাবে সজ্জিত, তিনখণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থের পরিশিষ্টে একাক্ষরকোষ, সংখ্যাদিকোষ সংযোজিত হয়েছে। অমরকোষের অনেকগুলি টীকা রচিত হয়। বন্দ্যোঘটীয় সর্বানন্দ খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অমরকোষের একটি টীকা রচনা করেন। এই সর্বানন্দ বাঙালি ছিলেন। অমরকোষের অপর টীকাকার ভরতমল্লিক সম্ভবত বাঙালি।

ত্রিকাণ্ডশেষ ঃ

ত্রিকাণ্ডশেষ নামক কোষগ্রন্থের রচয়িতা পুরুষোত্তমদেব। গ্রন্থটিতে তিনটি কাণ্ড আছে, কাণ্ড আবার বর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার অমরসিংহের বিখ্যাত কোষগ্রন্থের অনুসরণ করেছেন, প্রারম্ভিক শ্লোকে তারই পরিচয়—

"বর্গক্রমস্তথানামলিঙ্গয়োস্ত্রূপদেশতা।
পরিভাষাদিকং সর্বমত্রাপ্যমরকোষবৎ।।"

হারাবলী ঃ

হারাবলী কোষগ্রন্থের সংকলকও পুরুষোত্তমদেব। অধ্যাপক কীথের মতে হারাবলী ত্রিকাণ্ডশেষের বারো বৎসর পর সংকলিত হয়। এই কোষগ্রন্থটি ত্রিকাণ্ড শেষের তুলনায় ক্ষুদ্রাকৃতি। কোষগ্রন্থটিতে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে বিভিন্ন শব্দের প্রতিশব্দ সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থও সংকলিত হয়েছে। কোষকার বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বহুশব্দ সংকলন করেছেন।

'একাক্ষরকোশ', 'দ্বিরূপকোশ' প্রভৃতি কোষগ্রন্থগুলিরও সংকলক পুরুষোত্তমদেব। অধ্যাপক কীথ পুরুষোত্তমদেবের কালনির্ণয় করেননি।

অভিধানচিন্তামণি ঃ

অভিধানচিন্তামণি নামে কোষগ্রন্থটির সংকলক হেমচন্দ্র। পুস্তকটির নাম অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হওয়ার জন্যই বোধ হয় সংকলক হেমচন্দ্রের নামে কোষগ্রন্থটির উল্লেখ করা হয়। হেমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থকে 'নামমালা' আখ্যাও দিয়েছেন। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণির প্রতিটি কাণ্ডের শেষে নামমালা শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে—"ইত্যাচার্যহেমচন্দ্রবিরচিতায়ামভিধানচিন্তামণৌ নামমালায়াং দেবাদিদেবকাণ্ডঃ প্রথমঃ।......অভিধানচিন্তামণৌ নামমালায়াং মর্ত্যকাণ্ডস্তৃতীয়।" গ্রন্থটি ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত, প্রথমখণ্ডে জৈন দেবতাদের নাম। শেষখণ্ডে বিশেষণপদ ও নানা কৃদন্তপদের সংকলন। গ্রন্থটি আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত।

রত্নমালা ঃ

'রত্নমালা' নামটি সম্ভবত 'অভিধানরত্নমালা'র সংক্ষিপ্ত নাম। বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও কবি হলায়ুধ অভিধানরত্নমালা রচনা করেন, রচনাকাল দশমশতক। হলায়ুধের অভিধানের শব্দের বিন্যাসের সঙ্গে উইলিয়ম কেরীর অপ্রকাশিত অভিধানের শব্দবিন্যাসের সাদৃশ্য দেখা যায়। হলায়ুধের অভিধানমালার প্রথম শব্দটি 'অসুর'। কেরীর অপ্রকাশিত বহুভাষাকোষগ্রন্থের প্রথম শব্দটিও 'অসুর'। হলায়ুধের মতো কেরীও দেবতাদের প্রহরণবাচক শব্দগুলি, যেমন, 'সুদর্শন', 'কৌমদকী' ইত্যাদি একই সঙ্গে বিন্যাস করেছেন। তবে হলায়ুধ সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম জানিয়ে গ্রন্থারম্ভ করেছেন; সুতরাং অমঙ্গলসূচক 'অসুর' শব্দ প্রারম্ভে থাকায় ঐতিহ্যের ক্রমকে লঙঘন করা হয়নি।

নানার্থরত্নমালা ঃ

অধ্যাপক কীথের মতে নানার্থরত্নমালা নামে কোষগ্রন্থটি হরি নামক কোন রাজার সেনাপতি ইরুগপের দ্বারা সংকলিত হয়েছিল অথবা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলিত হয়েছিল। অধ্যাপক কীথ কোষকারের নাম উল্লেখ করেননি। রত্নমালা সম্ভবত নানার্থরত্নমালা কোষগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম।

অনেকার্থকোষ ঃ

অনেকার্থকোষ গ্রন্থের সংকলক মেদিনীকর। অভিধানটি অবশ্য সংকলকের নামে 'মেদিনী' আখ্যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়। সংকলনটির নানার্থকোষ এই

নামান্তরও পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সংকলিত। টীকাকারগণ অমরকোষের সঙ্গে মেদিনীর উল্লেখ করে থাকেন। অমরকোষে একটি শব্দের অনেকগুলি প্রতিশব্দ সন্নিবিষ্ট হয়েছে, আর মেদিনীতে সমোচ্চারিত শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সংকলিত। অমরকোষ ও মেদিনী যেন পরস্পরের পরিপূরক। তাই টীকাকাররা প্রায়ই একসঙ্গে দুটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

বিশ্বপ্রকাশ ঃ

বিশ্বপ্রকাশ কোষগ্রন্থটি সাধারণত 'বিশ্ব' নামে পরিচিত। সংকলক মহেশ্বর। গ্রন্থটি সম্ভবত ১০৩৩ শকাব্দে সংকলিত হয়েছিল। গ্রন্থকার বৌদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধদেবকে প্রণতি জানিয়ে গ্রন্থারম্ভ হয়েছে। বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ বারংবার 'বিশ্ব'-এর উল্লেখ করেছেন। কোষগ্রন্থটি বর্ণানুক্রমিক, তবে আদিবর্ণ অনুসারে নয় অন্ত্যবর্ণানুসারে শব্দগুলি বিন্যস্ত হয়েছে, যেমন— 'কৈককম্', 'কদ্বিকম্, 'কত্রিকম্' ইত্যাদি ক্রমে ছয় অক্ষর পর্যন্ত শব্দ সংকলিত হয়েছে, অর্থাৎ একটিমাত্র ক অক্ষরান্ত্য শব্দ, দুটি অক্ষরের শব্দ যার শেষবর্ণ ক, এইভাবে পর্যায়ক্রমে ছয় অক্ষর পর্যন্ত। ককারদিক্রমে হকারান্ত্য পর্যন্ত, একাক্ষর থেকে ছয়অক্ষর পর্যন্ত শব্দ পুস্তকটিতে সংকলিত হয়েছে। অব্যয়বর্গের একটি পৃথক তালিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

শব্দরত্নাবলী ঃ

শব্দরত্নাবলী জনৈক মথুরেশ রচিত। পুস্তকটি ১৯৭০ সনে প্রকাশিত হয়, প্রকাশক এশিয়াটিক সোসাইটি। পণ্ডিত মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী অভিধানটি সম্পাদনা করেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী যে পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন, সেটি ১৬২৬ শকাব্দে রচিত, লিপিকর সম্ভবত বিনোদানন্দ শর্মা, কারণ পুঁথির শেষে স্বত্বাধিকারীরূপে তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করেছেন।

শব্দরত্নাবলীর সংকলক মথুরেশের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুসাখান, তিনি উত্তরবঙ্গের একজন প্রধান ভূস্বামী ছিলেন। মথুরেশ প্রতিবর্গের শেষে লিখেছেন "মহারাজ শ্রীযুত মুছাখানমশলন্দএল্লি"-র দ্বারা বিরচিত। প্রারম্ভিক তিনটি শ্লোকে মথুরেশ পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসা করেছেন এবং নিজের পরিচয়ও দিয়েছেন। এই মুসাখান ঈশাখানের পুত্র, ঈশাখান ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। সুতরাং অভিধানটি সপ্তদশ শতাব্দীতেই সংকলিত হয়েছিল। শব্দরত্নাবলী একুশটি বর্গে সমাপ্ত;স্বর্গ, পাতাল, ভূমি ইত্যাদি ষোলটি বর্গে প্রতিশব্দ সংকলিত হয়েছে। 'খান্তবর্গ' অর্থাৎ খকারান্ত শব্দ, 'গান্তবর্গ', ইত্যাদি ক্রমে 'হান্তবর্গ' পর্যন্ত বিভিন্ন শব্দের অর্থ সংকলিত হয়েছে। শেষ চারিটি বর্গ—'স্বরবর্গ', 'অব্যয়বর্গে নানার্থবর্গ', 'অব্যয়বর্গে একার্থবর্গ' এবং 'স্ত্রীলিঙ্গসংগ্রহ।'

শব্দরত্নাবলী পূর্বাঞ্চলে সংগৃহীত কোষগ্রন্থগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। গ্রন্থটি বহুল প্রচলিত ছিল। উইলিয়ম কেরী তাঁর অপ্রকাশিত সংস্কৃত অভিধানে শব্দরত্নাবলী থেকে সর্বাধিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মনে হয় উত্তরবঙ্গে অবস্থানকালে তিনি এই কোষগ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির সংস্পর্শে এসেছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত অভিধানটিতে আচার্য সুকুমার সেনের একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে।

অন্যান্য অভিধান ঃ

রাজা রাধাকান্তদেবের সংকলিত শব্দকল্পদ্রুমের ভূমিকা থেকে আরও কিছু কোষকার ও কোষগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। শব্দচন্দ্রিকা কোষগ্রন্থের সংকলক চক্রপাণিদত্ত। জটাধরের গ্রন্থের নাম পর্যায়নামার্থকোষ। ভূমিকা থেকে জানা যায় গ্রন্থকার অমরকোষেরই অনুসরণ করেছেন এবং অভিধানটির প্রচারও খুব বেশি ছিলনা—"জটাধরোঽপি অমরকোষস্য অনুকরণং কৃতবান্ ইতি বিরল প্রচার।" বোপদেবের গ্রন্থের নাম কবিকল্পদ্রুম এবং শব্দমালার লেখক পরাশর শর্মা। এই কোষগুলি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও প্রচলিত ছিল। রাজা রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুমের ভূমিকায় উল্লিখিত উপরে উক্ত কোষগুলির সন্ধান আমরা পাইনি, সেগুলি আমাদের অগোচরেই থেকে গেছে। উইলিয়ম কেরীর অপ্রকাশিত অভিধানের পাণ্ডুলিপিতে বক্তব্যের সমর্থনে উক্ত কোষগ্রন্থগুলি প্রায়ই উদ্ধৃত হয়েছে।

পরিশিষ্ট - ২

শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা

শ্রীরামপুর মিশনের Instruction for the College for the Asiatic Christian ইত্যাদি নির্দেশিকা পুস্তিকার দ্বিতীয় প্রতিবেদন থেকে (১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে) গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুঁথি ও পুস্তক সম্বন্ধে জানা যায়—"The accession made in the past year to the College Library consists chiefly of works in Sunguskrita and the popular languages of India."

ঐ প্রতিবেদনে গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পুস্তকের তালিকাও আছে। তালিকার অন্তর্ভূক্ত সংস্কৃত অথবা সংস্কৃত সম্পর্কিত পুস্তকগুলির তালিকা নিম্নে উৎকলিত হল—
"Bibles and Testaments—Sunguskrita Hagiographa, Sunguskrita Poetical Books; Sunguskrita New testament.

Grammar and Dictionaries—

Sunguskrita Grammar, Manuscript, 1819.

Sunguskrita Grammar, Printed at Rome, 1730."

অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা—

"Sunguskrita Manuscripts—

Rigveda 5 vols.
Samaveda 4 vols.
Yajoorveda 2 vols.
Vedanta Sara.
Chhundus or Grammar of Veda.
Linga Poorana.
Koorma Poorana.
Nura-singho Poorana.
Kalika Poorana.
Padma Poorana.
Brihunnaradeeya Poorana.
Shiva Poorana.
Vishnoo Poorana.
Kalki Poorana.
Skunda Poorana.
Brumha Poorana
Brumha-Vivarta Poorana.
Buraha Poorana.
Vedartha Prukasha.
Nirookta Shusthadhyaya.
Bhrigoo Sootra.
Nama Mala.
Tantrasara.
Brihudarunykopanisat.

Chandgopanishuda.
Easa Basya etc.
Saruswatha Vyakuruna.
Naishada.
Unekarth Manjuree.
Riksunghita Meemangsa.
Jatadhara Kosha.
Umarakosha Koumoodee.
Umarakosha.
Jyotistutwa.
Kriyayogasara.
Laghoo Deepika.
Itihasa Sumoochuya.
Madhyundinuya Shakha
Sutapatha Bhraman.
Chutoorthasutaka.
Sankhya Sara.
Muntramuhodudhi.
Satkurma Deepika.
Ganga Vakyavulee.
Udbhoota Ramayana
Ootura-kanda.
Ooturakando. Ditto.
Ramayuna Teeka.
Bramha Sootra.
Hitopudesha.
Gayutree Tantra. 4 copies.
Leelavatee with its Commentary.
Soorya Siddhanta.
Muka Bhaguvata.
Meemansa Bhashya.
Siddhantu Koumoodee.
Moogdhubadha Teeka.
Yookti Kulpaturoo.
Sooktikurunamrita.
Umurakosha.
Pranakrishnakaryamboodhi.
Geeta Govinda.
Bhugavata Geeta.
Chandee.
Umuroosutaka.
Ghutukurpura.
Hemuchundru.
Kaumoodee Vyakuruna.
Panini.
Bharuvi.
Munoo.
Dayv-bhaga, with commentary.
Hitopudesh.
Dushkoomarukuthasara.
Bhutrihuri."

গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা, ইংরেজি বা অন্যান্যভাষার পুঁথি ও পুস্তক এখানে সংযোজিত হয়নি।

পরিশিষ্ট - ৩

উইলিয়ম কেরীর সমসাময়িক শ্রীরামপুর মিশনের লেখক পরিচিতি

ফেলিক্স কেরী (১৭৮৬-১৮২২)

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নরদাম্পটনশায়রের অন্তর্গত মৌলটন গ্রামে উইলিয়ম কেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্সের জন্ম হয়। উইলিয়ম কেরী যখন খ্রিস্টধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ডাঃ টমাসের সঙ্গে সপরিবারে বাংলাদেশ যাত্রা করেন তখন ফেলিক্স কেরীর বয়স মাত্র সাড়ে ছয়। বাংলাদেশে আগমনের পর অসহায় কেরী, অস্থির জীবনযাত্রায় জীবিকার সন্ধানে ইতস্তত ভেসে বেড়ান। এই অবস্থায় বালক কেরী বারংবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। মদনাবাটিতে গ্রামের সাধারণমানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার ফলে অতিদ্রুত তিনি বাংলাভাষা শেখেন। উইলিয়ম কেরীর বাইবেলের বাংলা অনুবাদের কাজে বালক ফেলিক্স পিতাকে সাহায্য করতেন।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পর ফেলিক্সের প্রথাগত শিক্ষা শুরু হয়। অপরদিকে তিনি মিশনের প্রেসে উইলিয়ম ওয়ার্ডের সহকারী ছিলেন। ওয়ার্ড তখনও ভাল বাংলা জানতেন না, ফেলিক্স তাঁকে হরফ সাজানোর কাজে সাহায্য করতেন। এই কাজ ফেলিক্সের খুবই ভাল লাগত। ক্রমে ফেলিক্সের সাহায্য শ্রীরামপুর মিশনপ্রেসের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠে।

বাল্যকাল থেকেই অর্ধোন্মাদ মাতা ডরোথির স্নেহ থেকে বঞ্চিত ফেলিক্স অস্থিরচিত্ত ও একগুঁয়ে হয়ে উঠেন। জোশুয়া মার্শম্যান ফেলিক্সকে স্নেহভরে 'শার্দূল' সম্বোধন করতেন। ১৮০০ সনের ডিসেম্বর মাসে পিতা উইলিয়ম কেরী স্বয়ং ফেলিক্সকে গঙ্গার জলে দীক্ষা দেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি ফেলিক্সকে সোসাইটির পাদরি নিযুক্ত করেন। কিন্তু গ্রামে গ্রামে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করা অপেক্ষা প্রেসের কাজেই তাঁর অনুরাগ বেশি ছিল।

বিজ্ঞানের নানাবিষয়ে ফেলিক্স কেরীর সহজাত প্রবণতা ছিল। ১৮০৬ সনে ডাঃ টেলর নামে একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীরামপুরে আসেন। ফেলিক্স তাঁর কাছে চিকিৎসাবিদ্যা শেখেন। অস্ত্রোপচারবিদ্যা ফেলিক্স বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন, "তিনি

কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত পাকাইতে থাকেন।" ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ফেলিক্স মার্গারেট কিনসিকে বিবাহ করেন।

ব্রহ্মদেশে ব্যাপটিস্টমিশনকে সুগঠিত করার জন্য ফেলিক্স রেঙ্গুন গমন করেন। ব্রহ্মদেশে তিনিই প্রথম বসন্তরোগের টিকার প্রচলন করেন। বসন্তের টিকা দিয়ে তিনি ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের আস্থাভাজন হন।

১৮০৯ সনে ফেলিক্সের পত্নীবিয়োগ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর মিশনের আশ্রয়ে শিশুসন্তানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে ফেলিক্স ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পিতা উইলিয়ম কেরীর মতোই ফেলিক্সেরও ভাষাশিক্ষার প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি পালি ও ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শেখেন এবং ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় সেন্ট ম্যাথুর মঙ্গলসমাচারের তর্জমা ও কয়েকটি পালি সুত্তের অনুবাদ করেন। ফেলিক্স ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় অভিধান সংকলনও করেছিলেন। ভাষাশিক্ষার সুবিধার জন্য ফেলিক্স ব্রহ্মভাষাভাষী পোর্তুগীজ কন্যা শ্রীমতী ব্ল্যাকওয়েলকে বিবাহ করেন।

ফেলিক্সের প্রদত্ত বসন্তরোগ-প্রতিরোধক টিকা খুব জনপ্রিয় হয় এবং রাজধানী আভায় টিকাদানের জন্য ফেলিক্স আহূত হন। উইলিয়ম কেরীও ছাপার কাজের সুবিধার জন্য রেঙ্গুনের মিশনে একটি মুদ্রণযন্ত্র পাঠান। মুদ্রণযন্ত্র এবং রচিত ও অনূদিত পুস্তকাবলী সমেত সপরিবারে আভা যাত্রার সময় ইরাবতী নদীতে নৌকাডুবির ফলে ফেলিক্সের স্ত্রীপুত্রকন্যার মৃত্যু হয়। মুদ্রণযন্ত্র এবং পুস্তকাবলীর সলিল সমাধি ঘটে। ফেলিক্স কোনক্রমে আভায় উপস্থিত হন, তখন তাঁর অর্ধোন্মাদ অবস্থা। আভার রাজা ফেলিক্সের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করেন এবং তাঁকে রাজদূত নিযুক্ত করেন। রাজদূতের পদে নিযুক্ত হয়ে ফেলিক্স কলকাতায় আসেন এবং অত্যন্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সঙ্গে জীবনযাপন আরম্ভ করেন। উইলিয়ম কেরী যাজকপুত্রের রাজদূতে রূপান্তরকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি; অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা ফেলিক্সের ছিলনা, ফলে অচিরেই তিনি ব্রহ্মদেশীয় রাজার বিরক্তিভাজন হন, এমনকি তাঁর প্রাণসংশয় ঘটে। ফেলিক্স ব্রহ্মদেশ থেকে পলায়ন করেন এবং ভারতবর্ষের পূর্বাংশে অরণ্যবেষ্টিত পার্বত্যাঞ্চলে পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে বাস করতে থাকেন। এইসময় তিনি সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চল ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ান; তিনি চিনদেশে গমনেরও চেষ্টা করেন; কিন্তু পথের দুর্গমতার জন্য চিনযাত্রা সম্ভব হয়নি। উইলিয়ম ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যান। সেখানে ফেলিক্সের দেখা পান, ফেলিক্স তখন অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। ওয়ার্ড ফেলিক্সকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামপুরে ফিরে আসেন। ফেলিক্স আবার প্রেসের কাজে যোগদান করেন, কিন্তু আর পাদরিত্ব গ্রহণ করেননি। এই সময় তিনি বাংলা গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সহায়তায় 'দিগ্‌দর্শন' মাসিক

পত্রিকা প্রকাশ করেন। দিগ্‌দর্শনই বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। অনুমান করা হয় এই পত্রিকার বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধগুলি ফেলিক্সের রচনা। 'বিদ্যাহারাবলী'র প্রথম খণ্ড 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'ই তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর ফেলিক্সের জীবনাবসান ঘটে।

মাত্র চারবৎসর ফেলিক্স বঙ্গসরস্বতীর সেবা করেন, বাংলাগদ্যের সেই প্রস্তুতিপর্বে তিনি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে স্বীকৃত হন। বাংলাভাষায় ফেলিক্সই প্রথম বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। তিনি বাঙালির মতো বাংলাভাষা বলতে ও লিখতে পারতেন। তাঁর সমসাময়িক কোন য়ুরোপীয়ই বাংলাভাষাজ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ ছিলেননা। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্যে বিশেষত বাংলাভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুর পর 'সমাচারদর্পণ' লেখেন—"মোকাম শ্রীরামপুরে ফেলিক্স কেরী সাহেব ১০ নভেম্বর রবিবার বেলা তিনপ্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বর্ম্মা প্রভৃতি নানা বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণত্বরূপে বহুদেশ ব্যাপিনী ছিল.......আর কয়েকরমক ভাষাতে বাইবেলের পুরুপ পড়িতেন।"

ফেলিক্স কেরী সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস বলেছেন—"অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদবিদ্যার মতো সম্পূর্ণ অভিনব পরিভাষা যে তিনি একান্ত নিজের চেষ্টায় সংস্কৃতভাষার রত্নভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন ইহা কমশক্তির পরিচায়ক নহে। বস্তুত সকলদিক বিচার করিয়া তাঁহাকে বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলিলে অন্যায় হয়না।"

জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭)

জোশুয়া মার্শম্যান ও হানা মার্শম্যানের পুত্র জনক্লার্ক মার্শম্যান ব্রিস্টলে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের বহুগুণের অধিকারী সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। শ্রীরামপুর মিশনের বিদ্যালয়েই তাঁর শিক্ষা। পরে ১৮২২ সনে য়ুরোপীয় ক্ল্যাসিক সাহিত্যে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি গ্রিস ও ইটালি দেশে যাত্রা করেন, কিন্তু শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সর্বময় কর্তা উইলিয়ম ওয়ার্ডের আকস্মিক মৃত্যুতে উইলিয়ম কেরীর আদেশে তিনি শ্রীরামপুরে ফিরে আসেন। পিতার মতোই তরুণ মার্শম্যান চিনাভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের তিনি ছিলেন প্রিয়শিষ্য; বিদ্যালঙ্কারের কাছে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সংস্কৃতসাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যেও তাঁর সহজাত অধিকার ছিল।

শ্রীরামপুরে কাগজের কল পরিচালনায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। শ্রীরামপুর কলেজের পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সক্রিয়। উইলিয়ম কেরীর অবসর গ্রহণের পর সরকারী অনুবাদকের পদটিও তিনি লাভ করেন। তরুণ (জুনিয়র) মার্শম্যান ফেলিক্স

কেরীর সহযোগিতায় 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁরই উৎসাহে ও সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ সনের ২৩শে মে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশিত হয়। তাছাড়া 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার কার্যত তিনিই সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীকালে সরকারী মুখপত্র 'গভর্নমেন্ট গেজেটে'র সম্পাদনার ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়।

ইংরেজি ও বাংলাভাষায় জন মার্শম্যান অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত বাংলা পুস্তকগুলির অধিকাংশই তাঁরই লিখিত ইংরেজি পুস্তকের তর্জমা। বাংলাপুস্তকগুলিতে অনেকসময়েই তাঁর নাম স্বাক্ষরিত থাকত না। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের আইনবিষয়ক গ্রন্থগুলি বিশেষ জনপ্রিয় ও অর্থকরী হয়েছিল। 'দেওয়ানি আইন সংগ্রহ' (১৮৪৩), 'দারোগাদের কর্ম্মপ্রদর্শক' (১৮৫১), 'ব্যবস্থাভিধান' (১৮১৫) প্রভৃতি গ্রন্থ দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। ইতিহাস ও বিজ্ঞানবিষয়েও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের উৎসাহের সীমা ছিল না। তাঁর 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' (১৮১৯), 'ক্ষেত্রবাগানবিবরণ' (১ম খণ্ড ১৮৩১, ২য় খণ্ড ১৮৩৬), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৩১), 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যেই তার প্রকাশ। তাঁর 'সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাস' ১৮২৯ সনে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রে লিখিত হয়েছে 'Anecdotes of virtue and valour. সকল লোকের হিতার্থে বাংলাভাষায় তর্জমা করা গেল।' উইলিয়ম কেরীর বাংলা-ইংরেজি বিশাল অভিধানকে জন ক্লার্ক মার্শম্যান সংক্ষিপ্ত আকার দেন। এই ব্যাপারে উইলিয়ম কেরীর পূর্ণ সম্মতি ও সহযোগিতা ছিল। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দুই খণ্ডে রচিত—'The Life and Times of Carey Marshman and Ward. Embracing the History of Serampore Mission' (1859). বইটি শ্রীরামপুরমিশনের ইতিহাস নামে অধিকতর পরিচিত।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান নিজে ধর্মযাজকত্ব না করলেও শ্রীরামপুর মিশনের উন্নতি ও খ্রিস্টধর্মপ্রচারণার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। মিশনের দুঃসময়ে তিনি মিশনকে ও শ্রীরামপুর কলেজকে বহু অর্থ দান করেন। এই দান তিনি গোপন রাখতেই ভালবাসতেন।

'গভর্নমেন্ট গেজেটে'র সম্পাদকরূপে সরকারী বহুসিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে বাধ্য হওয়ায় তাঁকে কুৎসার সম্মুখীন হতে হয়, তিনি সরকারের দালাল নামে অভিহিত হন। কালক্রমে শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস ব্যাপটিস্টমিশন প্রেসের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, শ্রীরামপুর কলেজের পরিচালনার ভার অন্যদের উপর ন্যস্ত হয়। ভগ্নহৃদয়ে জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশকে চিরবিদায় জানিয়ে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে অবস্থানকালে ভারত সংক্রান্ত অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি বারংবার ঘোষণা করেছেন—"Education must in India precede Christianity."

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় তিনি উইলিয়ম কেরীর পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন। ভাষাজ্ঞানে ও রচনারীতির সৌকর্যে তিনি বাঙালি লেখকদের অনেকেরই সমকক্ষ ছিলেন।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মৃত্যু হয়।

জন ম্যাক (১৭৯৭-১৮৪৫)

জন ম্যাক ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে আসেন উইলিয়ম কেরীর সহযোগী ধর্মযাজকরূপে। তাঁর পিতা একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী ছিলেন। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায় ম্যাকের জন্ম হয়। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। গণিত, রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল, তবে রসায়ন বিভাগে ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। অপরদিকে গ্রিক, ল্যাটিন ইত্যাদি ক্ল্যাসিক ভাষাতেও তাঁর আকর্ষণ কম ছিল না।

শ্রীরামপুর মিশনের মুখ্যত্রয়ীর অন্যতম উইলিয়ম ওয়ার্ড যখন ইংলণ্ডে যান, তখন ম্যাকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়; তিনি ম্যাককে শ্রীরামপুরমিশনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। জন ম্যাক অল্পবয়সেই ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি ব্রিস্টলে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির সদস্য ছিলেন।

জন ম্যাক শ্রীরামপুর কলেজের রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। একই সঙ্গে ধর্মপ্রচারের কাজও চলতে থাকে। তিনি শ্রীরামপুরমিশনের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে বাংলা ও ইংরেজি উভয়ভাষা পাঠদান করতেন। য়ুরোপেও তখন পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্র-বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা। রসায়ন শাস্ত্রে তখন এমন কিছু কিছু ধারণা প্রচলিত ছিল যা বর্তমান যুগে কৌতুকজনক মনে হতে পারে। রসায়নবিদ্যার সেই প্রারম্ভিক যুগেই জন ম্যাক বীক্ষণাগারে পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের রসায়নশাস্ত্রে পাঠদান করতেন, এটি কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। জেমস ডগলাস নামে জনৈক ভদ্রলোক শ্রীরামপুর কলেজে রসায়ন বীক্ষণাগারের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য পাঁচশত পাউণ্ড দান করেন।

জন ম্যাক নানাস্থানে রসায়নবিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। রসায়নের অধ্যাপকরূপে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং তৎকালীন বড়লাট মার্কুইস অফ হেস্টিংস তাঁকে এশিয়াটিক সোসাইটিতে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানান। জনের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির একটি ঘর তিনি ম্যাকের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দেন।

জন ম্যাকের শ্রেষ্ঠকীর্তি বাংলা রসায়নশাস্ত্রের পুস্তক, 'কিমিয়াবিদ্যাসার' রচনা। পুস্তকটি বাংলা ও ইংরেজি দ্বিভাষিক—এক পৃষ্ঠায় বাংলা অপর পৃষ্ঠা ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত। ম্যাক রসায়নের কিছু কিছু পরিভাষা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি থেকে গ্রহণ করেন এবং বাংলালিপিতে তার রূপ দেন, আবার সংস্কৃতভাষার সাহায্যে কিছু কিছু পরিভাষা

তিনি রচনাও করেন। অনেকে মনে করেন 'কিমিয়াবিদ্যা'র বাংলা অংশ ফেলিক্স কেরী ইংরেজি থেকে তর্জমা করেন; এই অনুমান বোধ হয় সঠিক নয়।

ম্যাক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় উইলিয়ম কেরী ও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সহায়তা এবং পূর্বসূরীদের ঋণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, কিন্তু ফেলিক্স কেরীর নাম ভূমিকায় উল্লেখ করেননি। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ম্যাক ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনে যোগদান করেন; আর দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফেলিক্স কেরীর জীবনাবসান ঘটে। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে Principles of Chemistry-র সম্পূর্ণ অনুবাদ করা ফেলিক্স কেরীর পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা। হয়তো প্রথমদিকে বাংলায় পাঠদানের ব্যাপারে ফেলিক্স ম্যাককে কিছু সাহায্য করেছিলেন। (ফেলিক্স কেরীর বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান এবং বাংলাভাষায় তাঁর অধিকার এতই সুবিদিত যে Principles of Chemistry-র বাংলা অনুবাদ করা বা না করায় তাঁর খ্যাতির কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয়না)।

জন ম্যাকের অপর একটি কৃতিত্ব ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রণয়ন করা। এই মানচিত্রে ভারতের নদ নদী এবং প্রায় একহাজার নগরাদির অবস্থান বাংলা ও ইংরেজিভাষায় নির্দেশ করা হয়েছে। বাংলাভাষায় স্থানের নামাদি নির্দেশিত এটিই প্রথম মানচিত্র।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য জন ম্যাক স্বদেশে যান এবং নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের পর ১৮৩৯ সনে শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষতার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়, মিশন পরিচালনায়ও তাঁর দায়িত্ব বৃদ্ধিপায়। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তাঁর জীবনাবসান হয়। এই অকালপ্রয়াণ সকলকেই শোকস্তব্ধ করে।

উইলিয়ম ইয়েটস (১৭৯২-১৮৪৫)

উইলিয়ম ইয়েটস ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডের লোবরো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থাতেই গ্রিক, ল্যাটিন প্রভৃতি ক্ল্যাসিকাল ভাষা শিক্ষায় তিনি আগ্রহান্বিত হন। মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বাইশ বৎসর বয়সে ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর সহায়করূপে ইয়েটস শ্রীরামপুরে আসেন। উইলিয়ম কেরীই ছিলেন তাঁর বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক। এই সময় তিনি হিব্রু ভাষাও শেখেন।

ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনের বিরোধের ফলে ইয়েটস শ্রীরামপুর মিশন ত্যাগ করেন এবং কলকাতার বৈঠকখানা অঞ্চলে নতুন ব্যাপটিস্টমিশন প্রতিষ্টা করেন। পীয়ার্স, ওয়েঙ্গার প্রমুখ তরুণ যাজকরাও এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন।

ইয়েটস ফিরিঙ্গি ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন।

শিক্ষক ও অনুবাদক রূপে ইয়েটসের খ্যাতি ছিল। স্কুলবুক সোসাইটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং কিছুকাল স্কুলবুক সোসাইটির সম্পাদকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্কুলবুক সোসাইটির জন্য তিনি বহুপাঠ্যপুস্তক রচনা করেন এবং ছাত্রদের উপযোগী কিছু বই ইংরেজি থেকে বাংলায় তর্জমা করেন। ধর্মতত্ত্ববিষয়ে ইয়েটস রামমোহনের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

'Essays in Reply to Rammohan Roy' পুস্তিকায় ইয়েটসের বক্তব্য বিধৃত হয়েছে। ইংরেজি ও বাংলায় ইয়েটস বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন—'পদার্থবিদ্যাসার' (১৮২৫); 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩০) 'সত্য ইতিহাস সার' (১৮৩০) ইত্যাদি।

ইয়েটস মনে করতেন উইলিয়ম কেরীর বাইবেলের বাংলা অনুবাদ যথাযথ নয়। কেরীর বাইবেলের ভাষা সাবলীল ও সুমার্জিত হয়নি। তাই কেরীর অনুবাদের ত্রুটি সংশোধনের জন্য ইয়েটস বাংলাভাষায় সমগ্র বাইবেল অনুবাদ করেন। ইয়েটস বহু গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর নিজস্ব কোন রচনাভঙ্গী গড়ে ওঠেনি। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি স্বদেশে যাত্রা করেন, কিন্তু স্বদেশে পৌঁছবার আগে জাহাজেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর শবাধার সমুদ্রে নামিয়ে দেওয়া হয়। ইয়েটসের অকালমৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু ও সহকারী ওয়েঙ্গার তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরিশিষ্ট - ৪

এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকার প্রবন্ধ, একটি সমস্যা

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকার একাদশ খণ্ডে ভারতীয়ওষধি-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম—"A Catalogue of Indian Medical Plants and Drugs with their Names in Hindoostani and Sanscrit Languages."

প্রবন্ধটির লেখক John Fleming Esq. M.D. :

সজীনকান্ত দাস তাঁর বাংলাগদ্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন—প্রবন্ধটি উইলিয়ম কেরীর একটি বেনামী রচনা। তিনি তাঁর উক্তির স্বপক্ষে একটি পত্রিকার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। সজনীকান্তের ভাষায়—"এই মহামূল্যবান প্রবন্ধটি কেরীর একটি বেনামী রচনা। কেরীর মৃত্যুর পর The Gentleman's Magazine-এ তাঁহার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত প্রবন্ধ বাহির হয় তাহার একস্থলে আছে—

Dr. Carey has also left behind a catalogue of Indian medicinal plants and drugs in the eleventh volume [of the Asiatik Researches] under the name of Dr. Fleming."

প্রবন্ধটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন, এই প্রবন্ধ মূলত চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সুবিধার জন্য লেখা। তিনি উইলডেনাওএর উদ্ভিদ্ সম্পর্কিত গ্রন্থের এবং রক্সবার্গ-এর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সাহায্য নিয়েছেন। কোলব্রুক তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং হিন্দুস্থানী বানানের ক্ষেত্রে তিনি গিলখ্রিস্ট-এর বানান অনুসরণ করেছেন।

গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকায় প্রথমে উইলডেনাওএর গ্রন্থ্ থেকে ভেষজের ল্যাটিন নামটি উদ্ধৃত হয়েছে, পরে তার হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত পর্যায় শব্দ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন ধাতব ও খনিজ পদার্থের নাম এবং শেষ অংশে খনিজ লবনের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভেষজের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করা হয়েছে।

The Gentleman's Magazine উইলিয়ম কেরীকেই উক্ত প্রবন্ধের লেখকরূপে নির্দেশ করলেও কিছু সন্দেহ থেকে যায়। কেরীর অপর দুটি প্রবন্ধ "Remarks on the state of Agriculture, in the District of Dinajpur" এবং "An ac-

count on the funeral ceremonies of a Burman priest'' কেরীর স্বনামেই প্রকাশিত হয়েছিল;হঠাৎ কেরী বেনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে যাবেন কেন? বিশেষত ধর্মযাজক উইলিয়ম কেরী ডি.ডি। হঠাৎ ডি.ডি. উপাধির পরিবর্তে M.D. উপাধি দাবি করবেন কেন? তাঁর মতো সৎ ধর্মযাজকের পক্ষে বেনাম গ্রহণ হয়তো সম্ভব (যদিও এবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে), কিন্তু অন্য একটি উপাধি আত্মসাৎ করা কি তাঁর আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? দ্বিতীয়ত প্রবন্ধটি বৈদ্যকশাস্ত্রের অন্তর্গত, চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের জন্য লেখা, লেখক নিজেই সেকথা বলেছেন। আলোচনার ধরণ থেকে মনে হয় লেখক একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক এবং নিজের নানা অভিজ্ঞতার বিষয়ও তিনি উল্লেখ করেছেন।

যদিও এই প্রবন্ধে প্রতিটি ল্যাটিন নামের হিন্দুস্থানী পর্যায় শব্দ আছে, কিন্তু প্রতিটিরই সংস্কৃত প্রতিশব্দ নেই। কিছু কিছু সংস্কৃত নাম কেরীর অপ্রকাশিত অভিধানে যে আকারে পাওয়া যায়, এখানে তার রূপ অন্য, যেমন—এই প্রবন্ধে চিরতার সংস্কৃত নাম 'চিরততিক্ত' কিন্তু কেরীর অপ্রকাশিত সংস্কৃত অভিধানে 'চিরতিক্ত' শব্দটি গৃহীত হয়েছে।

প্রবন্ধটিতে সংস্কৃত শব্দটির প্রতিলিখন Sanscrit। এই বানানই সেইসময় প্রচলিত ছিল, বিশেষত এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরা অনেকেই এই বানানই ব্যবহার করতেন। অপরদিকে কেরী নিজে ব্যবহার করতেন Sungskrit বা Sungskrita এই বানান। এইসবদিক থেকে বিচার করলে প্রবন্ধটির লেখক কেরী কিনা সন্দেহ জাগে।

The Gentleman's Magazine-এর বক্তব্যের সমর্থনেও কিছু বলা যেতে পারে। প্রথমত এই রচনায় অধ্যাপক গিলখ্রিস্ট ও অধ্যাপক কোলব্রুকের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। গিলখ্রিস্ট ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন; কেরীর পক্ষে তাঁর সাহায্য গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া কেরী হিন্দুস্থানীভাষা ভাল জানতেন। তিনি নিজে যে কয়টি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন হিন্দুস্থানী তার অন্যতম। অধ্যাপক কোলব্রুকের সঙ্গেও কেরীর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

প্রবন্ধটিতে ভারতীয় ভেষজের গুণাবলীর সঙ্গে খনিজ ধাতবপদার্থ ও বিভিন্ন খনিজলবণ সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। ধর্মযাজক উইলিয়ম কেরী অন্তরের অন্তঃস্থলে একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছিলেন। যাজকতা, অধ্যাপনা, অনুবাদ ইত্যাদি নানাকাজে ব্যস্ত থাকায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চর্চায় যথেষ্ঠ সময় দিতে পারেননি। কিন্তু শ্রীরামপুরে কেরী-সংগ্রহশালায় রক্ষিত বিভিন্ন দ্রব্য থেকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ছাড়াও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিক থেকে আলোচ্য প্রবন্ধটির লেখক উইলিয়ম কেরী একথা মনে করা যেতে পারে।

তাছাড়া লেখক রক্সবার্গের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিরও সাহায্য নিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক রক্সবার্গের গ্রন্থ দুখানি শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস থেকে

মুদ্রিত হয়েছিল এবং রক্সবার্গের অকালমৃত্যুতে একটি গ্রন্থ কেরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটিতে ভারতীয় ভেষজরূপে বিভীতক, হরিতক, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন, তুলসী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। কেরীর অপ্রকাশিত সংস্কৃত অভিধানেও এই নামগুলি আছে।

অপরদিকে জন ফ্লেমিং নামে হয়তো সত্যই কেউ ছিলেন, ভেষজবিদ্যায় যাঁর অধিকার ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকায়, অধ্যাপক গিলখ্রিস্ট বা অধ্যাপক কোলব্রুকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকাও অসম্ভব নয়, ডঃ রক্সবার্গের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকতে পারে।

যাইহোক, আলোচ্য প্রবন্ধটি যদি সত্যই কেরীর রচনা হয়, তবে ভেষজবিদ্যা বিষয়েও সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য দান রেখে গেছেন। আর উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ক পরিভাষা রচনায় কেরীর দান তো সুবিদিত।

Bibliography (পুস্তকপঞ্জী)

Original Source in Sanskrit (unpublished)

1. Carey, William – Dictionary of the Sanskrit Language (preserved in the Carey Library, Serampore).
2. Carey, William – Polyglot Dictionary (part) (preserved in the Carey Library, Serampore)

Original Source in Sanskrit (published)

১. আনন্দ বর্ধন - ধ্বন্যালোক (বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা)

২. উপাধ্যায় বি (সম্পাদিত) - অভিধান সংগ্রহ, (দিল্লী, ১৯৮১)

৩. কবিরাজ, বিশ্বনাথ - সাহিত্য দর্পণ ঃ (হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ সম্পাদিত, পঞ্চম সং, কলিকাতা, ১৯৮১)

৪. কালিদাস - রঘুবংশম্ (নন্দরগিরকার সম্পাদিত, বোম্বাই,১৮৯১)

৫. ঐ - অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্ (এম.আর. কালে সম্পাদিত, বোম্বাই, প্রথম সং, ১৯২৬)

৬. কোলব্রুক, এইচ. টি (সম্পাদিত) - কোষ আর ডিক্সনারি অব দি স্যানস্ক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ বাই অমর সিংহ (কলিকাতা, ১৮৯১)

৭. চৌধুরী, পণ্ডিত মণীন্দ্রমোহন (সম্পাদিত) - শব্দরত্নাবলী (এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৭০)

৮. তর্কদর্শনতীর্থ, তারাচরণ - খ্রীস্টোপনিষৎ (কলিকাতা, ১৯৪৪)

৯. দণ্ডী - কাব্যাদর্শ (আর. রেড্ডী শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুণা, ১৯৭০)

১০. বাইবেল ট্র্যানশ্লেষন সোসাইটি - যিশয়িযস্য ভবিষ্যদ্বাক্যানি, ১৮৪৫

১১. ঐ - পোয়েটিক্যাল বুকস্, ১৮৫৮

১২. ঐ - প্রফেটিক্যাল বুকস্

১৩. ঐ - দি হোলি বাইবেল ইন স্যানস্ক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ (ভ্যলুম তিন, কলিকাতা, ১৮৫৮)

১৪. বিদ্যানিধি, গুরুনাথ (সম্পাদিত) - অমরকোষ (কলিকাতা, ১৯৮৮)

১৫. বিদ্যাভূষন, রামচন্দ্র - খ্রীস্ট সঙ্গীতা (প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৩৪)

১৬. ঐ - ঐ (দ্বিতীয় সংস্করন, কলিকাতা, ১৮৩৮)

১৭. ব্যাপটিস্ট মিশন - খ্রীস্ট চরিতম্ (কলিকাতা, ১৮৭৮)

১৮. ব্রহ্মচারী, নিরঞ্জন স্বরূপ - মুগ্ধবোধ, কলিকাতা

১৯. ভট্টজীদিক্ষীত - সিদ্ধান্ত কৌমুদী (শিবদত্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বোম্বাই ১৯৫২)

২০. মম্মটাচার্য - কাব্য প্রকাশ (ভি. আর. জে. কারমারকার সম্পাদিত, ষষ্ঠ সংস্করণ, পুণা, ১৯৫০)

২১. মাঘ - শিশুপালবধম্ (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৮২ শকাব্দ)

২২. রুদ্রট - কাব্যালঙ্কার (পণ্ডিত রনদেব শুক্ল সম্পাদিত, বারাণসী, ১৯৬৬)

২৩. শ্রীরামপুর মিশন - ধর্ম পুস্তকম্ নিউটেস্টামেন্ট, শ্রীরামপুর, ১৮০৮

২৪. ঐ - ঐ ওল্ডটেস্টামেন্ট, শ্রীরামপুর, ১৮১১

২৫. ঐ - যিশাইবাহ আচার্য পুস্তকম্, শ্রীরামপুর, ১৮২২

২৬. ঐ - আয়োব পুস্তকম্, শ্রীরামপুর,

২৭. ঐ - গীত সংহিতা, শ্রীরামপুর,

২৮. হলায়ুধ - অভিধান রত্নমালা (টি. এইচ. আউফ্রেস্ট সম্পাদিত, ১৮৬১)

২৯. হেমচন্দ্র - দেশীনাম মালা (পিশেল সম্পাদিত, ১৮৮০)

৩০. ঐ - ধর্মপুস্তকস্য শেষাংশঃ (কলিকাতা, ১৮৪১)

৩১. ঐ - পঞ্চতন্ত্র (কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯২১)

Secondary Source in Sanskrit

১। চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ - চানক্য নীতিশাস্ত্রম্ (কলিকাতা, ১৯৯০)

২। তর্কবাচস্পতি, তারানাথ - বাচস্পত্যাভিধান (কলিকাতা)

৩। দেব, রাধাকান্ত - শব্দকল্পদ্রুম (কলিকাতা)

Original Source (Bengali)

১। আন্তনিও, দোম - ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, (সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭)

২। আপ্‌সুম্পসাঁউ, মনোয়েল দ্য - কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩৯)

৩। আপ্‌সুম্পসাঁউ, মনোয়েল দ্য - পাদ্রী মনোয়েল দ্য আপ্‌সুম্পসাঁউ রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩১)

৪। কেরী, উইলিয়ম - ধর্মপুস্তক, মঙ্গলসমাচার মাতিউ রচিত (শ্রীরামপুর, ১৮০৩)

৫। ঐ - ধর্ম পুস্তক - নূতন নিয়ম (শ্রীরামপুর, ১৮০১)

৬। ঐ - ঐ - ঐ (শ্রীরামপুর, ১৮১৪)

৭। ঐ - ঐ - ঐ (শ্রীরামপুর, ১৮৩২)

৮। ঐ - ঐ - পুরাতন নিয়ম (শ্রীরামপুর, ১৮০১)

৯। ঐ - ঐ - ঐ (শ্রীরামপুর, ১৮১৪)

১০। ঐ - ঐ - (শ্রীরামপুর, ১৮৩২)

১১। ঐ - কথোপকথন (Dialogue-ইংরাজী অনুবাদসহ, প্রথম সংস্করন, শ্রীরামপুর, ১৮০১)

১২। ঐ - ঐ (দ্বিতীয় সংস্করন, শ্রীরামপুর, ১৮০৬)

১৩। ঐ - ঐ (তৃতীয় সংস্করন, শ্রীরামপুর, ১৮১৪)

১৪। ঐ - ইতিহসমালা (ফাদার দ্যতিয়েন সম্পাদিত, কলিকাতা)

১৫। কেরী, ফেলিক্স - বিদ্যাহারাবলী - ১ম খণ্ড ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ২য় খণ্ড স্মৃতিশাস্ত্র (শ্রীরামপুর, ১৮২১)

১৬। ঐ - ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় (শ্রীরামপুর, ১৮১৯)

১৭। ঐ - যাত্রীদের অগ্রসরণের বিবরণ (শ্রীরামপুর, ১৮২২)

১৮। বসু, রাম রাম - রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত (শ্রীরামপুর, প্রথম সং, ১৮০১)

১৯। ঐ - লিপিমালা (শ্রীরামপুর, প্রথম সং, ১৮০২)

২০। বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয় - বত্রিশ সিংহাসন (শ্রীরামপুর, প্রথম প্রকাশ, ১৮০২)

২১। ঐ - হিতোপদেশ (শ্রীরামপুর, প্রথম প্রকাশ, ১৮০৮)

২২। ঐ - রাজাবলি (শ্রীরামপুর, প্রথম প্রকাশ, ১৮০৮)

২৩। ঐ - প্রবোধচন্দ্রিকা (শ্রীরামপুর, প্রথম প্রকাশ, ১৮৩৪)

২৪। বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সম্পাঃ) - সংসদ বাংলা অভিধান (বিংশতিতম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৯৬)

২৫। মিত্র, সুবল চন্দ্র (সম্পাঃ) - সরল ছাত্রবোধ অভিধান (কলিকাতা, ১৯১২)

২৬। মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন - মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (শ্রীরামপুর, প্রথম প্রকাশ, ১৮০৫)

২৭। মুন্‌সি, চণ্ডীচরম - তোতা ইতিহাস (শ্রীরামপুর, প্রথম প্রকাশ, ১৮০৫)

২৮। রায়, হরপ্রসাদ - পুরুষ পরীক্ষা (শ্রীরামপুর, প্রথম প্রকাশ, ১৮১৫)

Secondary Source (Bengali)

১। খান, মহম্মদ সিদ্দিক - বাংলা মুদ্রন ও প্রকাশনে কেরী যুগ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২)

২। ঘোষ, শক্তিব্রত - উইলিয়ম কেরী ঃ সাহিত্যসাধনা (বর্ধমান, ১৯৮০)

৩। চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলকুমার - বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ (কলিকাতা, ১৩৬৬ বং)

৪। চট্টোপাধ্যায়, সবিতা - বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক (কলিকাতা, ১৯৭২)

৫। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার - সরল ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ (কলিকাতা, ১৯৭১)

৬। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার - বাংলার নবজাগরনে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিজন (কলিকাতা, ১৯৭৪)

৭। চট্টোপাধ্যায়,সুনীলকুমার - বড় সাধ বড় সেবা (শেওড়াফুলি, ১৯৮৯)

৮। ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর - শব্দকথা (রামেন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৬ বং)

৯। দাস, নির্মল - বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ (কলিকাতা, ১৩৯৪ বং)

১০। দাস, সজনীকান্ত - সাহিত্য সাধক চরিতমালা-১৫ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৮৩ বং)

১১। ঐ - বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (কলিকাতা, ১৯৮৮)

১২। দে, অমলেন্দু - চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী (কলিকাতা, ১৯৮১)

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার -ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলাসাহিত্য (কলিকাতা, ১৩৩৬ বং)

১৪। ঐ - পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থ সংকলন, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৭৮)

১৫। ঐ - ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, (কলিকাতা, ১৯৬৫)

১৬। ঐ - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৫ম খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৮৫)

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ - সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৪৪ বং), ২য় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, (কলিকাতা, ১৪০১ বং)

১৮। ঐ - ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-১৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, (কলিকাতা, ১৩৬৬ বং)

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ - মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলিকাতা, ১৩৬১ বং)

২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত - সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৮৮ ২য় মুদ্রণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলিকাতা, ১৩৯৬ বং)

২১। বাগল, যোগেশচন্দ্র - সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৯৬ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলিকাতা, ১৩৬১ বং)

২২। ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব - বাঙালীর বিজ্ঞান সাধনা (কলিকাতা, ১৯৬০)

২৩। সেন, সুকুমার - বাংলা সাহিত্যে গদ্য (কলিকাতা, ১৩৭৩ বং)

২৪। হালদার, গুরুপদ - ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস (কলিকাতা, ১৯৫০)

Journals/Periodicals etc. (Bengali)

১। দিগ্‌দর্শন - এপ্রিল ১৮১৮ - মার্চ ১৮১৯, জানুয়ারী-এপ্রিল, ১৮২০, শ্রীরামপুর ১৮২২ (বই আকারে বাঁধাই)

২। মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা - বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ৯২তম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, (কলিকাতা ১৩৯২ বং)

৩। ঐ - মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও বাংলা বর্ণমালা, 'শৈলী', (বর্ষ-৩, সংখ্যা-১, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, ঢাকা, বাংলাদেশ)।

Original Source (English)

1. Carey, William – A Grammar of Bengalee Language (Serampore, 1st Ed. 1801, 2nd Ed. 1805, 5th Ed. 1843).
2. Carey, William – A Grammar of Sungskrit Language (composed from the works of most esteemed Grammarians, Serampore, 1806).
3. Carey, William – A Dictionary of Bengalee Language (First published Serampore, Vol. I, 1818, Vol. II,1825, Reprint Delhi, 1981).
4. Carey, William & J. Marshman – Ramayana of Valmeeki (Translation in English prose from original Sanskrit, Vol. I, Serampore, 1806; Vol. II- Serampore, 1808; Vol. III-Serampore, 1810).
5. Colebrooke, H.T. – A Grammar of the Sanskrit Language (Calcutta, 1805)
6. Colebrooke, H.T. – Miscellaneous Essays (London, 1837)

7. Forster, H.P. – A Vocabulary in two parts English and Bengali and Vice-versa (Calcutta, 1799)

8. Halhed, N.B. – A Grammar of Bengal Language (Hooghly, 1778; Reprint Ed. by Nikhil Sarkar, Calcutta, 1980)

9. Ward, William – History, Literature and Mythology of the Hindoos.....etc. Vol-II (3rd Ed. Delhi, 1990)

10. Wilkins, Charles – A Grammar of the Sanskrita Language (London, 1808)

Secondary Source (English)

1. Adam, William – Reports on the State of Education in Bengal (Ed. by A. Basu, Calcutta, 1941)

2. Belvalkar, S.K. – Systems of Sanskrit Grammar (2nd Ed. Amritsar, 1980)

3. Carey, Eustace – Memoirs of William Carey (London, 1836)

4. Carey, S.P. – William Carey (London, 1934)

5. Chatterjee, Sunil Kumar – Felix Carey : A Tiger Tamed (Calcutta, 1991)

6. ” ” – Hannah Marshman (Sheoraphuli, 1987)

7. Chattopadhyay, Suniti Kumar – Origin and Development of Bengali Language Vol. I (Rupa Ed., Calcutta, 1985)

8. Daniel, J.T. & Hedlund, R.E. (Ed.) – Carey's Obligation and India's Renaissance (Serampore, 1993)

9. Das, Sisir Kumar – Early Bengali Prose : Carey to Vidyasagar (Calcutta, 1966)

10. ” ” – Sahib and Munshis of Fort William College (New Delhi, 1978)

11. Dey, S.K. – History of the Bengali Literature in the Nineteenth Century (Calcutta, 1919)

12. Dharampal – The Beautiful Tree (New Delhi, 1983)

13. Dutta, R.P. – India Today (Bombay, 1947)

14. Gandhi, (Mahatma) – The Collected Works of —, Vol. 48 (Govt. of India Pub. Div., New Delhi, 1971)

15. Hooper, J.S. – The Bible Translation in India, Pakistan and Ceylon (London, –)

16. Hunter, W.W. – The Annals of Rural Bengal (Govt. of W. Bengal Pub., Calcutta, 1996)

17. Keith, A.B. – A History of Sanskrit Literature (O.U.P., Reprint 1956)

18. Kling, Blair, B., – Partner in Empire (Calcutta, 1981)

19. Kopf, David – British Orientalism and the Bengal Renaissance, (Calcutta, 1969)

20. Legois, Emili – A Short History of English Literature (Translated by V.F. Boyson & J. Coulson), Oxford, 1934.

21. Marshman, J.C. – The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, 2 Vols. (London 1859)

22. Monier-Williams, Monier – A Sanskrit-English Dictionary (Oxford, 1899)

23. Mukherjee, Amitabha – Reform and Regeneration in Bengal (Calcutta 1968)

24. Mukhopadhyay, Gopal – Mass Education in Bengal, 1882-1914 (Calcutta, 1984)

25. Potts, E.D. – British Baptist Missionaries (Cambridge, 1967)

26. Qayyum, M.A. – A Critical Study of the Early Bengali Grammars : Halhed to Haughton (Asiatic Society, Bangladesh, Dhaka, 1982)

27. Roberts, P.E. – History of British India under the Company and the Crown (O.U.P. London 1921, Reprinted 2nd Ed. 1952)

28. Roebuck, T. – Annals of the College of Fort William (Calcutta, 1819).

29. Roxburg, William – Flora Indica (Serampore, 1832)

30. Sen, R.C. – A Dictionary in English and Bengali Languages 2 vols (Serampore, 1834)

31. Sen, Sukumar (Edited and Translated) – Itihasmala (by William Carey) Calcutta.

32. Seton-Karr, W.S. – Selections from Calcutta Gazette (1864-69), 5 vols.

33. Sinha, N.K. – Economic History of Bengal, Vol. I (Calcutta, 1956), Vol. II (Calcutta, 1962)

34. Smith, George – Life of William Carey (London)

35. Turner, R.L. – A Comparative Dictionary of Indo-Arian Languages, Vols. I & II (London, 1963)

36. Voigt, G.O. – Hortus Suburbanus Calcuttenses (Bishop's College Press, Calcutta, 1845)

37. – – The Bible of Everyland (Samuel Bagster & Sons, London, 1860)

38. – – Dictionary of National Biography Vol. XXI.

Journals/Periodicals/Prospectus/Tracts etc. in English

1. Agarwala, V.S. – Mahapandit Rahul Sanskrityana : His Contributions to World of Learning (Journal of the Bihar Research Society, Vol. XLVII, Parts I-IV)

2. Asiatic Researches, Asiatic Society, Calcutta.

3. (The) Asiatic Society of Bengal, Contemporary Review of—(from 1784 to 1883, Calcutta)

4. (The) Asiatic Society of Bengal, The Journal of — (Vol. XXXV. No. 1, 1993)

5. B.M.S. — Periodical Accounts of—(Vol. I, London, 1801 and Vol. II, London, 1807)

6. (The) Calcutta Christian Observer, Vol. XXVI (Old Series), Vol. XVI (New Series), June 1832, January to December 1885.

7. Chattopadhyay, Sunilkumar – Memories of Serampore Translation, Dharmadipika (A South Asian Journal of Missionological Research, Vol. I, No. 1, June, 1997)

8. (The) College of Fort William in Bengal, (London 1805)

9. Kling, Blair B – Economic Foundations of the Bengal Renaissance. (An essay published in 'Aspects of Bengali Society'—Ed. by Baumer, Rachel Van, Honolulu, 1976).

10. Primitiae Orientales (Vols. I & II, Calcutta, 1803, 1804 respectively).

11. Prospectus of the College for the Instruction of Asiatic Christian and other youth in Eastern Literature and European Science, (Serampore, 1818)

12. Yeats, William – Essay on Sanskrit Alliteration.

13. Yeats, William – Review on Naisadacharitam (Asiatic Researches, Vol. XX, (Calcutta 1836).

নির্দেশিকা

অ

অক্সফোর্ড ১৬।
অন্তর্জলী যাত্রা ৬।
অভিজ্ঞানমশকুন্তলম্ ২০, ২১, ২১০।
অভিধান (সংস্কৃত-অপ্রকাশিত) ৬৭-৭৯, ২০৬, ২০৯।
অমরকোষ ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৯, ১১৭, ১২৯, ১৩৮, ১৮৮।
অলঙ্কার (শাস্ত্র) ১০, ৪০।
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬, ১৬২, ১৬৭।

আ

আখড়াই ৭।
আখানজী ৯।
আপজন ১৭৪।
আলেকজাণ্ডার ডাও ১৪, ১৫।
আল্লোপনিষৎ ১০৪।
আয়ুব পুস্তকম্ ৯১।

ই

ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি ১৭৪।
ইতিহাসমালা ১৬৭-১৭২।
ইন্ডিয়া এ্যাক্ট (রেগুলেটিং) ২, ২৩।.
ইন্দ্র (বৈয়াকরণ) ১৯।
ইমেপ (জুনিয়র) ১৩৩, ১৩৬।
ইলাইজা ইম্পে ২।
ইলিয়াড ৩৪।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১, ৭, ১৪, ১৫, ২০, ২৩।

ঈ

ঈদ্ ৬।
ঈশোপনিষৎ ৫০, ৫১, ২০৭।
ঈশ্বর গুপ্ত ৭।

উ

উডনি (জর্জ) ১৪৩।
উনাদি কোষ ৭৯।
উইলসন, হোরেস হেমান ৯, ৫৭, ৬১, ১১৫, ১১৬, ১৩৮।
উইলিয়ম ইয়েটস্ ১০৫, ১৪৭, ১৯১-১৯৫, ১৯৮।
উইলিয়ম ওয়ার্ড ৬৯, ৮৮, ১০০, ১২০, ১২১, ১৪৩, ১৪৪, ১৮৩-১৮৫, ১৯৫।
উইলিয়ম এ্যাডাম ১০।
উইলিয়ম কেরী ১, ৬, ৮, ৯, ১১, ১৫, ২৪, ২৭-৩৬, ৩৯-৪৯, ৫১, ৫২, ৫৬, ৬০, ৬১, ৬৭-৭১, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৬-৯০, ৯২-১০১, ১০৩,-১০৫, ১০৯-১১২, ১১৪-১১৭, ১২০-১২৭, ১৩০-১৩৯, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬-১৫০, ১৫২-১৫৮, ১৬১-১৬৩, ১৬৫, ১৭২, ১৭৪-১৮০, ১৮৩-১৮৭, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭-২০০, ২০৫-২১২।
উইলিয়ম চেম্বার্স ১৫।
উইলিয়ম জোন্স ৯, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ৩০, ৫৭, ১৯৯, ২০০।
উইলিয়ম মুর ৮৮।
উইলিয়ম রবার্টসন ৮, ১৪।

ঋ

ঋক্‌বেদ ৩০।

এ

একাক্ষর কোষ ৭৯।
এডমনস্টোন (এন.বি.) ৮।
এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৮, ১৪।
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৮৬।
এ্যাডাম ফার্গুসান ৮, ১৪।
এ্যাবি রেনাল ৮, ১৪।
এশিয়াটিক জার্নাল ১৬২, ১৭৫।
এশিয়াটিক রিসার্চেস ২০, ২১, ২২, ৩০, ৫৭, ১৯৪।
এশিয়াটিক সোসাইটি ১১-১২, ১৬, ২০-২২, ৭০, ৭৪, ১১০, ১১১, ১১৫, ১১৬, ১৩৮।
এসেস্ অন্ স্যান্স্ক্রিট এ্যালিটারেশন ১৯৩, ১৯৪।

ও

ওল্ড টেস্টামেন্ট (বাংলা) ১৪৪, ১৪৮, ১৪৯।
ওল্ড টেস্টামেন্ট (সংস্কৃত) ৯০-৯৩, ৯৬, ১২৪, ১৪৪।
ওয়াকার ১৩৩।
ওয়ার্ডের জার্নাল ১০৯।
ওয়ারেন হেস্টিংস ১-৩, ১১, ১৪-১৬, ১৯, ২৩।
ওয়েঙ্গার ১৪৭।
ওয়েলেসলি ৩২, ১৩৫।

ক

কর্ণওয়ালিস ৩, ৮।
কর্ণওয়ালিস কোড ২৩।
কথোপকথন (dialogue/colloquies) ৭০, ১৩৪, ১৬১-১৬৫।
কনফুসিয়াস ২১০।
কলিকাতা মাদ্রাসা ১১, ১৫।
কবিগান ৭।
কবিকল্পদ্রুম ৭২।
কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি (পণ্ডিত) ১৮৭।
কালিকট ৮৬।
কালিদাস ৭২, ৭৩, ৭৯, ১৬৮, ১৯৩, ২১০।
কাশিমবাজার কুঠি ১৪, ১৯।
কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ২৮, ১৩২।
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৬।
কিমিয়াবিদ্যাসার ১৮৭, ১৯৫, ১৯৭।
কিয়েরনাণ্ডার (জে, জেড্) ১১।
কুমারিকা খণ্ড ১৯৭।
কুমুদেশ্বর ৪০, ৪১।
কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ ৮৬।
কোড অব জেন্টুলস ১৬-১৮।
কোলব্রুক (হেনরী টমাস) ৯, ২১-২৩, ৫২, ৫৫-৫৮, ৬০, ৬১, ৬৯, ১০৯, ১১৭, ১২৯, ১৩২, ১৩৭, ১৩৮, ১৯৩, ২০৭।
কোয়ার্টারলি রিভিউ ৬১।
কেরী (এস. পি) ২৮, ৩৪।
কেরী লাইব্রেরি (শ্রীরামপুর) ৬৭, ৮০, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৭, ১৩৮।
ক্লিন ২১২।
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ১৯৮।
ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার ১৯৮।
ক্রমদীশ্বর ৬০।
ক্লাইভ ২, ১৫।
ক্লার্ক (টি) ১৩৩, ১৩৯।

খ

খেউড় ৭।
খ্রিস্টোপনিষৎ ১০৪।

গ

গণেশ (সিদ্ধিদাতা) ৭৬
গণ্ড ফারনিস (পহ্লব রাজ) ৮৬।
গর্টন ১৩৩।
গিলখ্রিস্ট ২১।
গিলসবরো ২৭।
গ্লিন ১৩৩, ১৩৪।
গীতগোবিন্দ ২১।
গীতসংহিতা ৯১।
গুইচন্দ্র ৪০।
গুরুমশাই ৯।
গোবান ১৩৩, ১৩৪, ১৯৭।
গোরেসিও ১১৬।
গোলকনাথ শর্মা ২৮।
গৌতম ৩০।
(এ) গ্রামার অব্ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ (হ্যালহেড) ৭, ১৭-২০, ৫৭।
(এ) গ্রামার অব্ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ (উ. কেরী) ১৫২-১৫৮, ২০৯।
(এ) গ্রামার অব্ দি স্যানসক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ (উইলকিন্স) ২০, ৫৮-৬১।
(এ) গ্রামার অব দি স্যানসক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ (উঃকেরী) ৩৫, ৩৯-৫২।
(এ) গ্রামার অব দি স্যানসক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ (কোলব্রুক) ২২, ৫২-৫৭।
(এ) গ্রামার অব দি স্যানসক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ এণ্ড স্যান্সক্রিট ভ্যোকাবুল্যারি (ইয়েটস) ১৯২।

চ

চড়কপূজা ৬।
চণ্ডীচরণ মুনসি ১৩৮।
চণ্ডীমণ্ডপ ৪।
চতুষ্পাঠী ১০, ৪১।
চার্লস উইলকিন্স ৭, ১৫, ১৯-২১, ৫২, ৫৮-৬১।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৩, ৪।
চ্যাস্টনি ১৩৩।

ছ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ১।

জ

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১০, ২১।
জটাধর ৭২, ৭৯।
জটাধর (কোষগ্রন্থ) ১৮৮।
জন আনস্ট্রুথার ১১০, ১১১, ১১৫।
জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১১৪, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯২।
জন প্লেফেয়ার ৮, ১৪।
জন ফাউন্টেন ২৯, ১৪৩, ১৪৪।
জন বানিয়ান ১৮৬।
জন ম্যাক ১৮৭, ১৯৫-১৯৭।
জন শোর ৪।
জনসন ১৩০।
জন হলওয়েল ১৪, ১৫।
জাতীয় সংহতি ২০৬, ২০৭।
জাঁ সিলভা বেইলী ৮, ১৪।
জোনাথান ডানকান ৮, ১৫, ২৩।
জোশুয়া মার্শম্যান ৬৯, ৮৮, ৯০, ১০০, ১১০, ১১২, ১১৫, ১১৬, ১২০, ১২১, ১৪৪, ১৪৮, ১৮৪, ১৮৫, ১৯১, ২১০, ২১২।
জোশুয়া রো ৮৮।
জেনানা পদ্ধতি ১০।
জেমস্ প্রিন্সেপ ৯, ২১।
জে মার্শালি ১৪, ১৯।

ট

টড ১৩৬।
টমাস (ডাঃ) ২৭, ৯৮, ১২০, ১৪৩, ১৪৪।

টমাস ওল্ড ২৭।
টেকচাঁদ ঠাকুর ১৬২।
টোল ১০।

ড

ডেভিড কফ ১৬।
ডেভিড ব্রাউন ৮৯, ৯৩।

ত

তর্জা ৭।
ত্রিকাণ্ড শেষ (কোষ) ৭৯।

দ

দণ্ডী ১১৭, ১৯৪।
দশকুমার চরিত ১১৭, ১৩৮।
দাউদ ৯২।
দাউদের গীত ১৪৮ ।
দায়ভাগ ১৩৮।
দীনবন্ধু মিত্র ১৬২।
দুর্গাদাস ৪০।
দেশীনামমালা ৭৯।
দোম আন্তনিও ৭, ৮৬।
দোলযাত্রা ৬।
দ্যতিয়েন (ফাদার) ১৬৮

ন

নববর্ষ (বাংলা) ৬।
নলোদয় কাব্য ১৯৩, ১৯৪।
নিউ টেস্টামেন্ট (বাংলা) ১৪৩, ১৪৪।
নিউ টেস্টামেন্ট (সংস্কৃত) ৮৯, ৯০, ৯৬-৯৮, ১২৫।
নৈষধচরিত ১৯৩।
ন্যাথানিয়েল স্মিথ ১৫।

প

পঞ্চতন্ত্র ১৬৭, ১৬৮।
পঞ্চানন কর্মকার ৮, ১৯।
পদ্মলোচন চূড়ামণি ১৩২।
পরমগীতম্ ৯১।
পলাশীর যুদ্ধ ১০, ১১।
পশুপতি ৩০।
পাঠশালা ৯, ১০।
পাণিনি ৪০, ৪১, ৪৬, ৫৬।
পাবলিক ডিসপিউটেশন ৩২, ৯৪, ১৩৪, ১৩৫, ১৯৭।
পামার ২১২।
পিরিওডিক্যাল এ্যাকাউন্টস্ ২৯।
পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস ১৮৬।
পীয়ার্স ১৫২।
পুরাণার্থ প্রকাশ ১৮।
পুরুষপরীক্ষা ১৬৭।
পুরুষোত্তম ৭৯।
পোয়েটিক্যাল বুকস্ ৯১।
প্রফেটিক্যাল বুকস্ ৯২।
প্রবোধচন্দ্রিকা ৪১, ১৬৮।
প্রিন্সেপ ১৩৬।
প্রিন্সেস মারিয়া (জাহাজ) ২৭, ১৪৩।
প্রিমিটিয়ে ওরিয়েন্টেলস্ ১৩৪।
প্রেম সাগর ১৩৮।
প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৯৯।

ফ

ফাদার জেভিয়ার ৮৭।
ফুলার ২৮, ৯০, ১০৯।
ফ্রেণ্ড অব্ ইন্ডিয়া ১৮৭।
ফেবলস্ অব্ পিলপে ২০, ১১৭।
ফেল (লেঃ) ১৩৩, ১৩৫।
ফেলিক্স কেরী ৬৯, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৮৫-১৯১।
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ২১, ৩১-৩৩, ৩৬, ৩৯-৪১, ৫১, ৫২, ৫৬, ৬৭, ৬৯, ৯৪, ৯৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৫, ১১৭,

১২৩, ১৩০-১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৫২, ১৫৫, ১৬০, ১৬৭, ১৭৪, ১৯২, ১৯৭, ১৯৮, ২০৭।
ফ্রান্সিস বুকানন ১১০।

ব

বঙ্কিমচন্দ্র ২০৯।
বত্রিশ সিংহাসন ১৬৭, ১৬৮।
বহু ভাষা কোষগ্রন্থ (Polyglot Vocavulary) ৮০-৮৩, ১৩৮,২০৭।
বাইবেল (বাংলা) ১৪৩-১৫০
বাইবেল (সংস্কৃত) ৫০, ৮০, ৮৩, ৮৬-১০৫, ১০৯, ১১৫, ১২৫, ১২৬।
বাইবেল অব্ এভরিল্যান্ড ৮৯, ৯০, ৯৬-৯৮।
বাইবেল ট্রানস্লেসন সোসাইটি ৯১, ৯২, ১০৫।
বাল্মীকি ১১২।
বাংলা-ইংরেজী অভিধান (কেরীকৃত) ৭৩, ৭৬, ১৭৪-১৮০, ২০৯।
বাংলার প্রথম রসায়ন গ্রন্থ ১৯৬।
বাংলা ব্যাকরণ (কেরীকৃত) ১৫২-১৫৮।
বিক্রম দীক্ষিত ৪০।
বিদ্যাহারাবলী ১৮৬-১৮৮, ১৯১।
বিষ্ণু পুরাণ ৩০।
বেকন ১৩০।
বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৬৭, ১৬৮।
বেদ ১০, ১০৯, ১১১, ১১৭, ১২৮।
বেদান্ত ১০, ৫১।
বোর্ড অব্ কন্ট্রোল ২.৩।
বোপদেব ৪০, ৪১, ৭৯, ১২৪, ১২৯।
বৈষ্ণব ৭, ২০৭।
ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯।
ব্যাপটিস্ট মিশন (বৈঠকখানা) ১৯৪, ১৯৮।
ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটি (লন্ডন) ২০৭।
ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি ২৭, ২৯, ৯২।
ব্যাসদেব ১৯৩।
ব্রহ্মপুরাণ ৩০।
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ১৮।
ব্রান্সডন ১৪৩।
ব্রাহ্ম সমাজ ৭।
ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ ৮৬।
ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় ১৮৬, ১৮৯।
ব্রিটিস ওরিয়েন্টালিস্ট ৮, ৯, ১১, ১২।

ভ

ভগোট (ডঃ) ২০৮।
ভট্টোজি দীক্ষিত ৬০।
ভর্ত্তৃহরি ১১৭, ১৩৮।
ভরত (মল্লিক) ৭৯।
ভাগবত পুরাণ ১৮।
ভার্জিল ১৯৪।
ভারতচন্দ্র ৭।
ভারতীয়করণ ৯, ১৬।
ভারবি ১৬৯।
ভাস্কোডাগামা ৮৬।
ভূষণা ৮৬।
(এ) ভোকাবুলারি ২৩।
ভোলতেয়ার ৮, ১৪।

ম

মকতব ৯।
মঙ্কটন ১৩৩।
মথুরেশ ৭০।
মদনাবাটি ৬, ১১, ২৭, ৩৯, ৬৭, ৬৯, ৮০, ১২০, ১৪৩, ১৪৪, ১৫২।
মধুসূদন ২০৯।
মনাটন ১৩৩।
মনুসংহিতা ২১, ২৯।
মনোএল দা আপসুম্পসাঁও ৭, ১৭, ৮৬, ১৭৪।
মরিস ১৩৩।
মহরম ৬।

মহাত্মা-গান্ধী ১১।
মহাভারত ২৮, ৩৪, ৬০, ১৫২, ১৯০।
মহারাজা নন্দকুমার ৭।
মার্ক ৮৯।
মাঘ ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৯।
মার্টিন ১৩৩, ১৯৭।
মাদ্রাসা ১০।
মাস্টার ১৩৩, ১৩৫।
মাহেশ্বর সূত্র ৪৪, ১৫৬।
মিউকোনোচি ৮, ১৪।
মিশালেনিয়াস এসেস্ ২২।
মীমাংসা ১০।
মুগ্ধবোধ ৪১, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ১২৪, ১২৭, ১২৯, ১৫৩, ১৫৮।
মুঙ্গের অনুশাসন (দেবপাল) ২০।
মুলার ২৯।
মুহম্মদ কাইয়ুম ১৫৩, ১৫৮।
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৩১, ৪১, ৫১, ৬৯, ৮৩, ৮৯, ৯৪, ১০৪, ১২৩, ১৩২, ১৪৭, ১৫২, ১৫৫, ১৫৭, ১৬২, ১৬৩, ১৬৮, ১৮৪, ১৯১, ২০৭।
মেদিনী ৭৯।
মোশার ব্যবস্থা ১৪৮।
ম্যাকনাটন ১৩৫।

য

যাত্রীদের অগ্রেসরণ বিবরণ ১৮৬, ১৮৯, ১৯০।
যুধিষ্ঠির ৩৪।
যোগ ১০।
যোহন ৮৯।

র

রঘুবংশকাব্য ৭৩
রত্নমালা ৭৯।
রবার্ট সাদী ১১৫।
রবীন্দ্রনাথ ২০৯।
রভস (কোষগ্রন্থ) ১৮৮।
রম্‌নি ১৩৩।
রাইল্যান্ড ২৯, ৬৮, ৭৩, ৮০, ১৩২, ১৭৫।
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১৩২।
রাধাবল্লভ দাস ৭।
রামজয় তর্কালঙ্কার ৯৬, ১৩২।
রামনাথ বাচস্পতি ৮৩, ৯৬, ১৫৫।
রামমোহন (রাজা) ১৯৪।
রামমোহন (দেশীয় খ্রিস্টান) ১২৭
রাম রাম বসু (মুন্সি) ২৭, ২৮, ৩৪, ১৩২, ১৩৪, ১৪৩, ১৪৪, ১৬২, ১৬৩।
রামায়ণ ৫৯, ৬০, ৬৯, ১৩৮।
রামায়ণ (সংস্কৃত অনুবাদ) ১০৯-১১৭।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৯৬, ১৯৭।
রাহুল সংকৃত্যায়ন ২১১।
রিকেটস্ সি. এম ১৩৭।
রিচার্ড শেরিডন ১৬।
রিভিউ অব্ নৈষধচরিত ১৯৩।
রুদ্রট ১৯৪।
রূপগোস্বামী ১৬৮।

ল

লক-১৩০।
লুক-৮৯।
লঙ (রেভারেণ্ড) ১৩০, ১৬৭।

শ

শবেবরাত ৬।
শক্তিব্রত ঘোষ ১৪৪।
শব্দচন্দ্রিকা ৭৯।
শব্দমালা ৭৯।
শম্ভু ৩০।
শব্দরত্নাবলী ৭০, ৭৯।
শাক্ত ৭।
শিব ৩০।

শিব পুরাণ ১৮।
শিবরাত্রি ৬।
শিল্পবিপ্লব (ইংলন্ডে) ৩, ৫।
শিশুপালবধ ৭৫।
শূলী ৩০।
শৈব ৭।
শ্রীকাণ্ড বিদ্যালঙ্কার ১৮৭।
শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৫, ১৯, ২৯, ৫১, ১৩৮, ২০৭।
শ্রীরামপুর কলেজ ৩৫, ৩৬, ১০০-১০২, ১০৯, ১২১-১৩১, ১৮৫, ১৯৫, ২০৮-২১১।
শ্রীরামপুর মিশন ৬৭, ৬৯, ৮৭, ৯০, ১০০-১০৪, ১১১, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৯-১৩১, ১৪৩, ১৪৪, ১৮৩-১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৮, ২০০, ২০৮, ২০৯।
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ৩৯, ৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৭, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ১১০, ১১৬, ১৩০, ১৪৩, ১৫২, ১৬৭, ১৭৪, ১৮৪, ১৮৬, ২০৯।
শ্রীহর্ষ ১৯৩, ১৯৪।

স

সজনীকান্ত দাস ২৮, ৫১, ৬৮, ১৪৪, ১৪৮, ১৬২, ১৬৭, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৯১।
সতীদাহ ৬।
সর্দার পোড়ো ৯।
সনাতন গোস্বামী ১৬৮।
সমাচার দর্পণ ১৮৬।
সরস্বতী পূজা ৬।
সল (রাজা) ৩৪।
সলিমন আগা ৩২।
সংক্ষিপ্তসার (ব্যাকরণ) ৪১।
সাটক্লিফ ৩০, ৩১, ৬৮, ৬৯, ১০৯, ১১৭।
সাদার ল্যাণ্ড ১৩৬, ১৩৭।
সাহিত্য দর্পণ ১৯৪।
সাংখ্য ১০।
সিদ্ধান্তকৌমুদী ৪১।
স্মিথ (জর্জ) ৩১, ৩৩, ১১৫, ১৯১।
সুকুমার সেন ১৬৮, ২০৯।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৭, ১৭৪।
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮৭, ৯৬।
সুপ্রীম কোর্ট ২, ৮, ১৫, ১৯, ৩২, ৯৬, ১১৫।
সুলেমানোপদেশঃ ৯১।
সুশীল দে ৬৮, ৭৬, ৮০।
স্মৃতি ১০।
স্মৃতিশাস্ত্র (বিদ্যাহারাবলীর খণ্ড) ১৮৭, ১৮৯, ১৯০।
সেন্ট টমাস ৮৬।
সেন্ট ম্যাথু ৫০, ৮৯, ৯০, ৯৪, ৯৯, ১৪৩, ১৬৭।

হ

হটন ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫।
হরিশচন্দ্র ১৮৪।
হানা মার্শম্যান ১২০।
হারাবলী (অভিধান) ৭৫, ৭৯।
হায়েস ১৩৩, ১৩৬।
হিগিনবোথাম (জে.জে.) ১৯১।
হিতোপদেশ ২০, ২১, ১১৬, ১৩৮, ১৬৭, ১৯৩।
হেনরি পিটার ফর্স্টার ৮, ২৩, ১৭৪।
হেমচন্দ্র ৭৯।
হেলিবেরি (কলেজ) ২০।
হেয়ার (ডেভিড) ২১২।
হোমার ৩৪।
হ্যালহেড (ন্যাথানিয়েল ব্রাসি) ৭, ১৫-২০, ২২, ৫৭, ১৫২, ১৫৩, ২০০।

য়

য়িশারালের বিবরণ ১৪৮।

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় অধ্যাপনা এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম.এ. করার পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষক হিসাবে বৈদিক গদ্যের ক্রমবিকাশের ওপর কাজ করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. পান। বর্ধমান উদয়-চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয় (গভঃ স্পনঃ)-এ কিছুকাল বাংলার অধ্যাপনা এবং পরে বেলঘরিয়া ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ (গভঃ স্পনঃ)-এ সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন।

বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধগুলি মৌলিকত্বের দাবী রাখে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের অবদান সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধগুলি নতুন তথ্যের সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিতবাহী। বিদ্বৎসমাজে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সম্মেলনে ও গবেষণাধর্মী বিভিন্ন পত্রিকায় সেগুলি পঠিত, প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে। বাংলা গদ্যের শৈলী-বিজ্ঞানে প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। লেখিকার বর্তমান পুস্তক 'উইলিয়ম কেরী ও সংস্কৃত সাধনা' সেই রকমই একটি ফসল।

মূল্য : ১৩০.০০